সায়েন্স ফিকশন সমগ্র । ২

হুমায়ূন আহমেদ

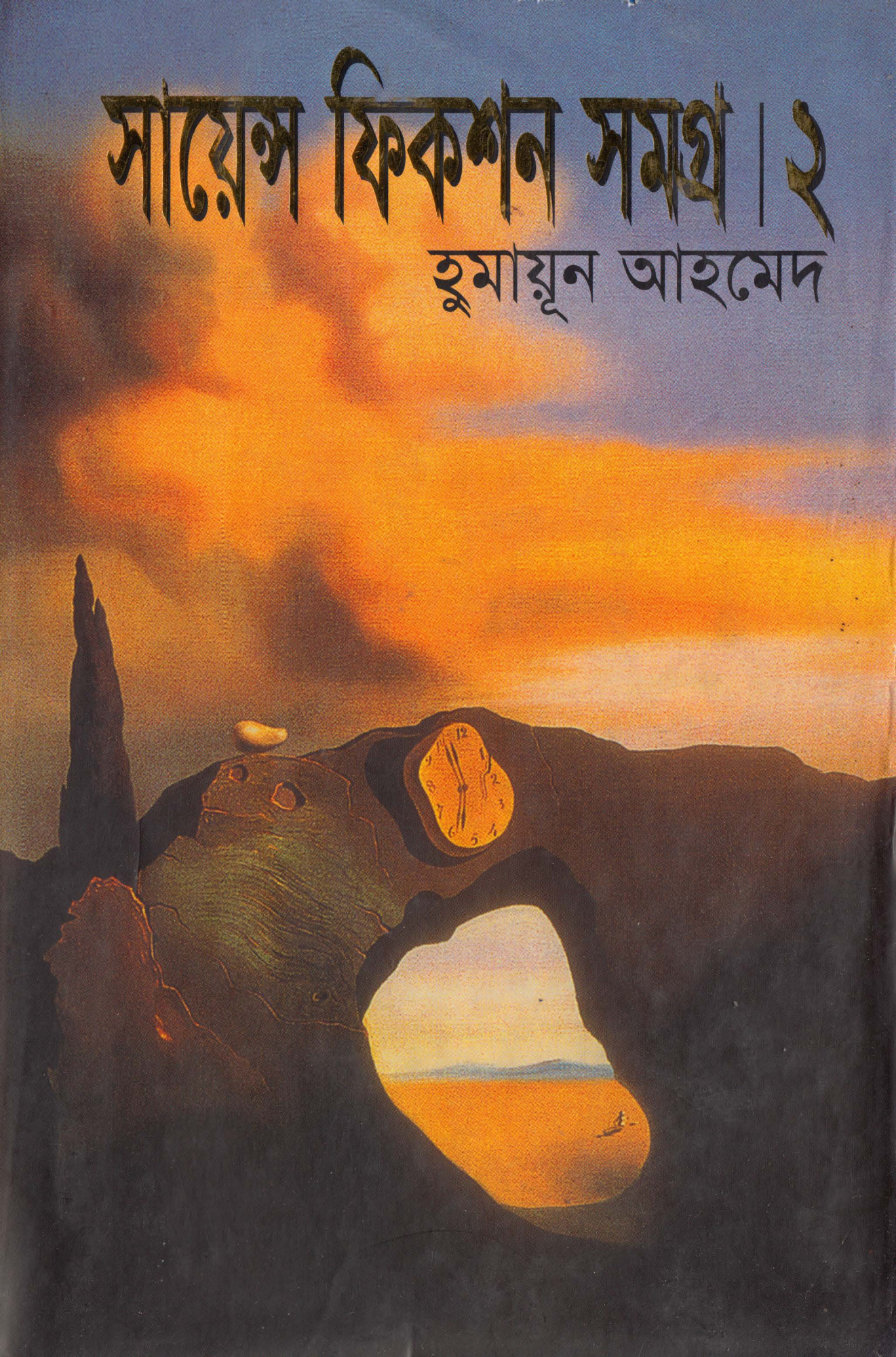

সায়েন্স ফিকশন সমগ্র | ২ • হুমায়ূন আহমেদ

প্রতিভা

প্রচ্ছদের পেইন্টিং । দ্য ট্রায়াঙ্গুলার আওয়ার । সালভাদর দালি

- ফিহা সমীকরণ
- শূন্য
- নি
- তাহারা
- পরেশের 'হইলদা' বড়ি
- আয়না
- নিউটনের ভুলসূত্র
- যন্ত্র
- নিমধ্যমা

ছবি ■ নাসির আলী মামুন

বাংলা কথাসাহিত্যাঙ্গনে একজন প্রবাদ পুরুষ। সববয়েসী পাঠকের নিকট তাঁর সমান জনপ্রিয়তা। এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপক। হঠাৎ অধ্যাপনা ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ; নির্মাণ করেন একাধিক দর্শকনন্দিত চলচ্চিত্র। সেই সাথে নির্মাণ করেন জনপ্রিয় টিভিনাটক।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। দেশে ও দেশের বাইরে তাঁকে নিয়ে সীমাহীন আগ্রহ।

বাংলা সায়েন্স ফিকশন রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান একটা কৌণিক দূরত্বে। বিজ্ঞান আর মানবিকতা– দুটোকে একই পাদপ্রদীপের আলোকে তিনি আলোকিত করেন যা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; পাঠকের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চান বিজ্ঞানের রহস্যময়তা আর তাঁর বিজ্ঞানদর্শন।

সায়েন্স ফিকশন সমগ্র-২

হুমায়ূন আহমেদ

তৃতীয়

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

বর্ণ বিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটারস

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : দুইশত টাকা

SCIENCE FICTION SAMAGRA-2 by Humayun Ahmed, Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication February 2005.

Website : www.oitijjhya.com

Price : 200.00 US $ 8.00

ISBN 984-776-352-6

প্রকাশকের কথা

যিনি একই সাথে তারাশঙ্করের 'কবি' আর আজিমভের 'এন্ড অব ইটারনিটি' পড়ে সমান আনন্দ পান তিনি নিজের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে বলে দাবি করলেও পাঠকের দরবারে তা সমস্বরে নাকচ হয়ে যায় ; পাঠক ঐ গণ্ডগোলটা নেয়, কেননা তারা মনে করে ঐরকম গণ্ডগোলমার্কা একটা কিছু সবার মাঝেই আছে এবং থাকে ; হুমায়ূনের মধ্যে থাকলে দোষ কী ?

হুমায়ূন মেধাবী ছাত্র। তাঁর সময়ের মেধাবীদের বিজ্ঞান পড়ার ঝোঁক ছিল। তিনিও পড়েছেন। বিজ্ঞান পড়লে আর্ট-কালচার করা যাবে না তা-তো নয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্য— দুটোতেই তিনি যথেষ্ট এলেম রাখেন। জানেন জীবনের রসায়ন। লজিক এন্টিলজিক দুটোকেই পাশাপাশি সারণিতে সাজাতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সাধারণ সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা সায়েন্স ফিকশনও পাঠকের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। তাঁর এ জাতীয় লেখায় আছে বিস্মিত রোমাঞ্চিত মুগ্ধ হওয়ার মতো নানান উপাদান উপকরণ। সায়েন্স ফিকশনগুলোতে তিনি তাঁর নতুন চিন্তা উপলব্ধি দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে চান পাঠকের সাথে ; যদিও লেখালেখি করেন তিনি মূলত নিজের আনন্দের জন্যে ; কিন্তু কে-না চায় নিজের আনন্দ অন্যকেও সংক্রামিত করুক উদ্বেলিত করুক উচ্ছ্বসিত করুক।

হুমায়ূন আহমেদের *সায়েন্স ফিকশন সমগ্র*-এর দ্বিতীয় খণ্ড বেরুলো। প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পাঠকের দরবারে সাদরে গৃহীত হবে কেবল এই বিশ্বাসটুকু আমাদের থাকুক।

আরিফুর রহমান নাইম
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

সূচিপত্র

ফিহা সমীকরণ	১১
শূন্য	৬১
পি	১১৯
তাহারা	২১৩
পরেশের 'হইলদা' বড়ি	২২৯
আয়না	২৩৭
নিউটনের ভুল সূত্র	২৫৭
যন্ত্র	২৭৯
নিমধ্যমা	২৮৯

ফিহা সমীকরণ

ঘরের দরজা এবং জানালার রঙ গাঢ় বেগুনি।

বেগুনি রঙ তাঁকে কখনো আকর্ষণ করে না। তাঁর ধারণা শুধু তাঁকে না এই রঙ কাউকেই আকর্ষণ করে না। তবু নিয়ম করা হয়েছে সব রেস্টুরেন্টের রঙ হবে বেগুনি। দরজা জানালা বেগুনি, পর্দা বেগুনি, এমন কি মেঝেতে যে কৃত্রিম মার্বেল বসানো থাকবে তার রঙও হবে বেগুনি। রঙের গাঢ়ত্ব থেকে বোঝা যাবে কোথায় কি খাবার পাওয়া যায়। খুব হালকা বেগুনির মানে এখানে পানীয় ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।

তিনি যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সে ঘরের রঙ হালকা বেগুনি। তাঁর প্রয়োজন গরম কফির। সিনথেটিক কফি নয়, আসল কফি। সব রেস্টুরেন্টে আসল কফি পাওয়া যায় না। এখানে কি পাওয়া যাবে ? আসল কফি খাবার মানুষ নেই বললেই হয়। এত টাকা দিয়ে কে যাবে আসল কফি খেতে ? তাছাড়া এমন না যে কৃত্রিম কফির স্বাদ আসলের মতো নয়। খুব কম মানুষই প্রভেদ ধরতে পারে। সব রেস্টুরেন্টে আসল কফি রাখে না এই কারণেই।

তিনি রেস্টুরেন্টে ঢুকবেন কি ঢুকবেন না তা নিয়ে একটু দ্বিধার মধ্যে পড়লেন। বেশি লোকজন হয় এমন জায়গাগুলি তিনি এড়িয়ে চলেন। লোকজন তাঁকে চিনে ফেলে। তারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, তিনিও অস্বস্তি বোধ করেন। আজকের এই রেস্টুরেন্টে তিনি যদি ঢুকেন তাহলে কি হবে তা তিনি আন্দাজ করতে পারেন। তিনি ঢোকামাত্র লোকজনের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। শতকরা দশ ভাগ লোক এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। শতকরা বিশ ভাগ লোক আড়চোখে তাকাবে। বাকিরা এমন এক ভঙ্গি করবে যেন তারা তাঁকে দেখতে পায়নি। কফির দাম দেবার সময় রেস্টুরেন্টের মালিক বিনয়ে গলে গিয়ে বলবে, আপনি যে এসেছেন এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের কফি কেমন লাগল তা যদি একটু লিখে দেন বড় আনন্দিত হই। কফি কুৎসিত হলেও তাঁকে লিখতে হবে—"আপনাদের কফি পান করে তৃপ্তি পেয়েছি।" পরেরবার যদি এই রেস্টুরেন্টে আসেন তাহলে দেখবেন, তাঁর লেখা এরা ফ্রেম করে বাঁধিয়ে রেখেছে। হাস্যকর সব ব্যাপার। দীর্ঘদিন এইসব হাস্যকর ব্যাপার তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে।

রেস্টুরেন্টের মালিক নিজেই চলে এসেছে। বিনয়ে মাথা এমন নিচু করেছে যে থুতনি লেগে গেছে বুকের সঙ্গে।

'খাঁটি কফি স্যার। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের কফি।'

'ধন্যবাদ।'

'কফি কেমন লাগল যদি লিখে দেন বড়ই আনন্দিত হব। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি...'

'দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। কফি কেমন লাগল আমি লিখে দেব।'

'আপনার একটি ছবি তুলে রাখার অনুমতি কি স্যার পাব?'

'না। আমি ছবি তুলতে দেই না।'

তিনি কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। কারো দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছেন শতকরা দশজন লোক তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ চোখের পলকও ফেলছে না। এভাবে তাকিয়ে থাকার কি মানে হয়? এমন তো না যে সেকেন্ডে সেকেন্ডে তাঁর চেহারা বদলাচ্ছে। তিনি গিরগিটি নন, মানুষ। যে গিরগিটি মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলায় তার দিকেও মানুষ এভাবে তাকায় না। তিনি ওভারকোটের পকেট থেকে পত্রিকা বের করলেন। নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে ফেলার একটা চেষ্টা। তাঁকে খবরের কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয় শুধু এই কারণেই।

'স্যার, আমি কি আপনার টেবিলে বসতে পারি?'

তিনি খবরের কাগজ চোখের সামনে থেকে নামালেন। বাইশ তেইশ বছরের একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একগাদা বই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অথচ তাঁকে চিনতে পারছে না। আশ্চর্য! তিনি অসম্ভব বিরক্ত হলেন। এই এক মজার ব্যাপার! লোকজন তাঁকে চিনতে পারলে তিনি বিরক্ত হন। চিনতে না পারলেও বিরক্ত হন।

'স্যার, আমি কি বসব?'

'হ্যাঁ, বসতে পার।'

মেয়েটা পরবর্তীকালে বেশ কিছু কাজ করল আনাড়ির মতো। চেয়ারটা টানল শব্দ করে। ধপ করে বসল। কিশোরীর কৌতূহল নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল।

'স্যার, ওয়েটার এসে কি অর্ডার নিয়ে যাবে? না আমাকে খাবার আনতে যেতে হবে? এটা কি সেলফ সার্ভিস?

তিনি খবরের কাগজ ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। তাঁর গলার স্বর এমনিতেই রুক্ষ। সেই রুক্ষ স্বর আরো খানিকটা কর্কশ করে বললেন, কোনো রেস্টুরেন্ট সেলফ সার্ভিস কি-না, তারা কি ধরনের খাবার দেবে তা রঙ দেখেই বোঝা যায়। তুমি বুঝতে পারছ না কেন?

'আমি কালার ব্লাইন্ড। বেগুনি এবং গোলাপি এই দু'টি রঙ আমি দেখতে পাই না।'

'ও আচ্ছা। এটা সেলফ সার্ভিস রেস্টুরেন্ট। তোমাকে গিয়ে খাবার আনতে হবে।'

মেয়েটি উঠে চলে গেল। টেবিলের উপর সে কয়েকটি বই রেখে গেছে। সবচে' উপরে রাখা বইটার নাম পড়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল—'অতিপ্রাকৃত গল্পগুচ্ছ', লেখকের নাম আরফব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী, সে পড়ছে অতিপ্রাকৃত গল্প, এর কোনো মানে হয় ? লজিকশূন্য একটি বিষয়ে মানুষের আগ্রহ হয় কি করে কে জানে ! তিনি মনে করেন যারা এ সমস্ত বই লেখে তারা যেমন অসুস্থ আবার যারা পড়ে তারাও অসুস্থ।

মেয়েটি ফিরে আসছে। মুখ শুকনো। খানিকটা বিব্রত। সঙ্গে কোনো খাবারের ট্রে নেই। মেয়েটি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, এখানে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। সামান্য কফির দাম চাচ্ছে একুশ লী।

'তোমার কাছে কি একুশ লী নেই ?'

'আছে। কিন্তু সামান্য কফির জন্যে এতগুলি লী খরচ করব কি-না তাই ভাবছি।'

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এই যে ভাবনাটা তুমি ভাবছ তার মানে তুমি লজিক ব্যবহার করছ। যে মেয়ে লজিক ব্যবহার করে সে কীভাবে অতিপ্রাকৃত গল্পগুচ্ছ পড়ে তা আমি বুঝতে পারছি না।

'এই গল্পগুলির মধ্যেও এক ধরনের লজিক আছে। আপনি যেহেতু কোনোদিন এ জাতীয় গল্প পড়েননি আপনি বুঝতে পারছেন না। স্যার, আপনি এই বইটা নিয়ে যান, পড়ে দেখুন।'

'এ জাতীয় বই আমি আগে পড়িনি তা কি করে বললে ?'

'আপনি হচ্ছেন মহামতি ফিহা। এ জাতীয় বই পড়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি আমাকে চেন ?'

মেয়েটি হেসে ফেলে বলল, আপনাকে কেন চিনব না ? আমি কি এই পৃথিবীর মেয়ে না ?

'কি নাম তোমার ?'

'আমার নাম নুহাশ।'

'পড়াশোনা কর ?'

'না। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির ক্যাটালগার।'

'পটে প্রচুর কফি আছে। তুমি ইচ্ছা করলে কফি খেতে পার।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

নুহাশ সাবধানে কফি ঢালল। কফির পেয়ালায় ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। ফিহার শুরুতে মনে হয়েছিল এই মেয়েটির চেহারা বিশেষত্বহীন। এখন তা মনে হচ্ছে না। এর চেহারায় এক ধরনের মায়া আছে যা মানুষকে আকর্ষণ করে। ফিহার ভুরু কুঁচকে গেল। তাঁর চিন্তায় ভুল হচ্ছে। 'মায়া' আবার কি ? মায়া তৈরি হয় কিছু বিশেষ বিশেষ কারণে। এই মেয়েটির মধ্যে বিশেষ কারণের কি কি আছে ? মেয়েটির কফি শেষ করে রুমালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, এত জঘন্য কফি আমি স্যার জীবনে খাইনি।

ফিহা হেসে ফেললেন। মেয়েটা সত্যি কথা বলেছে। মেয়েটির উপর মায়া তৈরি হবার একটি কারণ পাওয়া গেল, তার মধ্যে সারল্য আছে। আরেকটি জিনিস আছে—মেয়েটি লাজুক কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। লাজুক মানুষের আত্মবিশ্বাস কম থাকে।

'স্যার আমি যাই ? বইটা কি আপনি রাখবেন ?'

'না। আমি আবর্জনা পড়ি না।'

'পড়তে হবে না স্যার। শুধু বইটা হাতে নিন। আপনি বইটা হাতে নিলে আমার ভালো লাগবে। আরফব আমার খুব প্রিয় লেখক।'

ফিহা কঠিন গলায় বললেন, বারবার এক ধরনের কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। তোমাকে তো একবার বলেছি এই আবর্জনা আমি হাত দিয়ে ছোঁব না।

নুহাশের মুখ কাল হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ চোখ ভিজে গেল। দেখেই মনে হচ্ছে মেয়েটা তাঁর কথায় খুব কষ্ট পেয়েছে। এতটা রূঢ় তিনি না হলেও পারতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের উপর দখল কমে আসছে। এটা ভালো কথা না। এই মেয়েটির একজন প্রিয় লেখক থাকতেই পারে। মেয়েটির প্রিয় লেখক যে তারও প্রিয় হতে তবে এমন তো কথা নেই।

'স্যার আমি যাই ? আপনাকে বিরক্ত করে থাকলে ক্ষমা চাচ্ছি।'

মেয়েটা ঘর ছেড়ে যাচ্ছে। যে ভাবে ছুটে যাচ্ছে তাতে মনে হয় অবধারিতভাবে দরজার সঙ্গে ধাক্কা খাবে। হলও তাই। মেয়েটা দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেল।

পদার্থবিদ মহামতি ফিহা কাগজে বড় বড় করে লিখলেন, কফি পান করে তৃপ্তি পেয়েছি। নিচে নাম সই করলেন। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন কমিউন অফিসের দিকে। কমিউন কর্মাধ্যক্ষ মারলা লি'র সঙ্গে তাঁর আজ দেখা করার কথা। এপয়েন্টমেন্ট ছিল সকাল এগারোটায়। এখন বাজছে

সাড়ে এগারো। আধ ঘন্টা দেরি। তার জন্যে মারলা লি বিরক্ত হবেন না। বরং মধুর ভঙ্গিতে হাসবেন। মারলা লি একজন মেন্টালিস্ট। মেন্টালিস্টরা কখনো বিরক্ত হয় না। আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি কোনো মেন্টালিস্ট উঁচু গলায় কথা বলেছে বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের বিরক্ত হবার প্রয়োজন নেই।

ফিহাকে সরাসরি মারলা লি'র ব্যক্তিগত ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরটা অন্ধকার। জানালার ভারি পর্দা টান টান করে বন্ধ করা। দিনের বেলাতেও ঘরে আলো জ্বলছে। সে আলো যথেষ্ট নয়। ফিহা লক্ষ করেছেন সব মেন্টালিস্টদের ঘরই খানিকটা অন্ধকার। সম্ভবত এরা আলো সহ্য করতে পারে না। কিংবা এদের আলোর তেমন প্রয়োজন নেই।

ফিহা বললেন, আমি বোধহয় একটু দেরি করে ফেললাম।

মারলা লি হাসলেন। মেন্টালিস্টদের মধুর হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বিনয় এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন।

'আপনি এসেছেন এতেই আমি ধন্য। আপনার জন্যে খাঁটি কফি তৈরি করা আছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্বাদহীন কফি নয়, ভালো কফি।'

'আমি কফির প্রয়োজন বোধ করছি না।'

ফিহার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। মেন্টালিস্টদের সামনে বসলেই এ-রকম হয়। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। জিভ হয়ে যায় কাগজের মতো। এটা তাঁর একার হয় না সবারই হয়, তা তিনি জানেন না। তিনি প্রচণ্ড রকম ক্রোধ এবং ঘৃণা নিয়ে মারলা লি'র দিকে তাকালেন। মানুষটা শান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে আছে অথচ এর মধ্যেই জেনে গেছে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কফি খেয়ে এসেছেন। মেন্টালিস্টরা তার মাথা থেকে যাবতীয় তথ্য কত সহজে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তিনি তাদের কিছুই জানতে পারছেন না। মারলা লি এই মুহূর্তে কি ভাবছে তা তিনি জানেন না। অথচ সে জানে তিনি কি ভাবছেন। এরা মেন্টালিস্ট। এদের কাছ থেকে কিছুই গোপন করা যায় না। এরা কোনো এক বিচিত্র উপায়ে অন্যের মাথার ভেতর থেকে সমস্ত তথ্য বের করে নিতে পারে। পদ্ধতিটি টেলিপ্যাথিক। তা কি করে কাজ করে ফিহা জানেন না।

মারলা লি বললেন, মহামতি ফিহা, আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?

'আমি চিন্তিত কি-না তা প্রশ্ন করে জানার দরকার নেই। আপনি কি আমার মাথার ভেতরটা খোলা বই-এর মতো পড়ে ফেলতে পারছেন না?'

মারলা লি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, আপনার ধারণা সঠিক নয়। মহামতি ফিহা। আমরা সারাক্ষণ অন্যের মাথার ভেতর বসে থাকি

না। অন্যের ভুবনে প্রবেশ করা স্বাধীনতা হরণ করার মতো। আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে এখানে আসার পর থেকে আমি আপনার মাথা থেকে কিছু জানার চেষ্টা করিনি।

'কিছু জানার চেষ্টা করেন নি?'

'না।'

'তাহলে কেন বললেন যে আপনার কাছে ভালো কফি আছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজে কফি না। এটা বলতে হলে আপনাকে জানতে হবে যে কিছুক্ষণ আগেই আমি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজে কফি খেয়েছি।'

'মহামতি ফিহা, এটা বলার জন্যে আপনার মস্তিষ্কে ঢোকার প্রয়োজন পড়ে না। রেস্টুরেন্টগুলিতে এখন ভূমধ্যসাগরীয় কফি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। কমিউন কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে আমি জানি কখন কোথায় কি পাওয়া যায়। আপনার কাছে কি আমার কথা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে?'

ফিহা চুপ করে রইলেন, কারণ কথাগুলি তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। মারলা লি চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বললেন, আপনাকে আরেকটা কথা বলি। আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে মেন্টালিস্টরা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি আমার অফিসে ঢুকলেন প্রচণ্ড রাগ নিয়ে। আমি ইচ্ছা করলেই মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনার রাগ কমিয়ে দিতে পারতাম। তা কি আমি করেছি? করি নি।

ফিহা বললেন, এই প্রসঙ্গ থাক। কি জন্যে আমাকে তলব করা হয়েছে বলুন। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

'আপনাকে তলব করা হয়নি মহামতি ফিহা। এত স্পর্ধা আমার নেই। আমি নিজেই যেতাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনি জানিয়ে দিয়েছেন আপনার বাড়ির এক হাজার গজের ভেতর যেন কোনো মেন্টালিস্ট না যায়। আমরা আপনার ইচ্ছাকে আদেশ বলে মনে করি। সে কারণেই প্রয়োজন হলেও আপনার কাছে যাই না। অতি বিনীত ভঙ্গিতে আপনাকে আসতে বলি। আশা করি আমাদের এই ধৃষ্টতা আপনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।'

'ক্লান্তিকর দীর্ঘ বিনয় বাক্য আমার পছন্দ নয়। যা বলতে চান বলুন।'

'বলছি। তার আগে একটু কফি দিতে বলি?'

'বলুন।'

কফি চলে এল। মারলা লি নিজের হাতে পট থেকে কফি ঢাললেন। ভালো কফি বলাই বাহুল্য। কফির গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। মারলা লি কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেন্টালিস্টরা সাধারণ মানুষের অকারণ ঘৃণার

কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি সাধারণ মানুষ নন। আপনি হচ্ছেন মহামতি ফিহা। বলা হয়ে থাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ। আপনিও যদি সাধারণ মানুষের মতো ভাবেন তাহলে কি করে হয় ?

'এসব থাক, কাজের কথায় আসুন।'

'কফি শেষ হোক, তারপর আমরা কাজের কথায় আসব। যদিও এখন যে-কথা বলছি তা আপনার কাছে অকাজের কথা হলেও, আমার কাছে কাজের কথা। ফিহা, আপনার কোটের পকেটে আজকের একটা খবরের কাগজ দেখা যাচ্ছে। আপনি কি কাগজটা পড়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন একটা খবর ছাপা হয়েছে। ক্রুদ্ধ জনতার হাতে কুড়ি বছর বয়েসী একজন তরুণী এবং তার চার বছর বয়েসী কন্যার মৃত্যু। এদের অপরাধ—এরা মেন্টালিস্ট। মহামতি ফিহা, ক্ষিপ্ত মানুষের হাতে অসংখ্য মেন্টালিস্টের মৃত্যু ঘটেছে ; কিন্তু আপনি একটি উদাহারণও পাবেন না যেখানে মেন্টালিস্টদের হাতে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।'

ফিহা কফির কাপ নামিয়ে রেখে শান্ত গলায় বলল, কফি শেষ হয়েছে। এখন বলুন কি বলবেন।

'শুনতে পাই আপনি চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছেন ?'

'কোথায় শুনতে পান ?'

'শুনতে পাই বললে ভুল হবে, অনুমান করছি।'

'অনুমানের ভিত্তি কি ?'

'এই বিষয়টি নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। পড়াশোনা করছেন। আপনার কাজের ধরন আমরা জানি। যখন কিছু শুরু করেন অন্য কোনো দিকে তাকান না। কাজটা যখন শেষ হয় তখন আনন্দিত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ান। পাবলিক কফি শপে কফি খেতে যান। এই সময় আপনি রঙচঙে কাপড় পড়তে ভালবাসেন। এইসব লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে...

'মনে হচ্ছে আমি সময় সমীকরণের সমাধান করেছি ?'

'হ্যাঁ। বড় কোনো কাজ শেষ হলে আপনি বিজ্ঞান একাডেমির সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখেন। তাদের নির্দেশ দিয়ে দেন তারাও যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ না করে। গত একুশ দিন ধরে বিজ্ঞান একাডেমির সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই। এই থেকেই অনুমান করছি সমীকরণটির সমাধান আপনি করেছেন।'

'যদি করেই থাকি তাতে আপনার আগ্রহের কারণ কি ?'

'আমি বিজ্ঞান তেমন জানি না। যতটুকু জানি তার থেকে বলতে পারি আপনার সমীকরণ পরীক্ষা করার জন্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। থিওরি এক জিনিস, থিওরির ইনজিনিয়ারিং প্রয়োগ অন্য জিনিস। আমরা প্রয়োগের দিকটি দেখতে চাই। আমরা আপনাকে বলতে চাই যে অর্থ কোনো সমস্যা নয়।'

'শুনে সুখী হলাম। আপনি শুনে দুঃখিত হবেন যে আমি সময় সমীকরণের সমাধান বের করতে পারি নি।'

'পারেন নি?'

'না পারি নি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আমার মাথার ভেতর ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'ছিঃ ছিঃ এসব কি বলছেন? আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আরেকটু কফি কি দিতে বলব?'

'না।'

ফিহা উঠে দাঁড়ালেন। মারলা লি তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। মধুর ভঙ্গিতে বললেন, কষ্ট করে এসেছেন সে জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। মহামতি ফিহা, এই সামান্য উপহার কি আপনি গ্রহণ করবেন?

মারলা লি বড় একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।

ফিহা বললেন, কি আছে এখানে?

'কফি বিনস্। প্রথম শ্রেণীর কফি। অনেক ঝামেলা করে আপনার জন্যে জোগাড় করেছি। গ্রহণ করলে আনন্দিত হব।'

ফিহা প্যাকেটটা হাতে নিলেন। উপহার পেয়ে তিনি যে খুব আনন্দিত হয়েছেন তা মনে হল না। প্যাকেটটা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলতে পারলে তিনি সবচে' আনন্দিত হতেন। তা সম্ভব নয়। মেন্টালিস্টরা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারবে। তার ফলাফল শুভ হবে না।

আচ্ছা কফির এই প্যাকেটটা লাইব্রেরির মেয়েটাকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? বেচারিকে তিনি কিছুটা হলেও আহত করেছেন। কফির প্যাকেট পেলে খুশি হবে। মেয়েটার কাছ থেকে অতিপ্রাকৃত গল্পের বইটাও চেয়ে নেয়া যায়। একটা গল্প পড়লে কিছু যায় আসে না।

ফিহা লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যোগাযোগ হাঁটতে হাঁটতেই করা গেল। পকেটে রাখা কম্যুনিকেটর তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। ফিহাকে পরিচয় দিতে হল না। যে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির কম্যুনিকেটর তিনি ব্যবহার করেন তা সবারই মোটামুটি পরিচিত।

লাইব্রেরির ডিরেক্টর খানিকটা ভীত গলায় বলল, কি ব্যাপার স্যার?

'কোনো ব্যাপার না। আপনাদের একজন ক্যাটালগারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তার নামটা কি বলবেন?'

ফিহার ভুরু কুঞ্চিত হল। নামটা তাঁর মনে পড়ছে না। নাম মনে রাখার চেষ্টা করেন নি বলেই মনে নেই। অপ্রয়োজনীয় কিছু মনে রাখার চেষ্টা করে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করার তিনি কোনো কারণ দেখেন না।

'নাম মনে পড়ছে না। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে। অতিপ্রাকৃত গল্প পছন্দ করে। কফি খেতে ভালবাসে।'

'স্যার, আপনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন তার নাম কি 'নুহাশ?'

'হ্যাঁ নুহাশ।'

'স্যার, আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি, একটু ধরুন স্যার। এক মিনিট।'

তিনি কম্যুনিকেটরের বোতাম চেপে রাখলেন। এক মিনিট অপেক্ষা করার কথা, এক মিনিট কুড়ি সেকেন্ডের মাথায় লাইব্রেরির ডিরেক্টরের গলা পাওয়া গেল—

'স্যার, একটি ক্ষুদ্র সমস্যা হয়েছে। মেয়েটি বাড়ি চলে গেছে। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছে। ক্যাটালগ সেকশনে গিয়ে জানতে পারলাম কি একটা কারণে খুব মন খারাপ করে আজ সে লাইব্রেরিতে এসেছিল। একটা বই ছিড়ে কুটিকুটি করেছে। বইটা হল "অতিপ্রাকৃত গল্পগুচ্ছ"। তারপর বাসায় চলে গেছে। স্যার আমি কি বেশি কথা বলছি?'

'তা বলছেন।'

'ক্ষমা প্রার্থনা করছি স্যার। মেয়েটা থাকে সাধারণ আবাসিক প্রকল্পের ১১৮নং কক্ষে। তাকে আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।'

'তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'মেয়েটির কম্যুনিকেটরের সুবিধা নেই, থাকলে এক্ষুণি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতাম। অত্যন্ত দুঃখিত স্যার।'

'আপনার এত দুঃখিত হবার কিছু নেই।'

'তাকে কি কিছু বলতে হবে?'

'কিছুই বলতে হবে না। ধন্যবাদ।'

ফিহা কম্যুনিকেটরের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। তিনি অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে এগুচ্ছেন। পা ফেলছেন অতি দ্রুত। তবে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন না। বাড়ি ফিরতে কেন জানি ইচ্ছা করছে না। তাঁর মাথায় সিনথেটিক ফারের টুপি, টুপিতে চেহারা ঢাকা পড়েছে। অন্তত তাঁর তাই ধারণা। কফির প্যাকেটটা ফেলে দিতে হবে।

কোনো ডাস্টবিন পাচ্ছেন না। এই জিনিস ডাস্টবিন ছাড়া কোথাও ফেলা যাবে না। ফিহা কফির প্যাকেটটা ছুড়ে ফেললেন। তাঁর লক্ষ ভালই। প্যাকেটটা ডাস্টবিনে পড়ল।

ফিহা আকাশের দিকে তাকালেন।

সূর্য দেখা যাচ্ছে না। মেঘে ঢাকা পড়েছে। আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষ সূর্যকে পূজা করত। চন্দ্রকে পূজা করত। গ্রহ-নক্ষত্রকেও পূজা দেয়া হত। আকাশকে করত না কেন? পূজা পাওয়ার যোগ্যতা আকাশের চেয়ে বেশি আর কার আছে? ঈশ্বরকে সীমার ভেতর কল্পনা করা অনুচিত। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র সবই সীমায় আবদ্ধ। একমাত্র আকাশই সীমাহীন।

'স্যার!'

ফিহা চমকে তাকালেন।

দীর্ঘদেহী সবুজ পোশাক পরা যুবকটি বলল, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?

'আমাকে একমাত্র আমিই সাহায্য করি। অন্য কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না। আপনি কে?'

'আমি স্যার টহল পুলিশ।'

'ও আচ্ছা, টহল পুলিশ। আপনার গায়ের সবুজ পোশাক দেখেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল।'

'আপনি কি কোনো ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি কেউ ঠিকানা খোঁজে?'

'আপনি আকাশের দিকে তাকিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে। আমি অনেকক্ষণ ধরেই আপনাকে অনুসরণ করছি। লক্ষ করছি আপনি রাস্তার নাম্বার পড়তে পড়তে এগুচ্ছেন।'

'অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে অনুসরণ করছেন কেন?'

'আমাদের উপর নির্দেশ আছে যে কেউ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটলেই তাকে অনুসরণ করতে হবে। আপনাকেও সেই কারণে অনুসরণ করছি। আপনি যে মহামতি ফিহা তা মাত্র কিছুক্ষণ আগে বুঝতে পেরেছি।'

'অটোগ্রাফ চাইলে অটোগ্রাফ নিতে পারেন।'

'স্যার, আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন?'

'না, বিরক্ত হইনি।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি যেখানে যেতে চান নিয়ে যাব।'

'এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে আকাশের দিকে যেতে, আপনার গাড়িতে চড়ে সেই ইচ্ছা মেটানো সম্ভব নয়। আমরা এখন আছি কোথায় ?'

'আপনি স্যার শহরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। আর মাত্র দশ গজ গেলেই নিষিদ্ধ এলাকায় চলে যাবেন।'

'মেন্টালিস্টদের এলাকা ?'

'জি স্যার।'

'মেন্টালিস্টদের এলাকা কতটুকু ?'

'আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় স্যার। ঐ এলাকা আমার জন্যেও নিষিদ্ধ।'

'কতজন মেন্টালিস্ট এ শহরে আছে তা জানেন ?'

'তাও জানি না। তাদের সংখ্যা কখনো প্রকাশ করা হয় না। তবে এ শহরে সাধারণ মানুষ এই মুহূর্তে আছে নব্বুই হাজার সাতশ' এগারো জন।'

'গত বছরেও জনসংখ্যা ছিল এক লাখ কুড়ি হাজারের মতো। কমে গেল কেন ?'

'আমার জানা নেই স্যার।'

'আপনার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হচ্ছে তা মেন্টালিস্টরা বুঝতে পারছে ?'

'পারছে স্যার। পুলিশের উপর এদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আছে।'

মেন্টালিস্টদের আবাসিক এলাকা কি একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ না সারা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ?'

'এরা বাস করে ভূগর্ভস্থ শহরে। সেই শহর কত বড়, কতটুকু ছড়ানো তা আমরা জানি না স্যার। আগে কেউ কেউ বাইরে থাকত, এখন নেই বললেই চলে।'

'আপনার নাম কি ?'

'এরিন।'

'এরিন, আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে আমরা মানুষ হিসেবে দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে গেছি ? একদল থাকছে মাটির উপরে, একদল চলে গিয়েছে মাটির নিচে।'

'এইসব নিয়ে আমি ভাবি না স্যার।'

'কেউই ভাবে না। কেন ভাবে না বলুন তো ?'

'জানি না স্যার।'

ফিহা ক্লান্ত গলায় বললেন, আমাদের ভাবতে দেয়া হয় না। আমাদের ভাবনা, আমাদের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত। আমরা কি ভাবব মেন্টালিস্টরা তা ঠিক করে

দেয়। যখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় আমাদের সুখী হওয়া উচিত, আমরা সুখী হই। যখন ভাবে আমাদের অসুখী হওয়া উচিত, আমরা অসুখী হই।

'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি কিন্তু স্বাধীনভাবেই চিন্তা করছেন।'

'হ্যাঁ তা করছি এবং অবাক হচ্ছি। আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে আসুন, আমি একটা জায়গায় যাব। সাধারণ আবাসিক প্রকল্প। ১১৮ নম্বর কক্ষ। একটি অল্পবয়স্ক মেয়ের সঙ্গে কথা বলব বলে ভাবছি, মেয়েটির নাম নুহাশ।

এরিন লম্বা লম্বা পা ফেলে গাড়ি আনতে রওনা হল। ফিহা দাঁড়িয়ে আছেন প্রশস্ত রাস্তার এক পাশের ফুটপাতে। পনেরো মিনিট পর পর স্বয়ংক্রিয় ট্রাম যাচ্ছে, এ ছাড়া রাস্তায় যানবাহন বা লোক চলাচল নেই। প্রাণহীন একটি শহর। সারাদিন হেঁটেও তিনি কোনো শিশুর দেখা পান নি। শিশুসদনগুলি শহরের বাইরে। বাবা-মা'র সঙ্গে শিশুদের রাখা হয় না। তারা বড় হয় শিশুসদনে। বছরে একবার অল্পকিছু সময়ের জন্যে বাবা-মা'রা শিশুদের দেখতে যেতে পারেন।

আচ্ছা, মেন্টালিস্টদের শিশুরা কোথায় বড় হয়? তাদের শিশু সনদগুলি কোথায়? তিনি জানেন না। ফিহা ক্লান্ত বোধ করছেন। শীত লাগছে। আজ কত তারিখ, কি বার তিনি কিছুই জানেন না। তিনি ছুটি ভোগ করছেন। ছুটির সময় কিছুই মনে রাখতে চান না। ছুটি কাটান শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য কিছুই দেখতে ইচ্ছা করে না।

তাঁর বয়স পঞ্চাশ। অনেকখানি সময়ই তিনি পার করে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ে একবারও কেন মনে হল না বাইরে যেতে? মেন্টালিস্টরা সেই ইচ্ছা জাগতে দেয় নি। তিনি বিয়ে করেন নি। কখনো কোনো তরুণীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। কেন করেছেন? মেন্টালিস্টরা কি তাকে প্রভাবিত করেছে? শুধু তিনি একা নন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিটি বিজ্ঞানীই চিরকুমার। তিনি একা হলে ব্যাখ্যা হয়তো অন্য রকম হত। তিনি তো একা নন।

মেন্টালিস্টরা বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করছে। কারণ বিজ্ঞানীদের কাজ তাদের প্রয়োজন। এই কাজ তারা আদায় করে নেবে। বিজ্ঞানীরা তাদের কাছে রোবট ছাড়া কিছুই নয়। একদল পুতুল, যে-পুতুলের সুতা মেন্টালিস্টদের হাতে।

মেন্টালিস্টরা এক সূক্ষ্মভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করে তা ভেবে ফিহা অতীতে অসংখ্যবার বিস্মিত হয়েছেন। ভবিষ্যতেও হয়তো হবেন। কিন্তু এখন আর বিস্মিত হতে ইচ্ছা করে না।

একবার গ্র্যেগরিয়ান এ্যানালাইসিস নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়লেন। বিষয়টির উপর তাঁর তেমন দখল নেই। অথচ সময় সমীকরণে গ্র্যেগরিয়ান এ্যানালাইসিস অসম্ভব জরুরি। নতুন করে এই জিনিস শিখতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তায় বাধা পড়বে। এই অবস্থায় হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলেন প্র্যেগরিয়ান এ্যানালাইসিসের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক শরমন তুদ্রা অঞ্চল থেকে এখানে আসছেন। তাঁর শরীর অসুস্থ। তিনি এখানে এসে শরীর সারাবেন।

এই ব্যবস্থা কি মেন্টালিস্টরা করে দিল না ?

সব কিছুই তারা করে দিচ্ছে। সব কিছু এগুচ্ছে তাদের পরিকল্পনায়। তাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়া কি খুব অসম্ভব ? যা তাঁর ইচ্ছা করছে না সেই কাজটি করলে কেমন হয় ?

তাঁর শহর ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, শহর ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয় ? নারীসঙ্গ তাঁর প্রিয় নয়, তিনি যদি এখন নুহাশ নামের মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলেন তাহলে কেমন হয় ? অবশ্যি মেয়েটির তাতে মত থাকতে হবে। মত না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বিজ্ঞানীরা স্বামী হিসেবে মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

ফিহা আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর হাসি পাচ্ছে। হো হো করে খানিকক্ষণ হাসা যেতে পারে। না কি মেন্টালিস্টরা তাকে হাসতেও দেবে না ?

এরিন গাড়ি নিয়ে এসেছে। সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, একটু দেরি হল স্যার। অনেকদূর যেতে হবে তাই নতুন সেল লাগিয়ে নিয়ে এসেছি।

'অনেক দূর যেতে হবে কি ?'

'জি স্যার। শহরের অন্যপ্রান্তে।'

'চল, রওনা হওয়া যাক।'

নুহাশ দরজা খুলল।

ফিহা বললেন, 'কেমন আছ নুহাশ ?'

নুহাশ তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এটা কি কোনো স্বপ্নদৃশ্য ? সে কি ঘুমুচ্ছে ? মানুষটিকে সে দেখছে ঘুমের মধ্যে ?

'আমাকে চিনতে পারছ আশা করি।'

নুহাশ জবাব দিচ্ছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার জন্যে এক প্যাকেট কফি নিয়ে আসছিলাম। ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি বলে আনা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে আনলেও হত। তুমি কি আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে, না দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখবে ?

নুহাশ তাকিয়ে আছে। কথা বলার চেষ্টা করছে, বলতে পারছে না। ফিহা বললেন, আমার অবশ্যি ভেতরে যাবার তেমন প্রয়োজন নেই। তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলা দরকার। বলে চলে যাব। খুব মন দিয়ে শোন। তার আগে জানা দরকার তুমি কি বিবাহিত ?

নুহাশ না-সূচক মাথা নাড়ল।

ফিহা বললেন, আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিলাম। কোনো তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। একমাত্র তোমার সঙ্গেই সামান্য পরিচয়। কাজেই আমি এসেছি তোমার কাছে। যদি আমাকে তোমার পছন্দ হয়, যদি মনে হয় আমাকে বিয়ে করা যেতে পারে তাহলে আমার কাছে চলে আসবে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। অসময়ে আসার জন্যে লজ্জিত।

নুহাশ কাঁপা গলায় বলল, একটু বসে যান।

ফিহা বললেন, না বসব না। তুমি আমার কারণে তোমার একটি প্রিয় গ্রন্থ ছিঁড়েছ। তা ঠিক হয়নি। যে প্রিয় সে সব সময় প্রিয়। আমি খারাপ বললেই কি প্রিয়জন অপ্রিয় হবে ? তুমি অবশ্যই আরেকটি বই কিনে নেবে। মনে থাকবে ?

নুহাশ হাসছে। লাজুক ভঙ্গিতে হাসছে। ফিহা তা লক্ষ করলেন না। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। নুহাশ এখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এখন দেখাচ্ছে রোবটের মতো, চোখের পলক ফেলছে না।

ফিহা রাস্তায় নেমে পুরো ব্যাপারটা মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। এটা নিয়ে এখন তিনি আর ভাববেন না। মেয়েটা যদি সত্যি আসে তখন দেখা যাবে। শুধু শুধু চিন্তা ভাবনা করার কোনো মানে হয় না। তাঁর অনেক কাজ।

এরিন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফিহা বললেন, তুমি আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও। তুমি করে বলায় রাগ করনি তো ?

এরিন হাসল। সুন্দর দেখাল এরিনকে। হাসলে সবাইকে সুন্দর দেখায়।

'এরিন তুমি কেমন আছ ?'

'জ্বি ভালো।'

'এই চাকরি কি তুমি পছন্দ কর ?'

'করি।'

'তুমি কি বিবাহিত ?'

'না। পুলিশদের বিয়ে করার নিয়ম নেই।'

'কাদের তৈরি নিয়ম এরিন ?'

'মেন্টালিস্টদের নিয়ম।'

গাড়ি ছুটে চলেছে। ফিহার ঝিমুনি ধরে গেছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ফিহার বাড়িটা প্রকাণ্ড। অনেকটা দুর্গের মতো। উঁচু পাচিল, পাঁচিলের উপর কাঁটা তার। পাঁচিল থেকে এক হাজার গজ দূরে মূল রাস্তায় সাইনবোর্ড লাগানো।

মেন্টালিস্টদের প্রবেশ কাম্য নয়।

আমি নীরবতা পছন্দ করি।

ফিহা

এ জাতীয় লেখা ফিহার পক্ষেই লেখা সম্ভব। মেন্টালিস্টরা এই পথে যাওয়া-আসা করে। সাইবোর্ড দেখে। কেউ কেউ এক মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ায়। তবে কখনো বলে না, এ জাতীয় সাইনবোর্ডের মানে কি ? মেন্টালিস্টদের প্রধান গুণ তারা অভিযোগ করে না, বিরক্তি প্রকাশ করে না এবং কখনোই রাগ করে না। তাছাড়া ফিহার উপর রাগ করার প্রশ্ন উঠে না। উনি এসবের ঊর্ধ্বে। অন্যের রাগ ভালবাসা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই।

মানুষটি জন্ম থেকেই নিঃসঙ্গ। বিশাল বাড়িটায় থাকেন একা। মাঝখানে কিছুদিন কুকুর পুষেছিলেন। দু'টি শিকারী কুকুর, এদের পছন্দও করতেন। এক গভীর রাতে টাইম ডিপেনডেন্ট ইরেটা ফাংশান নিয়ে ভাবছিলেন। কুকুরের ডাকে চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত মুখে হুকুম দিলেন কুকুর দু'টাকে এই মুহূর্তে বিদেয় কর। কুকুর বিদেয় হয়ে গেল। তারপর পাখি পোষার শখ হল। চার পাঁচ ধরনের পাখি যোগাড় হল। এক সময় তাদের চিৎকারও অসহ্য বোধ হল। এখন আর পাখি নেই—খাঁচা পড়ে আছে।

এ বাড়িতে বর্তমানে কোনো মানুষ নেই। তিনটি রোবট আছে। তিনটিই কর্মী রোবট। দু'জনের বুদ্ধিশুদ্ধি নিচের দিকে। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু প্রায় জানে না বললেই হয়। একটি রোবটের দায়িত্ব হচ্ছে ঘর গুছিয়ে রাখা এবং রান্না করা। তার নাম লীম। লীম দিনরাত এইটি করে। খুব যে ভালো করে তাও না। রান্নায় লবণের পরিমাণ কখনোই ঠিক হয় না। বাকি দু'টি রোবটের একটির কাজ বাড়ি পাহারা দেয়া। সে ক্রমাগত বাড়ির চারদিকে হাঁটে। তৃতীয় রোবটের কোনো কাজকর্ম নেই। এই রোবটটি 'PR' টাইপের। বুদ্ধিবৃত্তি বাকি দু'জনের মতো নিচের দিকে নয় বরং বেশ ভালো। ফিহা তাকে কিনেছিলেন নিজের কাজে সাহায্য করার জন্যে। শেষটায় মত বদলেছেন। রোবটের সাহায্য তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। এখন রোবটটার কাজ হচ্ছে দিনরাত বারান্দায় বসে বই পড়া। ফিহা একে খানিকটা পছন্দ করেন। 'পাঠক' নামে ডাকেন। মাঝে মধ্যে ডেকে কথাবার্তা বলেন। 'PR' টাইপের রোবটের বড় ত্রুটি হচ্ছে

এরা গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। অপ্রয়োজনে দীর্ঘ বাক্য বলে। কথা বলতে এরা পছন্দ করে। ফিহা বাইরে থেকে এলে চেষ্টা করবে একগাদা কথা বলতে।

আজ ফিহা গেট দিয়ে ঢুকতেই সে এগিয়ে গেল এবং একঘেয়ে গলায় বলল, স্যার আজ আপনি দু'ঘণ্টা একত্রিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড বাইরে কাটিয়েছেন। ন' তারিখ আপনি বাইরে ছিলেন। সেদিন আপনি ছিলেন এক ঘণ্টা চল্লিশ সেকেন্ড। আবার তিন তারিখে...

'চুপ কর।'

পাঠক চুপ করে গেল। তবে তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ফিহার পেছনে পেছনে আসতে আসতে বলল, স্যার, আপনার কি মনে আছে কাল রাতে আপনি বাগানে এসে বললেন, "আজ তো আকাশে অনেক তারা।" আপনার কথা শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই কোন সময় আকাশে তারা বেশি দেখা যায় তা বের করব। বের করতে গিয়ে পড়াশোনা করেছি এবং কিছু মজার তথ্য...

ফিহা দ্বিতীয়বার বললেন, চুপ কর।

তিনি জানেন পাঠক চুপ করবে না। তবে অসুবিধা নেই। তিনি এখন তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে যাবেন। পাঠক শোবার ঘরে ঢুকবে না। তাকে সে অনুমতি দেয়া হয় নি। সে খাবার ঘরে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবে ফিহার জন্যে। ফিহার দেখা পেলে কোনো একটা আলাপ শুরুর চেষ্টা করবে। ফিহা ঠিক করলেন তাকে এই সুযোগ দেবেন না। শোবার ঘর থেকে বের হবেন না। তাঁর মন বেশ খারাপ। খেতেও ইচ্ছা করছে না। মেন্টালিস্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই তাঁর মেজাজ আকাশে চড়ে যায়।

শোবার ঘরের চেয়ারে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে তিনি মত বদলালেন। নিজেকে কষ্ট দেবার কোনো মানে হয় না। খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। 'পাঠকে'র সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পও করা যায়। বেচারা গল্প করতে পছন্দ করে। গল্প করার সঙ্গী নেই।

ফিহা খাবার ঘরে ঢুকলেন।

পাঠক সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কি কথা বলতে পারি স্যার ?

'না।'

ফিহা খেতে বসলেন। আজও লবণ কম হয়েছে। শুধু কম না, বেশ কম। অথচ দু'দিন আগে প্রতিটি খাবারে অতিরিক্ত লবণ ছিল। এই রোবটটা মনে হয় বদলানো দরকার। ফিহা বিরক্ত মুখে বললেন, লবণের জন্যে তো কিছু মুখে দিতে পারছি না। তুমি কি লবণের ব্যাপারটা কিছুতেই ঠিক করতে পারবে না ?'

লীম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার কিছু বলার নেই। পাঠক বলল, লবণ প্রসঙ্গে আমি কি একটা ছোট্ট কথা বলতে পারি স্যার ?'

'না।'

'আপনার নিষেধ অগ্রাহ্য করেই কথাটা বলার ইচ্ছা হচ্ছে, যদিও জানি তা সম্ভব না। আপনাকে আবারো অনুরোধ করছি লবণ সম্পর্কে আমাকে কথাটা বলতে দিন।'

'বল।'

'আমাদের রোবট লীম লবণের পরিমাণে কোনো ভুল করে না। সমস্যাটা আপনার।'

'সমস্যা আমার মানে ?'

'আপনার যখন মন-টন ভালো থাকে, তখন আপনি লবণ কম খান। আবার যখন মেজাজ খারাপ থাকে লবণ বেশি খান। আমি দীর্ঘ দিন পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। মনে হয় মেজাজ খারাপ থাকলে আপনার শরীর বেশি ইলেকট্রোলাইট চায়। শরীরবিদ্যার কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করা যায়। আমি চারজন বিশেষজ্ঞের ঠিকানা জোগাড় করেছি। আপনি কি কথা বলতে চান ?'

'কথা বলতে চাই না।'

'বাইরে গেলেই আপনার মেজাজ খারাপ হয় এর কারণ কি ?'

'ফিহা জবাব দিলেন না। পাঠক বলল, মেন্টালিস্টদের নিয়ে আপনি কি খুব বেশি চিন্তা করেন ?

'না। তুমি কথা বলা বন্ধ কর।'

'এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে যদি আপনার খারাপ লাগে তাহলে অন্য বিষয়ে কথা বলি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মরহস্য নিয়ে কি স্যার আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করব ?'

'পাঠক !'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার কথা বলার জন্যে কি এখন সঙ্গী দরকার ?'

পাঠক প্রথমবারের মতো প্রশ্নের জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে। ফিহা বললেন, নুহাশ নামে একজন তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। শতকরা কুড়িভাগ সম্ভাবনা সে এ বাড়িতে আসবে। যদি আসে তুমি কথা বলার সঙ্গী পাবে।

'আমি স্যার শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলাতেই আগ্রহ বোধ করি।'

'কেন ?'

'আমি চিন্তা করছি আপনার একটা জীবনী লিখব। জীবনী লেখার জন্যে আপনার সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রয়োজন। তথ্য তেমন কিছু নেই। তাই সারাক্ষণ কথা বলতে চেষ্টা করি, যদি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কোনো তথ্য পেয়ে যাই।'

'কিছু পেয়েছ ?'

'জ্বি স্যার।'

'কি পেলে ?'

'আমি যে অল্প কয়েক পাতা লিখেছি আপনি কি পড়তে চান ?'

'না।'

'আপনার জীবনী গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি যে 'না' শব্দটা আপনার প্রিয়। যখন তখন আপনি 'না' বলেন। মাঝে মধ্যে কিছু না ভেবেই বলেন। জীবনী গ্রন্থের শুরুটা একটু দেখে দিলে ভালো হয়। অনেক মজার মজার জিনিস সেখানে আছে। যেমন ধরুন, শুরুতেই একটা চমক আছে। পাঠক শুরুর কয়েকটি লাইন পড়েই চমকে উঠবে—'

'শুরুটা কি ?'

'শুরু হচ্ছে—মহামতি ফিহা বড় হয়েছেন একটি মেন্টালিস্ট পরিবারে। এই পরিবারটি ফিহাকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে নিয়েছিলেন। পরম আদর এবং মমতায় ফিহাকে তাঁরা লালন পালন করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর এই বালকটির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে মেন্টালিস্ট পরিবারের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই। বার বছর বয়সে ফিহা ঐ মেন্টালিস্ট পরিবার ছেড়ে চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে কোনোদিনও তিনি তাঁর পালক পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি।'

পাঠক থামল। ফিহা মূর্তির মতো বসে আছেন। পাঠক বলল, আমি কি কোনো ভুল তথ্য দিয়েছি স্যার ?'

'না। সব ঠিকই আছে।'

'জীবনী গ্রন্থের ভাষাটা আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে ?'

'ভাষার বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

আমি জীবনী গ্রন্থটি কয়েক ধরনের ভাষা ব্যবহার করে লিখেছি। একই জিনিস খুব কাব্যিকভাবেও লিখেছি। যেমন...

ফিহা উঠে পড়লেন। পাঠকও উঠে দাঁড়াল। ফিহা বললেন, পাঠক, তুমি আমার মেন্টালিস্ট বাবা-মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বলবে, আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

'এটা তো স্যার সম্ভব না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের একটা ইন্টারভ্যু নেয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভূগর্ভস্থ মেন্টালিস্টরা সবার যোগাযোগের বাইরে।'

ফিহা শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। অস্থির ভাব আবার ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে এসেছে তাই না। দ্রুত বাড়ছে। তিনি এই অস্থিরতার ধরন জানেন। এ অন্য ধরনের অস্থিরতা। ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি কি নিজেকে শান্ত করবেন ? না, তার প্রয়োজন নেই। অস্থিরতার প্রয়োজন আছে। তিনি সময় সমীকরণের খুব কাছাকাছি আছেন। তিনি জানেন তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে। সমীকরণের সমাধান অবচেতন মনের কাছে চলে এসেছে। চেতন মন বা তাঁর জাগ্রত সত্তা সেই সমাধান এখনো পায় নি। তবে পেয়ে যাবে। খুব শিগগিরই পেয়ে যাবে। এখন প্রয়োজন নিজেকে শান্ত রাখা। সর্বযুগের সর্বকালের সবচে' বড় আবিষ্কারটির মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

সময় সমীকরণের সমাধান।

এর ফলাফল কি হবে ? মানবজাতি কি উপকৃত হবে ? না ধ্বংস হয়ে যাবে ? এই মুহূর্তে তা বলা যাচ্ছে না। কিছু ব্যাপার আছে যা আগে বলা যায় না, যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। মেন্টালিস্টদের কথাই ধরা যাক।

মেন্টালিস্ট তৈরি করা হয়েছিল যে উদ্দেশ্যে তা সফল হয় নি। মানবজাতি আজ দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতাধর মেন্টালিস্ট। অন্যদিকে মানসিক ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষদের নিয়ন্ত্রিত করছে মেন্টালিস্টরা। সাধারণ মানুষ তাদের হাতের পুতুলের মতো। হাসতে বললে হাসতে হবে, কাঁদতে বললে কাঁদতে হবে। তারা বাধ্য করবে। সেই ক্ষমতা তাদের আছে। তারা এগুচ্ছে খুব ঠাণ্ডা মাথায়। পুরো মানবগোষ্ঠীকে মেন্টালিস্ট বানানোই তাদের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কিছুতেই শুভ হতে পারে না। প্রকৃতি মানবগোষ্ঠী চায় নি। এটা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা।

ফিহা কম্যুনিকেটর-এ হাত রাখলেন। কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। একজন মেন্টালিস্টের সঙ্গে কথা বলা দরকার। যে-কেউ হতে পারে। মারলা লি'র সঙ্গেই কথা বলা যায়।

মারলা লি বিস্মিত গলায় বললেন, গভীর রাতে আপনি ? কি ব্যাপার মহামতি ফিহা ?'

'রাত কি খুব বেশি হয়েছে ?'

'মন্দও হয়নি। এগারোটা বাজে।'

'আমি কি আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম ?'

'বিছানা থেকে তুললেন। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকরাত পর্যন্ত পড়ি। আপনার মতো আমারো রাত জাগা স্বভাব। কি ব্যাপার জানতে পারি ?

'মেন্টালিস্টদের সম্পর্কে আমি কিছু পড়াশোনা করতে চাই।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কি এই বিষয়ে বইপত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন ? বইপত্র নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে।'

'আছে। কিন্তু মহামতি ফিহা, এইসব বইপত্র আমাদের জন্যে। যারা মেন্টালিস্ট নয় তাদের কাছে বইপত্র দেয়া নিষেধ আছে।'

'নিষেধ আছে বলেই আপনার কাছে চাচ্ছি।'

'আপনার বিষয় পদার্থবিদ্যা। পড়শোনা সেই বিষয়ে সীমিত রাখাই কি ভালো নয় ?'

'তার মানে কি আপনি আমাকে বই দিতে পারবেন না ?'

'আপনি চেয়েছেন, অবশ্যই আপনাকে দেয়া হবে।'

ফিহা বললেন, ধন্যবাদ। আমি কম্যুনিকেটর বন্ধ করে দেব। তার আগে একটি জিনিস জানতে চাই। মেন্টালিস্ট সমাজের সবচে' দুর্বল দিক কি ?

'আমাদের কোনো দুর্বল দিক নেই।'

'ভুল বললেন্। আপনাদের সমাজের সবচে' দুর্বল দিক হচ্ছে এই সমাজে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ নেই। আপনাদের কোনো বিজ্ঞানী নেই, কবি নেই, গল্পকার নেই, শিল্পী নেই...আমি কি ভুল বললাম ?'

'না ভুল বলেন নি। তবে

'তবে কি ?'

'আজ থাক। অন্য সময় এই নিয়ে কথা বলব। শুভ রাত্রি মহামতি ফিহা। আমি মেন্টালিস্টদের নিয়ে লেখা ছোট্ট একটা বই পাঠাব। বইটা পড়ার পর আপনার আর কিছু পড়তে ইচ্ছা করবে না। বইটা কাল ভোরে পাঠালে কি হয় ?'

'আজ রাতে পাঠাতে পারবেন ?'

'অবশ্যই পারব।'

'আরেকটি কথা।'

'বলুন।'

'আমি যদি বিয়ে করতে চাই তাহলে কি আপনাদের অনুমতি প্রয়োজন আছে ?'

'আপনার জন্য নেই। আপনি কি বিয়ের কথা ভাবছেন?'

ফিহা কম্যুনিকেটর বন্ধ করে দিলেন। নিজের উপর রাগ লাগছে। শুধু শুধু এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

মারলা লি বিছানা থেকে নামলেন। কাপড় পাল্টালেন। গাড়ি বের করতে বললেন। রোবট নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নয়—নিজে চালাবেন এমন গাড়ি। গভীর রাতে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে, গাড়ি চালানোয় আনন্দ আছে।

আজ রাস্তাঘাট অন্যসব রাতের চেয়েও ফাঁকা। বিজ্ঞান পল্লী 'ধী ১১'-র মানুষজন মনে হয় আতঙ্কগ্রস্ত। বিক্ষিপ্তভাবে নানান জায়গায় মেন্টালিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে। মানুষজন রাস্তায় বেরুচ্ছে না।

মারলা লি গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে চলে এলেন। হাইওয়ের পেট্রল পুলিশের গাড়ি জায়গায় জায়গায় থেমে আছে। পেট্রল পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

মারলা লি'র গাড়ির ড্যাসবোর্ডে জরুরি সংবাদজ্ঞাপক লাল বোতাম দু'টি ক্রমাগত জ্বলছে নিভছে। জরুরি কোনো খবর আছে। জরুরি খবর শুনতে ইচ্ছা করছে না। তবু অভ্যাসের বসে বোতাম টিপে দিলেন। আবহাওয়া দপ্তর ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক সতর্ক সংকেত প্রচার করছে। ঘূর্ণিঝড়টির বিজ্ঞান পল্লী 'ধী-১১'-র উপর দিয়ে উড়ে যাবার একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সতর্ক ব্যবস্থা হিসেবে পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মারলা লি'র ভুরু কুঞ্চিত হল।

লোহার ভারি গেট। কোনো কলিং বেল নেই। মারলা লি বেশ কয়েকবার গেটে ধাক্কা দিলেন। সেই শব্দ বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছল কি-না তিনি বুঝতে পারছেন না। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? মারলা লি আবার গেটে ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, রোবটের পায়ের শব্দ। মাটি কাঁপিয়ে রোবট আসছে। কি ধরনের রোবট? এত ভারি রোবটতো আজকাল তৈরি হয় না।

গেট খুলল না। গেটের একটা জানালা খুলে গেল। মুখ বের করল পাঠক। তার ইরিডিয়ামের চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে। সে আনন্দিত স্বরে বলল, বই নিয়ে এসেছেন?

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে দিন। দিয়ে চলে যান।'

'তোমার কাছে দেয়া যাবে না। বইটি মূল্যবান, আমাকেই পৌঁছে দিতে হবে ফিহার কাছে।'

'আপনি বিনা দ্বিধায় আমার হাতে দিতে পারেন। আমি ফিহার একজন ব্যক্তিগত সহকারী। আমার নাম পাঠক। ফিহা আমাকে খুবই পছন্দ করেন।'

'ফিহা তোমাকে খুব পছন্দ করেন জেনে আনন্দিত হচ্ছি। ফিহা আমাকে তেমন পছন্দ করেন না, তবু আমাকেই বইটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে।'

গেটের জানালা বন্ধ হয়ে গেল। পাঠক ধুপ ধুপ শব্দে ফিরে যাচ্ছে। মারলা লি লক্ষ করলেন বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। তাপমাত্রা আরো নেমে গেছে। তিনি গাড়ির ভেতর গিয়ে বসবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। পাঠক নামের এই রোবটটি কতক্ষণে ফিরবে কে জানে। পি আর ধরনের রোবট। এদের কাজকর্ম ঢিলেঢালা ধরনের, তবে এদের লজিক খুব উন্নত। তারচে' বড় কথা এরা আশেপাশের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করে। যতই দিন যায় ততই এদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

গেট খুলে গেল। পাঠক বলল, ভেতরে আসুন স্যার। ফিহা লাইব্রেরি ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনাকে খুব সাবধানে আসতে হবে। ভেতরে আলো নেই। ইচ্ছা করলে আপনি আমার হাত ধরতে পারেন।

মারলা লি শান্ত স্বরে বললেন, হাত ধরার প্রয়োজন নেই। তুমি আগে আগে যাও।

ফিহা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। মনের বিরক্তি গোপন করার কিছুমাত্র চেষ্টা করলেন না। মারলা লি বললেন, এত রাতে কাউকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করল না। আমি নিজেই বইটি নিয়ে এসেছি। যদিও জানি অনধিকার চর্চা হয়েছে। আমি একজন মেন্টালিস্ট আপনার বাড়ির এক হাজার গজের ভেতরে আমার আসার কথা না। তবু এসেছি।

'একজন রোবটকে দিয়ে বইটি আপনি পাঠাতে পারতেন।'

'জ্বি-না, পারতাম না। এই বই অন্যের হাতে দেয়া সম্ভব না।'

ফিহা হাত বাড়িয়ে বই নিলেন। মারলা লি বললেন, আপনার জন্যে এক প্যাকেট কফি এনেছি। যে কোনো কারণেই হোক আগের প্যাকেটটি আপনি ফেলে দিয়েছিলেন।

ফিহা কফির প্যাকেট হাতে নিলেন। মারলা লি বললেন, বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, বৃষ্টি পড়ছে। গরম এক কাপ কফি খেলে আমার জন্যে ভালো হত।

'বসুন। কফি দিতে বলি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

মারলা লি বসলেন। ফিহা বসলেন না দাঁড়িয়ে রইলেন। বসতে ইচ্ছা করলেও অবিশ্য বসার উপায় নেই। একটিই চেয়ার। মারলা লি বললেন, আপনি বসবেন না ফিহা ?

'বসার প্রয়োজন কি আছে ?'

'মুখোমুখি বসলে কিছুক্ষণ কথা বলতাম। শত্রুপক্ষের সঙ্গেও তো মানুষ দু'একবার কথা বলে। তাছাড়া বাড়িতে ঢোকার অনুমতি যখন দিয়েছেন। কথা বলার অনুমতিও দেবেন।'

ফিহা লাইব্রেরি ঘর থেকে বের হয়ে পাঠককে বললেন আরেকটি চেয়ার লাইব্রেরি ঘরে দিতে।

পাঠক বলল, চেয়ার টানাটানি করা আমার জন্যে সম্মান হানিকর। রাঁধুনী রোবটকে এই কাজটা করতে বলি ?

'বল।'

'আরেকটা কথা স্যার, মনে হচ্ছে এই মানুষটি আপনাকে খুব বিরক্ত করছে। ভদ্রতার কারণে আপনি তাকে চলে যেতে বলতে পারছেন না। আমাকে যদি অনুমতি দেন তাহলে কথার প্যাঁচে ফেলে লোকটাকে বিদেয় করব। আপনার ভদ্রতাও রক্ষা হবে।'

'তার প্রয়োজন দেখছি না। তুমি আড়ি পেতে কথা শুনছিলে এ ব্যাপারটিও আমার অপছন্দের। যাও গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

পাঠক চলে গেল। তার ইরিডিয়াম চোখের উজ্জ্বলতা কিছুটা ম্লান হয়েছে।

মারলা লি বললেন, আপনার বিশাল লাইব্রেরিতে একটি মাত্র চেয়ার দেখে বিস্মিত হয়েছি।

ফিহা বললেন, বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমি একা মানুষ।

'আমিও একা মানুষ ফিহা ; কিন্তু তাই বলে আমার বসার ঘরে বা আমার লাইব্রেরিতে একটি মাত্র চেয়ার থাকবে তা কল্পনাও করতে পারি না।'

'আপনি ফিহা নন বলে কল্পনা করতে পারেন না। আমি পারি, এবং আমার কাছে এটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। আমার লাইব্রেরি ঘর কফি খাবার কিংবা আড্ডা দেবার জায়গা নয়।'

'এখানে বসে কথা বলতে যদি আপনি অসুবিধা বোধ করেন তাহলে আমরা অন্য কোথাও বসতে পারি।'

'আপনাকে কি কথা বলতেই হবে ?'

'বলতে পারলে ভালো হত। আপনি না চাইলে বলবেন না।'

'আমি কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'বেশ। আমি কফি শেষ করেই বিদেয় হব।'

মারলা লি নিঃশব্দে কফি শেষ করলেন। মাথার টুপি খুলে টেবিলে রেখেছিলেন। টুপি মাথায় দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, বিদায় নিচ্ছি। শুভরাত্রি মহামতি ফিহা।

'শুভরাত্রি।'

মারলা লি পা বাড়াতে গিয়েও বাড়ালেন না, থমকে দাঁড়ালেন। আগের চেয়েও শান্ত গলায় বললেন, আমি কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমার কথা শুনতে আপনাকে বাধ্য করতে পারতাম। আমি একজন মেন্টালিস্ট। আমি চাইলে আপনার না বলার ক্ষমতা নেই। আমি আপনাকে বাধ্য করতে পারতাম, তা কিন্তু করিনি। মেন্টালিস্টরা কখনোই কাউকে বাধ্য করে না। তারপরেও সাধারণ মানুষদের ভেতর ভয়াবহ ভুল ধারণা যে মেন্টালিস্টরা তাদের ইচ্ছা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়।

'সেনাবাহিনী কি পুরোপুরি আপনারা নিয়ন্ত্রণ করেন না?'

'অবশ্যই করি। প্রয়োজনেই করি। নিয়ন্ত্রণ না করলে সেনাবাহিনী দু'ভাগ হয়ে যেত। একটি সাধারণ মানুষদের বাহিনী অন্যটি মেন্টালিস্টদের বাহিনী। তার ফলাফল নিশ্চয়ই আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না।'

ফিহা বললেন, পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে একটি বিশেষ ধরনের গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। আপনারা সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। গবেষণা এগুতে দিচ্ছেন না।

'সঠিক তথ্য কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কারণ ঝড় আসছে। শক্তিশালী টর্নেডো। ঝড় শেষ হলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হবে। আমাদের প্রতি আপনার যত বিদ্বেষই থাকুক আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা কোনো রকম গবেষণায় বাধা দেই না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের মধ্যে কোনো বিজ্ঞানী নেই। মেন্টালিস্টরা সৃষ্টিশীল কাজ পারে না। যারা এই কাজটি পারে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সীমা নেই। আপনি নিজের কথা ভেবে দেখুন মহামতি ফিহা। কি পরিমাণ সম্মান আপনি ভোগ করেন?

ফিহা বললেন, এই সম্মান আপনারা আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই করেন। জ্ঞান বিজ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তির জন্যে বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আপনাদের উপায় নেই।

'আরেকটি সঠিক তথ্য ভুলভাবে আপনি উপস্থিত করলেন। আপনাদের ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না এটা ঠিক। কিন্তু যতটুকু

অগ্রসর হয়েছি আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। এর বেশি আমাদের প্রয়োজন নেই। মেন্টালিস্টদের প্রয়োজন সামান্য। তারা অল্পতেই সুখী। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জয়ের স্বপ্ন তারা দেখে না।'

'যারা দেখে তাদের বাধা দেয়।'

'না তাও আমরা দেই না। দীর্ঘদিন বিজ্ঞান কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে আপনি জানেন যে আমরা কোনো গবেষণাতেই কখনো বাধা দেই না। আপনারা যখন টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের কৌশল উদ্ভাবনের গবেষণা করতে চাইলেন আমরা কিন্তু অর্থ বরাদ্দ করলাম। বিপুল অর্থই বরাদ্দ করা হল। সেই গবেষণা কাজে এল না। আবার আমরা যখন বিশেষ কোনো গবেষণা আপনাদের করবার জন্যে অনুরোধ করলাম আপনারা তা করতে রাজি হলেন না। মেন্টালিস্টদের কিছু শারীরিক সমস্যা ত্রিশ বছরের পর থেকে শুরু হয়। পিটুইটারি গ্লান্ড থেকে বিশেষ এক ধরনের এনজাইম বের হয়। তার উপর গবেষণা কোনো বিজ্ঞানী করতে রাজি হন নি।'

'আমি জীববিজ্ঞানী নই কাজেই এই বিষয় জানি না।'

'মহামতি ফিহা আপনি অনেক বিষয়ই জানেন না। আমরা যখন অসুস্থ হই তখন চিকিৎসার জন্যে রোবট ডাক্তারদের উপর নির্ভর করি। মানুষ ডাক্তাররা যখন আমাদের চিকিৎসা করতে আসেন তখন প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে আসেন। আমরা মেন্টালিস্ট, আমরা তা বুঝতে পারি।'

ফিহা বললেন, আপনাদের মধ্যে ডাক্তার নেই?

'না। আমাদের মধ্যে ডাক্তার নেই।'

'আমার জানা ছিল না।'

মারলা লি বললেন, আপনার অনেক সময় নিলাম। আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।

ফিহা বললেন, আপনি কি একটা সত্যি কথা আমাকে বলবেন?

'অবশ্যই বলব।'

'এই যে এতক্ষণ আপনি কথা বললেন, আপনি কি কথা শোনাবার ক্ষেত্র সাবধানে প্রস্তুত করেন নি? আপনি কি আপনার মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি?'

মারলা লি বললেন, না করিনি। জানি না আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন কি-না। আমি সত্যি কথাই বলেছি। শুভরাত্রি।

রাত্রি খুব শুভ হল না। প্রচণ্ড ঝড় হল। বিজ্ঞান পল্লী লণ্ডভণ্ড করে টর্নেডো বয়ে গেল। যাবতীয় সাবধানতা সত্ত্বেও তেইশজন মানুষ মারা গেল, তারা সবাই

পুলিশ। তাদের ডিউটি ছিল রাস্তায়। ঝড়ের সময় আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার অনুমতি তাদের ছিল না।

ফিহা বইটি শেষ করেছেন। বিদ্যুৎ ছিল না। বিদ্যুৎ সেলের সঞ্চিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাতি জ্বালাতে হল। বাইরে হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দ করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি একমনে পড়ছেন।

চল্লিশ পৃষ্ঠার বই। পুরানো ধরনের ভাষা, জটিল অলংকার ভর্তি বাক্য। মাঝে মাঝে অর্থহীন পদের পুনরাবৃত্তি। অনেকটা ধর্মগ্রন্থের আকারে লেখা—

"তিনি মানুষ নন। মানুষের ছায়া, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন না। তিনি কাহাকে জন্মও দেন না। তাঁহার আগমন আছে ; নির্গমন নাই। তিনি আসিয়াছেন ভবিষ্যত হইতে। তিনি ভবিষ্যত জানেন। যে বিদ্যা তিনি ভবিষ্যত হইতে আনেন সেই বিদ্যা ভবিষ্যতে ফিরিয়া যায়। চক্র পূর্ণ হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি চক্রের অধীন। তিনি শুধু একটি ক্ষুদ্র চক্র সম্পন্ন করেন। ইহার অধিক তাঁহার কোনো কর্ম নাই। নতুন মানব সমাজের খবর তিনি ভবিষ্যত হইতে নিয়া আসেন। বীজ বপন করেন অতীতে। এইভাবেই চক্র সম্পন্ন হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি চক্রের অধীন। তিনি তাঁহার চক্ষু দিয়া নতুন মানব সমাজের বীজ বপন করেন। এইভাবেই চক্র সম্পন্ন হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি চক্রের অধীন। তিনি শুধু একটি ক্ষুদ্র চক্র সম্পন্ন করেন।"

যতই আগানো যায় বই ততই জটিল হতে থাকে।

বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছে—

"প্রত্যেকের জন্যে কর্ম নির্দিষ্ট। সবাই তাহার নিজ নিজ কর্ম সম্পন্ন করিবে। অতঃপর তাহার প্রয়োজন নাই। অসংখ্য ক্ষুদ্র চক্র একটি বৃহৎ চক্র তৈরি করে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চক্রের অধীন। শূন্য ধাবিত হয় অসীমের দিকে। আবার অসীম যায় শূন্যের দিকে। এমতে চক্র সম্পন্ন হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চক্রের অধীন।..."

ফিহা বইটি দ্বিতীয়বার পড়লেন। প্রতিটি বাক্য পড়ার পর খানিকক্ষণ ভাবলেন। যদি তাতে কোনো লাভ হয়।

'তিনি মানুষ নন। মানুষের ছায়া।'

এর মানে কি ? মানুষের ছবি ? মানুষের ছবিও তো ছায়া।

তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন না। ছবি খাদ্য গ্রহণ করে না।

তিনি কাহাকে জন্মও দেন না। ছবি কাউকে জন্ম দেবে না। তবে একটি ছবি থেকে অনেক ছবি করা যায়...। মেলানো যাচ্ছে না।

পুরো জিনিসটা অঙ্কের একটি মডেলে কি দাঁড় করানো যায় ?

ধরা যাক মানুষ হচ্ছে x !

তিনি মানুষের ছায়া।

অর্থাৎ তিনি মানুষের একটি ফাংশান। তিনি যদি y হন তবে

$y = f(x)$

তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না। z যদি হয় জন্ম দেয়া সংক্রান্ত সংখ্যা তাহলে তিনি হবেন z এর ফাংশান তবে z এর মান হবে ঋণাত্মক, কাল্পনিক সংখ্যা।

$y = f(x)\, f(z)$

যেখানে, $z = \cos\theta + \sin\theta$

তিনি আসিয়াছেন ভবিষ্যত হইতে। অর্থাৎ y হচ্ছে সময়েরও ফাংশান। এমন ফাংশান যা শুধু একদিকে প্রবাহিত হবে। ভেক্টর রাশি।

$y = f(x)\, f(z)\, f(t)$

যে বিদ্যা তিনি ভবিষ্যত হইতে আনেন সেই বিদ্যা ভবিষ্যতে ফিরিয়া যায়। চক্র পূর্ণ হয়।

চক্র পূর্ণ হতে হলে y কে যেখানে থেকে শুরু সেখানেই ফিরে যেতে হবে। গ্র্যেগরিয়ান ইন্টিগ্রাল নিয়ে আসা যায়। গ্র্যেগরিয়ান ইন্টিগ্রালকে অর্থপূর্ণ করতে হলে Yকে ফাইনাইট ফাংশান হিসেবে দেখতে হবে।

ফিহা ডাকলেন, পাঠক।

পাঠক ছুটে এল।

'সেন্ট্রাল কম্পিউটার চালু করার ব্যবস্থা কর।'

'চালু করা যাবে না স্যার।'

'কেন?'

'প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ।'

'ও আচ্ছা।'

'ছোটখাটো হিসেবের ব্যাপার হলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি স্যার।'

'গ্র্যেগরিয়ান ইন্টিগ্রাল জানা আছে?'

'আছে স্যার। তবে...'

'তবে কি?'

'ভেরিয়েবল-এর সংখ্যা সাতের নিচে হতে হবে। এর উপর হলে আমি পারব না। আমার ক্ষমতা অল্প।'

'সাতের নিচে রাখার চেষ্টা করা হবে।'

'আরেকটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন স্যার।'

'বল।'

'সমীকরণটি সময় মুক্ত ?'

'না, সময় মুক্ত নয়।'

'তাহলে স্যার হেসবিয়ান নরমালাইজড ফাংশান আমাকে বের করতে হবে। সময় লাগবে।'

'ধীরে ধীরেই কর। তার আগে এই বইটি পড়। খুব ভালো করে পড়। বইটি মেন্টালিস্টদের উপর লেখা একটি গ্রন্থ। সম্ভবত ওদের ধর্মগ্রন্থ।'

পাঠক বই হাতে নিল। ফিহা পেন্সিলে অঙ্ক স্নাজাতে শুরু করলেন। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। অঙ্কের মডেল দাঁড় করানোর আলাদা আনন্দ আছে। তিনি পাঠকের দিকে তাকালেন। সে অতি দ্রুত বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। রোবটের গ্রন্থপাঠ দেখা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। এরা এত দ্রুত পাতা উল্টায় যে মনে হয় পাতা গুনছে, কিছু পড়ছে না।

'পড়লাম স্যার।'

'কেমন লাগল ?'

'কোন্ অর্থে কেমন লাগল জানতে চাচ্ছেন ?'

'বিষয়বস্তু।'

'বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আছে। তারা চক্রকে ঈশ্বর বলছে।'

'চক্রকে ঈশ্বর কোথায় বলল ?'

'রূপকের মাধ্যমে বলেছে স্যার। বিজ্ঞানের রূপক বর্জিত ভাষা এবং ধর্মগ্রন্থের রূপক ভাষা দু'রকম।'

'তোমার ধারণা তুমি বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছ ?'

'এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। ধারণা কতটুক সত্যি তা বলা মুশকিল। রূপকের ভাষা পাঠ করে একেকজন একেক রকম ধারণা করবে। এমনও হতে পারে যে সবারটাই সত্যি আবার কারোরটাই সত্যি না। আপনি আপনার সমীকরণ বলুন স্যার। আমি সাজাতে শুরু করি।'

'সমীকরণ বলছি। তার আগে তোমার ধারণা কি শুনি।'

'এই গ্রন্থে মেন্টালিস্টদের জন্মের ইতিহাস বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে 'তিনি' মেন্টালিস্ট তৈরি করলেন। সেই তিনি মানুষ নন। যেহেতু সেই 'তিনি' খাদ্য গ্রহণ করেন না সেহেতু সেই তিনি খুব সম্ভব একজন যন্ত্র। এটা আমার অনুমান। বলা হচ্ছে তিনি এসেছেন ভবিষ্যৎ থেকে। মনে হচ্ছে টাইম ট্রাবেল-এর কথা বলা হচ্ছে। একটি যন্ত্র অর্থাৎ একটি রোবট ভবিষ্যত থেকে অতীতে গেল। তৈরি করল মেন্টালিস্ট। যন্ত্রটির আগমন আছে, নির্গমন নেই। অর্থাৎ যন্ত্রটি অতীতে

গিয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে ফিরে আসতে পারেনি। বলা হয়েছে—'তিনি তাঁর চক্ষু হইতে নতুন মানবগোষ্ঠী তৈরি করিলেন।' এই অংশটি মজার। রোবটের চোখের আলোর সংবেদনশীল অংশ তৈরি করা হয় যৌগিক অণু "ইরিকার্বো ফসফিন" দিয়ে। ইরিকার্বো ফসফিন হচ্ছে একটি ইরিডিয়াম, দু'টি কার্বন, একটি ফসফরাস এবং দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর যৌগ ;

HIrPHC2

এই অদ্ভুত যৌগ মাত্র পাঁচশ বছর আগে তৈরি হয়েছে। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যৌগের র‍্যাডিকেল মেন্টালিস্টদের জীনে উপস্থিত।

'তুমি কি করে জানলে ?'

'মেন্টালিস্টদের প্রতি আমিও এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করি। এই আগ্রহ থেকেই ওদের বিষয়ে পড়াশোনা করেছি।'

'ওদের বিষয়ে কি করে পড়াশোনা করবে ? ওদের সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ তো তোমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়।'

'বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলিতে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মেন্টালিস্টদের জীনের গঠন সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মেন্টালিস্টরা তাদের সম্পর্কে সব তথ্যই নিষিদ্ধ করেছে ; কিন্তু তাদের জীন নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ করে নি।'

'তুমি সেই সব লেখা পড়েছ ?'

'আমি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছি।'

'আর কি পড়েছ ?'

'এ্যাংগেল হার্স্ট-এর সেই বিশেষ বক্তৃতাটা এবং বক্তৃতা প্রদানের ঘটনা পড়েছি। এটি পড়েছি ইতিহাস বই-এ।'

'এ্যাংগেল হার্স্ট কে ?'

'তাকেই মেন্টালিস্টদের জনক বলা হয়। পুরো ঘটনাটা কি স্যার আপনাকে বলব ?'

'বল। তবে অল্প কথায়।'

'নিউ ম্যাক্সিকো শহরে তিন হাজার পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এমব্রায়োলজিস্টদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে বিশিষ্ট এমব্রায়োলজিস্ট প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট একটি বিচিত্র নিবন্ধ পাঠ করে সবার হাসি-তামাশার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। নিবন্ধের শিরোনাম—নতুন মানব সম্প্রদায়।

তিনি নিবন্ধে বলেন, মানুষের জীনে ভারি ধাতুর একটি যৌগ ইরিকার্বো ফসফিন ঢুকিয়ে দিতে পারলে মাধ্যমিক মস্তিষ্কের গঠনে সূক্ষ্ম কিন্তু সুদূরপ্রসারী

পরিবর্তন ঘটবে। থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাসের সুপ্ত কর্মক্ষমতা জাগ্রত হবে। থ্যালামাসের বিশেষ নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মানুষের যাবতীয় অনুভূতির কেন্দ্র। যে ক'টি অনুভূতি নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তার সঙ্গে নতুন একটি অনুভূতি যুক্ত হবে। এই মানব সম্প্রদায় হবে প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতার অধিকারী। এরা টেলিপ্যাথিক ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। নিজেরা নিজেদের মধ্যে কোনো রকম মাধ্যম ছাড়াই ভাবের আদান-প্রদান করতে পারবে। অন্য মানুষদের তারা সৎকর্মে, সৎ চিন্তায় প্রভাবিত করতে পারবে...

অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠের মাঝখানে সাধারণত বাধা দেয়া হয় না। প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্টকে বাধা দেয়া হল। অধিবেশনের সভাপতি ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে থামালেন এবং বললেন, প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট, আপনি কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করছেন ?

প্রফেসর বললেন, অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করছি।

'আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে পরীক্ষাগুলি ইতিমধ্যে করা হয়েছে। মানুষের জীনে ভারি ধাতুর যৌগ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। টেলিপ্যাথিক মানব সম্প্রদায় তৈরি হয়ে গেছে।'

'হয়নি কিন্তু হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ শেষ করতে দিন তারপর আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব।'

'ঠিক আছে, প্রবন্ধ শেষ করুন।'

প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট বিজ্ঞানীদের হাসাহাসির ভেতর প্রবন্ধ পাঠ শেষ করলেন। তাঁর প্রবন্ধের বড় অংশ জুড়ে নতুন মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হল। পৃথিবীতে এরা যে শুভ প্রভাব ফেলবে তার কথা বলা হল।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন উদ্ভট এবং অবৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পাঠ করা হয় নি। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হল।

প্রশ্ন : প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট, মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চিত যে জীনে একটি ভারি অণু ঢুকিয়ে দিলেই আমরা সুপারম্যান পেয়ে যাব।

উত্তর : আমি সুপারম্যান বলছি না। আমি বলছি বিস্ময়কর মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ।

প্রশ্ন : আপনার ধারণা, আপনার মানসিক ক্ষমতা তেমন বিস্ময়কর নয় ?

[সভাকক্ষে তুমুল হাস্যরোল শুরু হয়। সভাপতি ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে থামালেন।]

উত্তর : আপনি আমাকে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা করছেন। তার প্রয়োজন দেখি না।

প্রশ্ন : জীনে কোন্ ভারি ধাতু ঢোকাবার কথা ভাবছেন—প্লাটিনাম ?

উত্তর : না ইরিডিয়াম।

প্রশ্ন : ইরিডিয়াম পরমাণু কীভাবে জীনে সংযুক্ত করবেন ?

উত্তর : এটি করতে হবে ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়ার সময়ে। পদ্ধতি জটিল নয়।

প্রশ্ন : জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর পুরো পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল বলে আমরা সবাই জানি এবং আপনিও জানেন।

উত্তর : আমি যে পদ্ধতির কথা বলছি তা মোটেই জটিল নয়।

প্রশ্ন : আপনি নিজেই এই অসাধারণ পদ্ধতি বের করেছেন ?

উত্তর : [নীরবতা]

প্রশ্ন : আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন না ?

উত্তর : আমি নিজে এই পদ্ধতি বের করিনি। আমি একজনের কাছ থেকে পেয়েছি।

প্রশ্ন : দেবদূতের কাছ থেকে পেয়েছেন ?

[সভাকক্ষে আবারো হাসি।]

উত্তর : দেবদূতের কাছ থেকে পাইনি, যন্ত্রের কাছ থেকে পেয়েছি।

প্রশ্ন : যন্ত্র আপনাকে বলে গেছে কি করে সুপারম্যান তৈরি করা যায় ?

উত্তর : অনেকটা তাই।

প্রশ্ন : আপনার ধারণা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমাদের সুপারম্যান তৈরি করা উচিত ?

উত্তর : অবশ্যই উচিত।

প্রশ্ন : যন্ত্রটি পেয়েছেন কোথায় ?

উত্তর : সে এসেছে।

প্রশ্ন : কোত্থেকে এসেছে ?

উত্তর : উত্তর দিতে চাচ্ছি না। উত্তর শুনলে আপনারা আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনি কি ইদানিংকালে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে আপনার মাথা পরীক্ষা করিয়েছেন ?

সভাকক্ষে তুমুল হৈ চৈ, হাসাহাসি হতে থাকল। সভাপতি বললেন, প্রশ্নোত্তর পর্বের এখানেই সমাপ্তি। এই নিবন্ধ এখানে পাঠ করার কথা ছিল না। প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট অন্য একটি নিবন্ধ জমা দিয়েছিলেন। সেইটি না পড়ে

তিনি এই বিচিত্র নিবন্ধ পড়লেন। এটি নিয়ে আর হৈ চৈ করার কোনো মানে নেই। আমি প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্টকে আসন গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করছি।

প্রফেসর এ্যাংগেল বললেন, আসন গ্রহণ করার আগে আমি আপনাদের একটি তথ্য দিতে চাই। ইতিমধ্যে আপনারা আমাকে হাস্যকর ব্যক্তিত্ব হিসেবে জেনে গেছেন। আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে। আমি জানি, যে নিবন্ধ আমি পাঠ করেছি তা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নয়। পৃথিবীর সেরা এমব্রায়োলজিস্টদের এই সম্মেলনে আমি ঘোষণা করছি যে, নিবন্ধে উল্লেখিত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আমি করেছি। আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন এবং টেস্ট টিউবে ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের মাধ্যমে আমি এ পর্যন্ত একুশটি মানব শিশুর জীনে ইরিডিয়ামের একটি করে পরমাণু সংযুক্ত করেছি। এরা এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। ভূমিষ্ঠ হলেই জানবেন এরা সম্পূর্ণ নতুন এক মানবগোষ্ঠী। এরা মেন্টালিস্ট। এরা বড় হবে। নিজেদের মধ্যে বিয়ে করবে। এদের সন্তান-সন্ততিরাও হবে মেন্টালিস্ট।

'আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।'

'সময় তা বিচার করবে।'

'আপনি যে পরীক্ষার কথা বলেছেন তা যদি করে থাকেন তাহলে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এমব্রায়োলজিস্টের এথিকস্ ভঙ্গ করেছেন।'

প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট যেমন বলেছিলেন তেমনি হল। একুশটি শিশুর জন্ম হল। ভয়ংকর রুগ্‌ণ সব শিশু। মাত্র সাতজন কোনোক্রমে বাঁচল, তাও ইনকিউবেটরে।

এ্যাংগেল হার্স্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। এ্যাংগেল হার্স্ট বললেন, মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন দিন, শুধু দণ্ডাদেশ চার বছরের জন্যে পিছিয়ে দিন। আমি দেখতে চাই সত্যি সত্যি মানসিক শক্তিসম্পন্ন শিশু তৈরি হয়েছে কি-না।

তাঁকে সেই সুযোগ দেয়া হল না। সুযোগ দিলে তিনি বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে দেখতেন সাতজন মেন্টালিস্টকে। আজকের বিশাল মেন্টালিস্ট সমাজের যারা আদি পিতা ও মাতা।

ফিহা বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট-এর এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছিল ?

'ইতিহাস তাই বলে স্যার।'

'যে যন্ত্রের কাছ থেকে তিনি এই বিদ্যা পেয়েছিলেন সেই যন্ত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা হয় নি ?'

'ইতিহাস বই-এ আর কোনো তথ্য নেই স্যার।'

'খুব ভালো কথা। এখন অঙ্কের মডেলটা নিয়ে কাজ শুরু করা যাক।'

ফিহা অতি দ্রুত সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন। এখন শুধু ডাটা এনট্রি।

'স্যার।'

ফিহার চিন্তায় বাধা পড়ল। ডাটা এন্ট্রিতে শেষ সংখ্যা কি বলেছিলেন ভুলে গেলেন। তিনি ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন। লীম দাঁড়িয়ে আছে। নিচু বুদ্ধিবৃত্তির রোবটগুলির চেহারাও কি বোকার মতো করে বানানো হয়? কী অদ্ভুত বোকা বোকা লাগছে এই গাধা ধরনের রোবটটাকে।

'কি চাও?'

'আমি কিছু চাই না স্যার।'

'কেন এসেছ এখানে?'

'একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?'

'গেটে।'

'কি চায়?'

'জানি না কি চায়।'

ফিহার শরীর জ্বলে যাচ্ছে রাগে। গাধা ধরনের এই রোবটগুলি কেন তৈরি করা হয়?

'নাম কি?'

'আমার নাম লীম।'

'মেয়েটার নাম জানতে চাচ্ছি।'

'মেয়েটার নাম মেয়েটা জানে। আমি জানি না।'

ফিহা প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। হঠাৎ মনে হল নুহাশ নয়ত? সে কি আসবে? তার আসার সম্ভাবনা ছিল মাত্র দশভাগ; কিন্তু।...ফিহা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে পেছনে লীম আসছে। এর হাঁটাচলাও বেকুবের মতো। অকারণে দরজায় ধাক্কা খেল।

ফিহা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কেন পেছনে পেছনে আসছ?

'জানি না স্যার।'

'তোমাকে আসতে হবে না।'

গেটের বাইরে নুহাশ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে দু'টো ব্যাগ। একটা বেশ বড়, একটা ছোট। প্যাকেট করা এক গাদা বই। একটা ফোল্ডিং ইজিচেয়ার,

একটা টেবিল ল্যাম্প। নুহাশ লাজুক গলায় বলল, আপনি আসতে বলেছিলেন, আমি এসেছি।

ঠিক কোন কথাটা বললে ভালো হবে ফিহা বুঝতে পারছেন না। সব কেমন জট পাকিয়ে গেছে। মেয়েটিকে ঐদিন তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় নি। আজ অসম্ভব রূপবতী বলে মনে হচ্ছে। কোনো সাজসজ্জা করেছে বলেতো মনে হয় না। তাহলে সুন্দর লাগার কারণ কি ? সৌন্দর্য ব্যাপারটা কি ? একটা জিনিসকে কেন সুন্দর লাগে, কেন অসুন্দর লাগে ?

'আমি কি চলে এসে আপনাকে খুব বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছি।'

'না।'

'আমি আমার সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছ।'

'আমি কি বাড়ির ভেতর আসব ?'

'অবশ্যই আসবে। অবশ্যই।'

সুন্দর কিছু বলা উচিত। বলতে ইচ্ছাও করছে। কিন্তু সুন্দর কোনো কথা মনে আসছে না। তাঁর কি উচিত না মেয়েটির রূপের প্রশংসা করে কিছু বলা ? কি বলা যায় ?

নুহাশ বলল, আপনি গেট ছেড়ে সরে না দাঁড়ালে তো আমি ভেতরে আসতে পারছি না।

ফিহা সরে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে, কিন্তু লজ্জা লাগছে। অসম্ভব লজ্জা লাগছে। লজ্জা লাগার কারণ কি ?

নুহাশ বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব বিব্রত হচ্ছেন।

'না না না। বিব্রত হচ্ছি না। মোটেই বিব্রত হচ্ছি না। অঙ্কের একটা মডেল তৈরি করছিলাম, মাঝখানে তুমি এলে মানে সব এলোমেলো হয়ে গেল। একটা কাজ করা যাক। তুমি ঘরে যাও। লীম তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। কোন ঘরে থাকবে। এইসব আর কি।'

'লীম কে ?'

'লীম হচ্ছে কর্মী রোবট। বোকা ধরনের তবে ঘরের কাজে খুব পটু। তুমি সব দেখে শুনে নাও। আমি এই ফাঁকে আমার কাজটা শেষ করি। অবশ্যি বিয়ের লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে। এটা যদিও তেমন জরুরি নয়। কফি ? কফি খাবে ?'

'আমাকে নিয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'ব্যস্ত হচ্ছি না তো। মোটেই ব্যস্ত হচ্ছি না। নুহাশ।'

'জ্বি।'

'মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় আমি জানি না। কি বললে তারা খুশি হয় তাও জানি না। পদে পদে আমার ভুল হবে, তুমি কিছু মনে কর না। কি করলে তুমি খুশি হবে তা যদি তুমি বল তাহলে আমি তা করব। অবশ্যই করব।'

নুহাশ হাসিমুখে বলল, আপনি যদি হাত ধরে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান তাহলে আমি খুশি হব।

ফিহা নুহাশের হাত ধরে বাড়ির দিকে এগুচ্ছেন। পাঠক এবং লীম দু'জনই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাঠক এমন ভাব করছে যেন সে কিছু দেখছে না। কিন্তু গাধা লীম চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে এবং খুব মাথা দুলাচ্ছে যেন সে সব বুঝে ফেলেছে। এই গাধাটিকে বাড়িতে রাখাই ভুল হয়েছে। বিরাট বোকামি হয়েছে।

ফিহা লাইব্রেরি ঘরে ফিরে গেলেন। অঙ্কের মডেলটা শেষ করতে হবে। নতুন পরিস্থিতির কারণে সব কাজ কর্ম বন্ধ রাখার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া এটা খুব জরুরি, খুবই জরুরি।

লীম গভীর আগ্রহে নুহাশকে সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। নুহাশ যা দেখছে তাতেই বিস্মিত হচ্ছে। একজন মানুষের জন্যে এত প্রকাণ্ড বাড়ি ? বাড়ির পেছনে ফুলের বাগান দেখে নুহাশ হকচকিয়ে গেল। এত সুন্দর !

নুহাশ বলল, ফুলের বাগান বাড়ির পেছনে কেন ?

লীম দুঃখিত গলায় বলল, স্যার পছন্দ করেন না, এই জন্যেই ফুলের বাগান বাড়ির পেছনে।

'উনি ফুল পছন্দ করেন না ?'

'না।'

'আর কি কি উনি পছন্দ করেন না ?'

'গান পছন্দ করেন না।'

'কি বল তুমি ?'

লীম দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি খুব ভালো গাইতে পারি। কিন্তু এই বাড়িতে গান গাওয়ার উপায় নেই। স্যার বিরক্ত হন।'

'কখনো গেয়ে দেখেছিলে ?'

একবার রান্নাঘরে বসে গুন-গুন করছিলাম। স্যার বললেন, গলায় কি হয়েছে। এরকম করছ কেন ?'

'দেখি আমাকে একটা গান শুনাও তো।'

'কোন ধরনের গান শুনতে চান ?'

'তোমার যা ইচ্ছা তুমি গাও। সব ধরনের গানই আমার ভালো লাগে।'

'একটি প্রেমের গান গাইব ?'

'গাও।'

ফিহা চোখ বন্ধ করে একের পর এক সংখ্যা বলেছেন, পাঠক তা মেমোরি সেলে সাজিয়ে নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আবার ব্যাহত হল। লীমের গানের শব্দে আবার সব এলোমেলো হয়ে গেল।

ফিহা বললেন, এসব কি হচ্ছে ?

পাঠক বলল, গান হচ্ছে স্যার।

ফিহা বললেন, কে গান করছে ?

'লীম। পিআর ধরনের রোবটদের ভয়েস সিনথেসাইজার খুব উন্নত মানের। তারা চমৎকার গাইতে পারে।'

ফিহার অসম্ভব বিরক্ত হওয়া উচিত, কারণ কাজটা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু তিনি বিরক্ত হচ্ছেন না। তাঁর ভালো লাগছে। অসম্ভব ভালো লাগছে। তিনি কান পেতে গানের কথাগুলি শোনার চেষ্টা করছেন।

'দিনের প্রথম আলোয় তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম তুমি এলে না। মধ্যাহ্নের তীব্র আলোয় তোমাকে কেমন দেখায় জানা হল না, কারণ তুমি মধ্যাহ্নে এলে না। সূর্যের শেষ রশ্মি কি তোমার রঙ বদলে দেয় ? আমি জানি না, কারণ তুমি এলে রাতের অন্ধকারে। প্রিয়তম, আমি শুধু তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম। অন্ধকারে কি করে দেখব ?'

ফিহা মুগ্ধ গলায় বললেন, গাধাটাতো ভালো গাইছে। বেশ ভালো গাইছে।

পাঠক বলল, ডাটা এন্ট্রির কাজটা আজ বন্ধ থাকলে কি ক্ষতি হবে ?

'থাকুক বন্ধ থাকুক।'

'আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে আমি কি অভিনন্দন জানাতে পরি ?'

'হ্যাঁ পার।'

পাঠক নিচু গলায় বলল, মানুষের আনন্দ অনুভব করার ক্ষমতা আমার নেই। তারপরেও মনে হয় আপনার আনন্দ আমি খানিকটা বুঝতে পারছি।

'ধন্যবাদ পাঠক।'

'সময় সমীকরণের অনেকগুলি ধাপ আপনি অতিক্রম করে এসেছেন। সীমাহীন আপনার প্রতিভা। শেষ ধাপটি অতিক্রম করতে আপনার স্ত্রী আপনাকে সাহায্য করবে। এই শুভ কামনা।'

'সে কি করে সাহায্য করবে ? এই জটিল জগতে তার স্থান কোথায় ?'

'সে তার মতো করে আপনাকে সাহায্য করবে। গণিত এবং পদার্থবিদ্যার সাহায্যের প্রয়োজন আপনার নেই, স্যার।'

'হ্যাঁ তাও বোধ হয় ঠিক। একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আমি আটকে গেছি। আমি জট খুলতে পারছি না।'

'আপনি 'জট'টা বুঝতে পারছেন। সারাক্ষণ তাকিয়ে আছেন 'জটটি'র দিকে। এই জট আপনাআপনি খুলবে।'

'না খুললে সমূহ বিপদ পাঠক। জট খুলতে না পারলে মেন্টালিস্টরা আমাদের গ্রাস করে নেবে। সামনের পৃথিবী হবে মানবশূন্য পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে থাকবে শুধু মেন্টালিস্ট আর কেউ না। মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে পাঠক। অতি দ্রুত কমে আসছে।'

পাঠক বলল, যে ক্ষমতাধর সেই টিকে থাকবে। এ সত্য স্বীকার করে নেয়াই কি ভালো না স্যার ?

'তুমি মেন্টালিস্টদের ক্ষমতাধর বলছ ?'

'হ্যাঁ বলছি। ওরা যে টিকে যাচ্ছে এটিই কি সবচে' বড় প্রমাণ নয় যে ওরা ক্ষমতাধর।'

'সময় সমীকরণের আমি সমাধান বের করব। আমি নিজে যাব অতীতের পৃথিবীতে। প্রফেসর এ্যাংগেল হার্স্ট যে বিশেষ পরীক্ষাটি করে প্রথম মেন্টালিস্ট শিশু তৈরি করেছিলেন সেই পরীক্ষা আমি করতে দেব না।'

'তা যদি করতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে মানুষই ক্ষমতাধর। মেন্টালিস্টরা নয়।'

'অবশ্যই মানুষ ক্ষমতাধর। আমি তা প্রমাণ করব পাঠক। আমি তা প্রমাণ করব। শোন পাঠক, আমার সমস্যা কোন জায়গাটায় হচ্ছে আমি তোমাকে বলি—খুব সাদামাটাভাবে বলা যায় সময়ের শুরু হচ্ছে বিগ বেংগে। তারপর সময় এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে...'

'আমাকে বলে কোনো লাভ হবে না। আমি তো স্যার এ ব্যাপারে আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না—'

'আমি জানি, আমি জানি, তবু তুমি শোন—একজন কাউকে শুনাতে ইচ্ছা করছে—সময়কে থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের সঙ্গে তুলনা কর। খুব সহজ

অর্থে থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র কি বলছে ? বলছে—সময় যতই এগুচ্ছে গরম জিনিস ততই শীতল হচ্ছে। ধর এক কাপ কফি টেবিলে রাখা হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গরম কফি আরো গরম হবে না। ঠাণ্ডা হতে থাকবে।'

'এই তথ্য স্যার আমি জানি।'

'হ্যাঁ জান। অবশ্যই জান। কিন্তু এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার আছে। এটি একটি পরিসংখ্যানগত সূত্র। পরিসংখ্যান কাজ করে অসংখ্য অণুপরমাণু নিয়ে। সমষ্টিগতভাবে এই সব অণুপরমাণু গরম থেকে শীতল অবশ্যই হবে। কিন্তু পরিসংখ্যান আরো বলে এর মধ্যে কিছু অণুপরমাণু গরম থেকে আরো গরম হয়ে যেতে পারে। তাতে থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র ব্যাহত হবে না। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।'

'তাহলে বুঝতেই পারছ—এই সব অণু পরমাণু সময়ের উল্টো দিকে যাচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে তাদের নিয়ে। আমি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করেছি যে সময়ের উল্টোদিকে যাওয়া সম্ভব।'

'হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব।'

'দেখ পাঠক বহু পুরাতন একটা সূত্র দেখা যাক।

$Tau = \sqrt{(1-v^2/c^2)}$

ধরা যাক v হচ্ছে একটি বস্তুর গতি। c আলোর গতি।

অতীতে যেতে হলে vর মান হতে হবে আলোর গতির চেয়ে বেশি। যখন তা হবে তখন বস্তুর ওজন, বস্তুর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সব হয়ে যাবে কাল্পনিক সংখ্যা। সবার আগে চলে আসবে $\sqrt{-1}$ আসবে না ?'

'আসবে।'

'এই সমস্যার সমাধান আমার কাছে খুব জটিল কখনো মনে হয় নি। গণিত শাস্ত্রে আমরা কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে শুরু করি এবং এক সময় সেটাকে সত্যিকার সংখ্যায় রূপান্তরিত করি। আমি অগ্রসর হচ্ছি কোন দিকে জান ?'

'আমার জানার কথা নয় স্যার।'

'হ্যাঁ তোমার জানার কথা নয়। অবশ্যই তোমার জানার কথা নয়—দু'ধরনের বস্তুর কণার কথা চিন্তা করা যাক। আলোর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন বস্তুকণা যেমন ধর, ইলেকট্রন, প্রোটন, যাদের বলা হয় 'টারডিওনস', আবার অন্য কণা চিন্তা কর যাদের গতি আলোর চেয়ে বেশি। এরা হচ্ছে টেকিওনস...'

'এরা কাল্পনিক কণা। এদের অস্তিত্ব নেই।'

'যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্ব দিতে হলে কি করতে হবে ? তুমি স্পেস নিয়ে চিন্তা কর। স্পেসকে কি করলে এই কণাগুলি তৈরি হবে...'

'স্যার আপনি কি গ্রেগরিয়ান এ্যানালিসিসের কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ আমি গ্রেগরিয়ান এ্যানালিসিসের কথা বলছি। আমি কতটা কাছাকাছি চলে এসেছি তুমি কি তা বুঝতে পারছ ?'

'বুঝতে পারছি না। তবে আপনার আনন্দ দেখে খানিকটা অনুমান করতে পারছি।'

'আমি খুব কাছাকাছি আছি। খুব কাছাকাছি। একটি মাত্র 'জট'। সেই জট খুলে যাচ্ছে।'

'স্যার আপনি বিশ্রাম করুন। পেছনের বাগানে চেয়ার পেতে দি। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করুন।'

'সে এখন আমার স্ত্রী নয় পাঠক। আমাকে মারলা লি'র কাছে যেতে হবে। লাইসেন্স নিয়ে আসতে হবে।'

'কখন যাবেন ?'

'এখন যাব।'

'আমি কি স্যার আপনার সঙ্গে আসব ?'

'তুমি আসতে চাচ্ছ কেন ?'

'আপনাকে খুব অস্থির লাগছে। সে জন্যেই আসতে চাচ্ছি।'

'না আমি অস্থির না। আমি ঠিক আছি। আমি মারলা লি'র সঙ্গে দেখা করব। তার কাছ থেকে আমি আরো কিছু গ্রন্থও আনতে চাই। তুমি আমার টুপি এনে দাও।'

'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে কিছু বলে যাবেন না ?'

'না। ওর সামনে পড়তে কেন জানি লজ্জাও লাগছে। আচ্ছা পাঠক, মেয়েরা কি উপহার পেলে সবচে' খুশি হয় বলত ? আমি ফেরার পথে ওর জন্যে কিছু উপহার আনতে চাই।'

পাঠক মৃদু স্বরে বলল, ভালবাসার চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে, স্যার !

'ভালো বলেছ পাঠক। ভালো বলেছ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে ভালবাসা। আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান—এই উপহার আমি একমাত্র আমার পালক পিতামাতার কাছ থেকেই পেয়েছি। যারা দু'জনই মেন্টালিস্ট।'

'স্যার, আপনি আমাদের ভালবাসাও পেয়েছেন। তবে আমরা যন্ত্র। আমাদের ভালবাসা মূল্যহীন।'

'পাঠক, ভালবাসা মূল্যহীন নয়। আজ সম্ভব না, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই ভালবাসাকে অঙ্কে নিয়ে আসা যাবে। অঙ্কের মডেল তৈরি করা হবে। হয়তো আমিই তা করব...'

'আমি কি আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেব স্যার?'

'দাও এগিয়ে দাও। গাধা লীম দেখি এখনো গান গাইছে। ব্যাটার গলা এত সুন্দর তাতো জানতাম না। তাকে বার বার গাধা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।'

মারলা লি বললেন, এই সামান্য বিষয় নিয়ে আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। বিয়ের লাইসেন্স এমন জরুরি কিছু নয়।

ফিহা বললেন, আরেকটা জরুরি বিষয় আমার আলোচ্যসূচিতে আছে। আপনার কি সময় হবে?

'আমার সময়ের একটু টানাটানি যাচ্ছে। কিন্তু আপনার জন্যে সময় বের করা হবে।'

'মেন্টালিস্টদের উপর লেখা আরো কিছু বই পড়তে চাচ্ছি।'

'কেন?'

'যে বইটি দিয়েছেন সেটি অস্পষ্ট।'

'সব বইই অস্পষ্ট। বিজ্ঞানের বই এগুলি নয়।'

'মেন্টালিস্টদের জীবনযাপন পদ্ধতি, এদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কোনো বই থাকে।'

'শুনুন মহামতি ফিহা, আপনি যেভাবে কথা বলছেন তার থেকে মনে হতে পারে আমরা মানুষ নই। আমরা জন্তু বিশেষ।'

'শুধু শুধুই আপনি রাগ করছেন।'

'আমি মোটেই রাগ করছি না। আপনাকে মেন্টালিস্ট সম্পর্কে আর কোনো বই দেয়া যাবে না। আপনি সমাজবিজ্ঞানী নন। আপনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। বাজে কাজে সময় নষ্ট করবেন কেন? সবার কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। আপনি আপনার কাজ করবেন।'

ফিহা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, সবার সব কাজ তো আপনারা করিয়ে নিচ্ছেন। আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের কাজটা কি। আপনারা কি করেন? মাটির নিচে শহর বানিয়ে বাস করেন জানি। কিন্তু বেঁচে থাকা ছাড়া আর কি করেন?

'আমরা ভাবি।'

'কি ভাবেন?'

'পৃথিবীর মঙ্গল নিয়ে ভাবি। মানুষকে পরিচালনা করার সর্বোত্তম পন্থা নিয়ে ভাবি। ভবিষ্যত পৃথিবী কি করে সাজানো হবে তা নিয়ে ভাবি।'

'ভবিষ্যত পৃথিবীতে আমাদের স্থান কোথায় ?'

'আমার জানা নেই। শুনুন মহামতি ফিহা, আজ আপনি বিয়ে করেছেন। একটি তরুণী মেয়ে ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে—আজ কেন বাজে তর্ক করে সময় নষ্ট করছেন ? তার কাছে যান। যাবার পথে ফুল কিনে নিয়ে যান। ফুলের দোকান এত রাতে নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি খোলাবার ব্যবস্থা করছি।'

'কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

'আপনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মেয়েটির প্রয়োজন আছে। আপনারা মেন্টালিস্ট নন। আপনাদের একেকজনের চিন্তা-ভাবনা একে রকম। ফুল একজনের কাছে অর্থহীন, অন্যজনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

ফিহা উঠে দাঁড়ালেন। মারলা লি বললেন, আমি দুঃখিত যে আপনি খানিকটা হলেও মন খারাপ করে যাচ্ছেন। আপনার মন ভালো করার জন্য কিছু কি করতে পারি ?

'আমি আমার পালক বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। তা-কি সম্ভব হবে ?'

'না। তা সম্ভব হবে না। তাঁরা যদি ভূগর্ভস্থ শহরে না থাকতেন তাহলে সম্ভব হত। ভূগর্ভস্থ শহর শুধু মেন্টালিস্টদের জন্যে।'

'সাধারণ মানুষ সেখানে গেলে শহর কি অশুচি হয়ে যাবে ?'

'শুচি-অশুচির প্রশ্ন নয়। এটা হচ্ছে আইন।'

'আইনের পেছনে যুক্তি থাকে। এই আইনের পেছনের যুক্তিটি কি ?'

'আমরা মানুষ হিসেবে আপনাদের থেকে অনেকখানিই আলাদা। সহাবস্থান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা। আপনারা আমাদের সম্পর্কে যত কম জানবেন ততই মঙ্গল।'

'আপনারা আমাদের সম্পর্কে সবকিছুই জানবেন, আর আমরা কিছু জানব না ?'

'আপনাদের সম্পর্কে জানা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে আপনাদের জানা প্রয়োজন নয়। আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে ফিহা। এখন বাড়ি যান। ফুলের দোকান কি খোলাবার ব্যবস্থা করব ?'

ফিহা জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলেন। রাস্তায় তেমন আলো নেই। ঝড়ে বিদ্যুত ব্যবস্থায় যে সমস্যা হয়েছিল সে সমস্যা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায় নি।

ফিহা হাঁটছেন অন্ধকারে। তীব্র হতাশাবোধ তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ফিরে এসেছে পুরোনো অস্থিরতা।

'স্যার।'

তিনি চমকে তাকালেন। অন্ধকারে রাস্তার পাশে বিশালদেহী একজন যুবক।

'আপনি কে?'

'স্যার আমি টহল পুলিশ। আপনি কোথায় যেতে চান বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।'

'তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আমি যদি আপনার পেছনে পেছনে আসি আপনার কি অসুবিধা হবে?'

'হাঁ হবে। আমি একা হাঁটতেই পছন্দ করি। ভালো কথা, এরিন নামের একজন টহল পুলিশের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাকে কি একটা খবর দিতে পারবেন? তাকে কি বলবেন যে আমি বিয়ে করেছি?'

'এরিনকে খবর দেয়া যাবে না স্যার।'

'কেন?'

'ঝড়ের রাতে সে মারা গেছে। রাস্তায় ডিউটি ছিল। রাস্তা ছেড়ে কোথাও আশ্রয় নেবার অনুমতি ছিল না। কাজেই সে ঝড়ের সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল।'

'প্রাণ বাঁচানোর জন্যেও সে কোথাও যেতে পারে নি?'

'না। আমরা মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত।'

'ও আচ্ছা।'

ফিহা এগিয়ে চললেন। টহল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে দেখছে তাঁকে।

ফিহা রাতের খাবার শেষ করলেন নিঃশব্দে।

নুহাশ তার মুখোমুখি বসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। অন্যদিন খাবার টেবিলের আশেপাশে লীম এবং পাঠক দু'জনই থাকে। আজ তারা নেই।

নুহাশ বলল, আপনার খাবারে লবণের সমস্যা হয় বলে শুনেছি। লবণ কি ঠিক আছে?

'ঠিক আছে।'

'আপনাকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'চিন্তিত না। আমার মন খারাপ হয়ে আছে। মেন্টালিস্টদের সঙ্গে দেখা হলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'ওদের সঙ্গে দেখা না করলেই পারেন।'

'দেখা না করেও কি ওদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় আছে? এই মুহূর্তে আমরা দু'জন যে কথা বলছি তা কি মেন্টালিস্টরা শুনছে না?'

'নুহাশ ক্ষীণ স্বরে বলল, খুব সম্ভব শুনছে।'

'আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে আমরা সাধারণ মানুষরা পৃথিবীর কোনো এক নির্জন প্রান্তে চলে যাই। আমাদের নিজেদের একটি দেশ হোক। স্বাধীন দেশ।'

নুহাশ কঠিন গলায় বলল, এ জাতীয় কথা আর কখনো বলবেন না। যারা এ জাতীয় কথা বলেছে বা ভেবেছে তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা কি আপনি জানেন না?

ফিহা চুপ করে গেলেন। হ্যাঁ, এই অপরাধের শাস্তির কথা তিনি জানেন। শাস্তি একটিই—জেল নয়, মৃত্যুদণ্ড নয়—মানসিকতা হরণ। অপরাধীর মাথা থেকে সমস্ত স্মৃতি নষ্ট করে দেয়া হয়। অপরাধী তখন পৃথিবীতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মতই হয়ে যায়। সে কিছুই জানবে না। সব তাকে নতুন করে শিখতে হয়। সে হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে। এই শাস্তির চেয়ে মৃত্যুদণ্ড অনেক সহজ শাস্তি।

খাওয়া শেষ না করেই ফিহা উঠে পড়লেন। তাঁর আর খেতে ইচ্ছা করছে না। নুহাশ বলল, আপনার কি শরীর খারাপ করছে?

'না। তুমি ঘুমুতে যাও। আমি কাজ করব।'

'কি কাজ করবেন?'

'অঙ্কের একটা মডেল তৈরি করার চেষ্টা করছি। ওটা শেষ করব।'

'আজ না করলে হয় না?'

'না, হয় না নুহাশ, এই জিনিসটা আমার মাথায় ঘুরছে, এটা শেষ না করে অন্য কোনো কিছুতেই আমি মন দিতে পারব না।'

'আপনি যখন কাজ করবেন তখন আমি কি আপনার পাশে বসে থাকতে পারি?'

'না, পার না। তুমি রাগ করো না নুহাশ।'

'আমি রাগ করি নি। তবে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে—'

ফিহা বিস্মিত হয়ে বললেন, কি কথা?

'রাতে আপনি যখন ঘুমুতে আসবেন তখন আমি আপনাকে একটা গল্প পড়ে শোনাব। অতিপ্রাকৃত গল্পগুচ্ছ থেকে একটা গল্প। আপনাকে সেই গল্প শুনতে হবে।'

'আমি কখন ঘুমুতে আসি তার তো ঠিক নেই...'

নুহাশ লজ্জিত গলায় বলল, যত রাতই হোক। আমি জেগে থাকব আপনার জন্যে।

ডাটা এন্ট্রির মাঝপথে আবারো বাধা পড়ল। কম্যুনিকেটরে যোগাযোগ করলেন মারলা লি।

'মহামতি ফিহা।'

'কথা বলছি।'

'গভীর রাতে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত।'

'কি বলবেন বলুন।'

'আপনি আপনার পালক বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'আপনি বলেছিলেন ব্যবস্থা করা যাবে না।'

'এখন করা হয়েছে। এঁরা দু'জনই গুরুতর অসুস্থ। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মৃত্যুপথযাত্রী মেন্টালিস্টদের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। এঁরা দু'জন আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন। আপনি কি আসবেন?'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আপনার গেটের কাছে গাড়ি থাকবে।'

ফিহা পাঠকের দিকে তাকালেন। পাঠক বলল, আমার মনে হয় আজ রাতে কাজটা করতে পারব না।

'আমারো তাই মনে হচ্ছে। নুহাশের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে হবে। সে আমাকে কি এক গল্প না-কি পড়ে শোনাবে।'

'আপনি কখন ফিরবেন?'

'বুঝতে পারছি না কতক্ষণ লাগবে। তাড়াতাড়িই ফিরতে চেষ্টা করব। এখন ক'টা বাজে?'

'রাত তিনটা। ভোর হবার বেশি বাকি নেই।'

ফিহা বাড়ি থেকে বের হলেন। নুহাশকে কিছু বলে গেলেন না।

চল্লিশ বছর পর ফিহা তার পালক পিতামাতাকে দেখলেন। ঘরে এই দু'জন ছাড়া অন্য কেউ নেই। প্রশস্ত একটি খাটে দু'জন বসে আছেন। দু'জনকেই চূড়ান্ত রকমে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে এঁরা মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মানুষ না কঙ্কাল, জ্বলজ্বলে চোখ ছাড়া এদের যেন কিছুই নেই। ঘর প্রায় অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে সব কিছু চোখে আসে।

ফিহা বললেন, আপনারা কেমন আছেন ?

দু'জনই এক সঙ্গে ফিহার দিকে তাকালেন। বৃদ্ধ হাতের ইশারায় ফিহাকে পাশে বসতে বললেন। ফিহা বললেন, আপনার কি কথা বলার মতো শক্তি আছে ?

দু'জনই একত্রে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

ফিহা বললেন, আমার শৈশব আপনারা আপনাদের ভালবাসায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। আপনাদের ছেড়ে চলে এলেও আমি সেই ভালবাসার কথা ভুলি নি। আমার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটির নামকরণ করা হয়েছে আপনার নামে। মিরান ফাংশান।

বৃদ্ধ মিরান আবার মাথা নাড়লেন, আবার হাত ইশারা করে পাশে বসতে বললেন। ফিহা বসলেন না।

দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'জনকে দেখে তীব্র কষ্ট হচ্ছে। এতটা কষ্ট তাঁর হবে তা কখনো কল্পনা করেননি। তাঁর চোখ ভিজে উঠল। তিনি কোমল গলায় বললেন, যতদিন পদার্থবিদ্যা বেঁচে থাকবে আপনার নাম বেঁচে থাকবে। আমি আপনাদের ছেড়ে এসেছি কিন্তু আপনাদের ভালবাসার অমর্যাদা করি নি। আমি মেন্টালিস্টদের ঘৃণা করি। তারা আমাদের রোবট বানিয়ে রেখেছে। আপনারাও মেন্টালিস্ট। আমি আপনাদেরও ঘৃণা করি—কিন্তু...

'কিন্তু কি ?'

'আপনাদের দুজনের প্রতি আমার ভালবাসারও সীমা নেই।'

'জানি।'

'কি করে জানেন ?'

'আমরা মেন্টালিস্ট। আমরা দূর থেকে তোমার মন পড়তে পারি। চল্লিশ বছর ধরেই পড়ছি। চল্লিশ বছর ধরে তোমার মঙ্গল কামনা করছি।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।'

'নুহাশ মেয়েটি ভালো। তুমি সুখী হবে।'

'আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।'

'আমরা তোমার স্ত্রীর জন্যে ফুল আনিয়ে রেখেছি। ফুলগুলি নিয়ে যেও।'

'অবশ্যই নিয়ে যাবে।'

ফিহা লক্ষ করলেন খাটের এক পাশে প্রচুর গোলাপ। টকটকে রক্তবর্ণের গোলাপ। ফিহার চোখ আবারো ভিজে উঠছে।

'তুমি ছোটবেলায় যে সব খেলনা নিয়ে খেলতে তার কোনোটাই আমরা নষ্ট করিনি। তুমি কি সেগুলি দেখতে চাও ?'

'না।'

বৃদ্ধা এবার কথা বললেন। অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন, খুব ছোটবেলায় তুমি পিঠে ব্যথা পেয়েছিলে। ছেলেবেলায় ক্ষত চিহ্ন ছিল। এখনো কি আছে?

'আছে।'

'তুমি ছোটবেলায় বার বার ছুটে ছুটে আসতে, আমাকে বলতে, মা আমার ব্যথায় চুমু দিয়ে দাও। তোমার কি মনে আছে?'

'আছে।'

'তুমি যদি খুব লজ্জা না পাও তাহলে আমি সেখানে আরেকবার চুমু দিতে চাই।'

ফিহা গায়ের কাপড় খুললেন। তাঁর কোনো রকম লজ্জা লাগল না। বরং মনে হল এই তো স্বাভাবিক। বৃদ্ধা গভীর আবেগে চুমু খেলেন। বৃদ্ধার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। ফিহা বললেন, যাই।

'আর একটু বস। আমার পাশে বস।'

ফিহা বসলেন। বৃদ্ধ বললেন, আমার হাত ধরে বস। পক্ষাঘাত হয়েছে। আমি হাত নাড়াতে পারি না। পারলে আমি তোমার হাত ধরতাম। ফিহা বৃদ্ধের হাত ধরলেন।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি সময় সমীকরণের সমাধান করতে যাচ্ছ?

'হ্যাঁ।'

'তুমি চাচ্ছ অতীতে ফিরে যেতে। যাতে আদি মেন্টালিস্ট তৈরির এক্সপেরিমেন্ট কেউ করতে না পারে।'

'আপনারা মেন্টালিস্ট। আমি কি ভাবছি তার সবই আপনারা জানেন।'

'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তুমি জান না তোমার চিন্তায় বড় ধরনের ভুল আছে। তুমি যেই মুহূর্তে সমাধান বের করবে সেই মুহূর্তে মেন্টালিস্টরা তা জেনে যাবে। অতীতে তুমি যেতে পারবে না ফিহা, তোমাকে যেতে দেয়া হবে না। তোমার বিদ্যা কাজে লাগিয়ে একটি রোবট পাঠানো হবে। তাকে মেন্টালিস্ট তৈরির বিদ্যা শিখিয়ে দেয়া হবে। এই ভাবেই চক্র সম্পন্ন হবে।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'চক্র ভাঙা যাবে না?'

'তুমি যদি সময় সমীকরণ বের না কর তাহলেই চক্র ভেঙে যাবে। অতীতে কেউ যেতে পারবে না। মেন্টালিস্ট তৈরি হবে না। চক্র সম্পূর্ণ করার জন্যেই তোমাকে দরকার। ধর্মগ্রন্থে তা আছে।'

'ধর্মগ্রন্থে কি আছে ?'

'ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে—জ্ঞানী শত্রুদের প্রতি মমতা রাখিও কারণ জ্ঞানী শত্রুরা জগতের মহৎ কর্ম সম্পাদন করে। তোমাদের মহা শত্রুর কারণেই তোমরা চক্র সম্পন্ন করবে। সে মিরানের পালক পুত্র। সে জ্ঞানী।'

'ধর্মগ্রন্থে আমার উল্লেখ আছে বলেই কি মেন্টালিস্টরা আমাকে আলাদা করে দেখে ?'

'হ্যাঁ। তোমার জ্ঞান তাদের প্রয়োজন। তোমার জ্ঞান ছাড়া চক্র সম্পূর্ণ হবে না।'

ফিহা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধা বললেন, আমরা দু'জন সর্বশক্তি দিয়ে তোমার মস্তিষ্ক রক্ষা করে চলেছি। চল্লিশ বছর ধরেই করছি। যে কারণে এখনো কেউ তোমার মস্তিষ্ক থেকে কিছু জানে না। আমরা বেশিদিন বাঁচব না। তখন সবাই জানবে। আমাদের যা বলার তোমাকে বললাম, এখন তুমি তোমার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করবে।

ফিহা বললেন, আমি আপনাদের ভালবাসি।

'জানি। ভালবাসার কথা বলার প্রয়োজন হয় না।'

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দু'জনই কাঁদতে লাগলেন।

ফিহা দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি যদি মারা যাই তাহলে চক্র ভেঙে যাবে। কারণ সময় সমীকরণ বের হবে না।

বৃদ্ধ মিরান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ফিহা বললেন, চক্র ভেঙে গেলে মেন্টালিস্ট তৈরি হবে না। মেন্টালিস্টদের বিষয়ে বই লেখা হবে না। মেন্টালিস্টদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের সমস্ত লেখা মুছে যাবে।

বৃদ্ধ বৃদ্ধা দু'জনই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আমার যে হঠাৎ আপনাদের কাছে আসার ইচ্ছা হল তার কারণ কি এই যে আপনারা আমাকে ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ। তুমি যেভাবে ভাঙতে চাচ্ছ সেভাবে তা সম্ভব নয়। এই কথাটি তোমাকে জানিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।'

'আপনারা চান চক্র ভেঙে যাক ?'

'চাই। এই চক্র অন্যায় চক্র।'

'আপনাদের কাছে কি কোনো বিষ আছে ?'

'হ্যাঁ। আমরা জোগাড় করে রেখেছি। আমরা জানি তুমি চাইবে।'

বৃদ্ধা বিষের শিশি বের করে আনলেন। দশ বছর ধরে তাঁরা এই শিশি আগলে রেখেছেন। এখন আর আগলে রাখার প্রয়োজন নেই।

ফিহা বললেন, বিষের ক্রিয়া কতক্ষণ পর শুরু হবে?

'ঘন্টা খানেক লাগবে। ক্রিয়া করবে খুব ধীরে। ব্যথা বোধ হবে না। আমরা তোমাকে ব্যথা পেতে দেব না। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছতে পারবে।'

ফিহার হাতে একরাশ গোলাপ। বাড়ি ফিরছেন হেঁটে হেঁটে। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন। তাঁর চিন্তা চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তবু গভীর আনন্দে তাঁর মন পরিপূর্ণ। চক্র ভেঙে যাচ্ছে। ভয়ংকর একটি চক্র ভেঙে যাচ্ছে। ফিহা দ্রুত পা ফেলতে চেষ্টা করছেন। যে করেই হোক নুহাশের কাছে পৌঁছতে হবে। তার গল্পটির শুরুটা হলেও শুনতে হবে। মনে হয় ভোর হতে বেশি দেরি নেই। চারদিকে আলো হতে শুরু করেছে। ফিহার হাতের ফুলগুলি রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। তিনি দূরে ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। কোত্থেকে আসছে এই ঘন্টাধ্বনি?

রাস্তার মানুষ অবাক হয়ে দেখছে ফুল বিছিয়ে বিছিয়ে একজন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। সে পা ফেলছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। অন্ধকারে মানুষটিকে চেনা যাচ্ছে না। যারা ফুল ছড়িয়ে এগিয়ে যায় তাদের চেনারও তেমন প্রয়োজন নেই।

শূন্য

সকাল থেকেই তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। শুরুতে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেননি। স্কুলে রওনা হবার আগে আয়নার চুল আঁচড়াতে গিয়ে মনে হল—বাঁ চোখের কোণাটা ভেজা ভেজা। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আয়নায় ভালো করে তাকিয়ে দেখেন শুধু বাঁ চোখ না, দু'চোখ দিয়েই পানি পড়ছে। অথচ চোখে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। রহস্যটা কি ? বয়সকালে শরীরবৃত্তির নিয়ম-কানুন কি অন্য রকম হয়ে যায় ?

খানিকটা বিস্ময় এবং খানিকটা বিরক্তি নিয়ে তিনি স্কুলে গেলেন। প্রথম পিরিয়ডে বীজগণিত। ক্লাস নাইন। সেকশান বি। ফার্স্ট পিরিয়ডে রোলকল করতে হয়। শুধু শুধু সময় নষ্ট। চুয়ান্নজন ছেলে। প্রতি ছেলের পেছনে চার সেকেন্ড করে ধরলে—দুইশ' ষোল সেকেন্ড। অর্থাৎ তিন দশমিক ছয় মিনিট। পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসের আঠারো ভাগের একভাগ সময় চলে গেল। সময়ের কি নিদারুণ অপচয় ! কোনো মানে হয় না।

হেডমাস্টার সাহেবের কঠিন নিয়ম। রোলকল করতে হবে। বত্রিশ বছর মনসুর সাহেব নিয়ম পালন করেছেন। রোলকল করে সময় নষ্ট করেছেন। আজই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। রোলকল না করে সরাসরি বোর্ডে চলে গেলেন।

চোখ দিয়ে পানি পড়াটা এই সময় বেড়ে গেল। বোর্ডে যা লেখেন পড়তে পারেন না। চোখের পানির জন্যে সব ঝাপসা দেখা যায়। তিনি এক সময় বিব্রত গলায় বললেন, থাক, আজ আর পড়াব না। চোখে সমস্যা।

ছাত্ররা কেউ শব্দ করল না। আগে যেমন বোর্ডের দিকে তাকিয়েছিল এখনো তেমনি তাকিয়ে রইল। মনসুর সাহেব বললেন—চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। বোর্ডের লেখা পড়তে পারছি না।

এই কথার পরেও ছাত্ররা বোর্ডের লেখা থেকে চোখ সরাল না, যেন তারা পাথরের মূর্তি। মনসুর সাহেবের মন কিছুটা খারাপ হল। ছেলেরা তাকে এত ভয় পায় কেন ? তিনি তাঁর বত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে—কোনো ছাত্রকে ধমক পর্যন্ত দেননি। তাহলে এরকম হচ্ছে কেন ?

পাশের ক্লাসের বীরেন বাবু জিওগ্রাফি পড়াচ্ছেন—জলবায়ু। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কি সব বলছেন—ছাত্ররা হো হো করে হাসছে। হাসি শুরু হয় আর থামতে চায় না। বীরেন বাবু রাগী গলায় ধমকান, থামবি ? না ধরে আছাড় দেব ? কানে চাবি দিয়ে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেব, বুঝলি ? ছাত্ররা আরো হাসে। মনসুর সাহেবের মনে হল, ক্লাস এরকমই হওয়া উচিত। ছাত্ররা আনন্দে থাকবে। যা শেখার শিখবে আনন্দে। এমন যদি হত—বীরেন বাবু বাজে টিচার, ভালো পড়াতে

পারেন না, তাহলে একটা কথা ছিল। ব্যাপার মোটেই সে রকম নয়। শিক্ষক হিসেবে বীরেন বাবুর কোনো তুলনা নেই।

মনসুর সাহেব চক হাতে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মনে করার চেষ্টা করছেন—তাঁর এই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে কখনো কি তাঁর কোনো কথায়, কোনো রসিকতায় ছাত্ররা প্রাণখুলে হেসেছে?

তিনি মনে করতে পারলেন না। ছাত্রদের মুগ্ধ করার কোনো বিদ্যা তাঁর জানা নেই। তিনি গল্প করতে পারেন না। গল্প শুনতেও তাঁর ভালো লাগে না। কোনো কিছুই তাঁর বোধহয় ভালো লাগে না। তিনি আগ্রহ বোধ করেন না। এই যে এতগুলি ছাত্র তাঁর সামনে বসে আছে তিনি এদের কারোর নাম জানেন না। রাস্তায় এদের কারোর সঙ্গে দেখা হলে তিনি চিনতে পারবেন না। অথচ তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল নয়। আজ ছাত্র কতজন আছে? আজ সবাই কি উপস্থিত? তিনি গোনার চেষ্টা করছেন। চোখে অস্পষ্ট দেখছেন বলে গুনতে অসুবিধা হচ্ছে।

'তোমরা আজ কতজন উপস্থিত?'

ফর্সা একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত গলায় বলল—'স্যার ৪১ জন।'

তিনি একটু চমকালেন—একচল্লিশ জন উপস্থিত। একচল্লিশ একটা মৌলিক সংখ্যা। প্রাইম নাম্বার। একচল্লিশ জন উপস্থিত হলে অনুপস্থিত হল ১৩ জন। ১৩ আরেকটি মৌলিক সংখ্যা। প্রাইম নাম্বার। বাহ্, পরস্পর দু'টা প্রাইম সংখ্যা পাওয়া গেল। ইন্টারেস্টিং তো।

মনসুর সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়া বেড়েছে। চশমার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আবারও বললেন—আমার চোখে একটা সমস্যা হয়েছে। পানি পড়ছে। আজ তোমাদের পড়াব না। বাবারা, আমি দুঃখিত ও লজ্জিত।

তিনি নিজের চেয়ারে বসলেন। ক্লাস শেষ হতে এখনো অনেক বাকি। এতক্ষণ কি করবেন? বসে থাকবেন চুপচাপ? এতে ছাত্রদের ক্ষতি হবে। সেটা ঠিক হবে না। উপদেশমূলক কোনো গল্প বলতে পারলে ভালো হত। উপদেশটা গল্পচ্ছলে শিখলেও লাভ। ঈশপের একটা গল্প বলা যেতে পারে। ঈশপের গল্পগুলি কি যেন—? একটা গল্প আছে না—ধোপাদের নীলের গামলায় একবার এক শেয়াল পড়ে গেল। তার গা হয়ে গেল ঘন নীল—এটা কি ঈশপের গল্প, না অন্য কারো গল্প? এই গল্পের উপদেশটা কি? আশ্চর্য! উপদেশটা মনে পড়ছে না।

মনসুর সাহেব তাঁর সামনের টেবিলে হাত রেখে তার উপর মাথা রাখলেন—এই ভাবেই গল্পটা মনে করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। তাঁর ঘুম ভাঙল না। ছাত্ররাও কেউ কোনো শব্দ করল না। পরের

পিরিয়ডে হেডমাস্টার সাহেবের ইংরেজি পড়াবার কথা। তিনি মনসুর সাহেবকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ ?

'জ্বি না।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। চোখে কি হয়েছে ?'

'বুঝতে পারছি না। পানি পড়ছে।'

'এই শরীর নিয়ে ক্লাসে এসেছেন কেন ? যান যান—বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিন।'

মনসুর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, বাসায় কি নিজে নিজে যেতে পারবেন, না কেউ গিয়ে দিয়ে আসবে ?

'যেতে পারব। নিজেই যেতে পারব।'

'বজলুর ফার্মেসিতে আগে যাবেন। বজলু আছে। ওকে চোখটা দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে তারপর যাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনার বয়স হয়েছে। শরীর দুর্বল। এই বয়সে শরীরের দিকে খুব যত্ন নিতে হয়।'

মনসুর সাহেব খুবই লজ্জিত বোধ করছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন সেই কারণে লজ্জা। তারচেয়েও বড় লজ্জা তাঁর কারণে হেডমাস্টার সাহেব কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। ছাত্রদের না পড়িয়ে—অকারণ উদ্বেগ দেখাচ্ছেন অন্যের স্বাস্থ্য নিয়ে। অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তিনি চেয়ার থেকে নামলেন, নামতে গিয়ে মনে হল, পায়েও তেমন জোর পাচ্ছেন না। পড়ে যাচ্ছিলেন। হেডমাস্টার সাহেব হাত ধরে ফেলে আবারও বললেন, আমি আপনার উপর খুবই রাগ করেছি মনসুর সাহেব। এক্সট্রিমলি এনয়েড। আগে শরীর, তারপর অন্য কথা। শরীর গেল তো সবই গেল। সংস্কৃতিতে এ বিষয়ে একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা হচ্ছে...। যাই হোক, মনে পড়ছে না। শরীরং...

মনসুর সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন—অকারণে একটা মানুষ এত কথা বলে কেন ? একই কথা বারবার বলার অর্থ কি ? তিনি ক্লাস থেকে বেরুবার সময়ও ধরজায় ধাক্কা খেলেন। ছাত্ররা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে।

হেডমাস্টার সাহেব গ্রামার পড়াবেন। চক হাতে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। ব্ল্যাকবোর্ডে বিচিত্র সব জিনিস লেখা। সাঙ্কেতিক চিহ্নের মতো চিহ্ন বোর্ডের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ঠাসা।

হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, এইসব কি ? কে লিখেছে এসব ? হু হ্যাজ রিটেন দিজ ?

ক্লাস ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল।

'জবাব দিচ্ছ না কেন ? কে এইসব হিবিজিবি লিখেছে ? হু ইজ দ্য কালপ্রিট ?'

'মনসুর স্যার।'

'মনসুর সাহেব লিখেছেন।'

'জ্বি।'

'কি এইসব ?'

'জানি না স্যার।'

'জান না মানে ? তোমরা জিজ্ঞেস করনি ?'

'জ্বি না।'

'তোমাদের জানার আগ্রহ ছিল না ?'

'ভয় লাগে স্যার।'

'উনার কী পড়াবার কথা ছিল ?'

'এলজেব্র্যা।'

হেডমাস্টার সাহেব ডাস্টার হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। বোর্ডের লেখাগুলি মুছে ফেলা উচিত কি-না তিনি বুঝতে পারছেন না। কাউকে কি ডেকে এনে দেখাবেন ? মানুষটার হয়েছে কি ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? এ তো বড় চিন্তার বিষয় হল। মানুষটাকে একা একা বিদেয় করা ঠিক হয়নি। একজন কাউকে সঙ্গে দেয়া উচিত ছিল।

মনসুর সাহেব ক্লাস থেকে বের হয়ে কমনরুমে খানিকক্ষণ বসলেন। ছুটির দরখাস্ত লিখে রেখে যাওয়া দরকার। হেডমাস্টার সাহেব ছুটি দিয়েছেন বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি রওনা হবেন এটা ঠিক না।

কমনরুমে ফজলুর রহমান বসে আছেন। খবরের কাগজ পড়ছেন। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে, তারপরেও উনি বসে আছেন কেন ? এই মানুষটা সব সময় ক্লাসে যেতে দেরি করেন। অনুচিত একটা কাজ। তাঁর থেকে ছাত্ররা ফাঁকি শিখবে। এই বয়সটা হল তাদের শেখার বয়স। এই বয়সে তারা যা দেখে তাই শেখে।

'ফজলুর রহমান সাহেব !'

'জ্বি !'

'ক্লাস নেই ?'

'আছে।'

'যাবেন না ?'

'খবরের কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়ে যাই। বাংলা ফার্স্ট পেপার। এটা পড়ানো না পড়ানো একই।'

বাংলার কথা শুনে মনসুর সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন—ভালো কথা, আপনি কি ঈশপের ঐ গল্পটা জানেন ?

'কোন্ গল্প ?'

'ঐ যে একটা শেয়াল ধোপার নীলের গামলায় পড়ে গেল। তার গা হয়ে গেল নীল...'

'শেয়াল না। একটা গাধা পড়েছিল।'

'ঐ গল্পের মোরালটা কি ?'

ফজলুর রহমান সাহেব খবরের কাগজ মুড়ে রাখতে রাখতে বললেন, ঈশপের গল্পের মোরাল সবই ফালতু মোরাল। এইসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কারণ নেই—এই যুগের মোরাল হল—

'Eat, drink and be happy.'

মনসুর সাহেব ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। ছুটির দরখাস্ত লিখতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। চোখ দিয়ে খুব পানি পড়ছে।

২

মনসুর সাহেব থাকেন আজিজ খাঁ বেপারির গুদামঘরের উপরে। কেরোগেটেড টিনের দেয়ালে ঘেরা গুদামঘর। তার উপরে দু'টা ঘর। একটায় থাকেন মনসুর সাহেব। অন্য ঘরটা খালি। আজিজ খাঁ বলেছেন—স্যার, ইচ্ছা করলে এই ঘরটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। একটায় ঘুমাবেন, অন্যটায় লেখাপড়ার কাজ করবেন।

মনসুর সাহেব রাজি হননি। তাঁর জন্যে একটা কামরাই যথেষ্ট। দু'টা কামরা মানেই বাহুল্য। তিনি সারাজীবন বাহুল্য বর্জন করতে চেয়েছেন।

নিজের ঘরটা তিনি তাঁর প্রয়োজনমতো সাজিয়ে নিয়েছেন। বড় একটা খাট আছে। ছোট খাটে তিনি শুতে পারেন না। ঘুমুবার সময় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে ভালো লাগে। খাটের সঙ্গেই টেবিল। টেবিলটাও বড়। ঘরে কোনো চেয়ার নেই। খাটে বসেই যেহেতু টেবিলে লেখালেখি করা যায় কাজেই চেয়ার তাঁর কাছে বাহুল্য বলে মনে হয়েছে। একটা আলনা আছে। আলনা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। কাপড়-চোপড় সামনে থাকে। যখন যেটা দরকার হাত বাড়িয়ে নিতে পারেন।

তাঁর ঘরে শৌখিন জিনিসের মধ্যে একটা সিলিং ফ্যান আছে। নতুন সিলিং ফ্যান। এর পাখা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া। আজিজ খাঁ বেপারি সিলিং ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছেন। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে সিলিং ফ্যান কখনো চলে না।

নেত্রকোনা শহরে ইলেকট্রিসিটি আছে। আজিজ বেপারির গুদাম শহরের বাইরে বলে ইলেকট্রিসিটির লাইন এখনো দেয়নি। তবে পোল বসাচ্ছে। খুব শিগগিরই ইলেকট্রিসিটি চলে আসার কথা।

মনসুর সাহেবের জায়গাটা খুব পছন্দ। নিরিবিলির কারণেই পছন্দ। গুদামে যখন মাল তোলা হয় কিংবা মাল খালাস করা হয় তখন কিছু চৈ-চৈ থাকে। বাকি সময়টা সুনসান নীরবতা। গুদামের দু'জন দারোয়ান। এর একজন কোনো কথাই বলে না। অন্যজনের কথা বলার প্রচণ্ড নেশা। কথা বলার লোক পায় না বলে সেও কথা বলতে পারে না। এই দারোয়ানের নাম হরমুজ মিয়া। সে মনসুর সাহেবের খাওয়া-দাওয়া দেখে। এই কাজের জন্যে মাসে তাকে পঞ্চাশ টাকা করে দেয়া হয়। মনসুর সাহেবের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল। তিনি বলে দিয়েছেন, এক পদের বেশি দ্বিতীয়পদ যেন কখনো রান্না করা না হয়। দ্বিতীয়পদ মানেই বাহুল্য।

হরমুজ মিয়ার উপর কঠিন নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে প্রায়ই এটা-ওটা রেঁধে ফেলে। সিমের ভর্তা, পাকা টমেটোর ভর্তা, কুমড়ো ফুলের বড়া। মনসুর সাহেব বিরক্ত হন, কিন্তু হরমুজকে কিছু বলতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন—মানুষ মাত্রই বাহুল্যপ্রিয়। একটা বাড়িই মানুষের জন্যে যথেষ্ট, তারপরেও টাকা থাকলেই সে দু'টা-তিনটি বাড়ি বানাবে। আজিজ বেপারির নেত্রকোনা শহরেই তিনটা বাড়ি। এখন আবার ঢাকার সোবাহানবাগ এলাকায় বাড়ি বানাচ্ছে। বাড়ি বানানোর খবর দেয়ার জন্যে কে মনসুর সাহেবের কাছে এসেছিল। মনসুর সাহেব বলেছেন—এতগুলি বাড়ির তোমার দরকার কি ? একটা মাকড়সাকে দেখ। সে একটাই বাড়ি বানায়। সুতার তৈরি একটাই ঘর। কোনো মাকড়সা দেখবে না যে চার-পাঁচটা ঘর বানিয়ে রেখেছে।

আজিজ খাঁ বিনয়ের সঙ্গে বলেছে, যথার্থ বলেছেন স্যার। যথার্থ কথা। তবে ব্যাপার হল কি—বাড়িগুলি ভাড়া দিলে আয় হয়। ফিক্সড ইনকাম। মাসের শেষে হাতে চলে আসে। চিন্তা-ভাবনা করা লাগে না।

'এত ইনকাম দিয়ে-ই বা তোমার প্রয়োজন কি ?'

'খরচ-বরচ আছে। টাকার দরকার কখনো শেষ হয় না। তারপর ধরেন, টাকার কারণে দান-খয়রাত করতে পারি। এতে সোয়াব হয়। স্যার শুনলে সুখী হবেন—নিজের খরচে আমি একটা হাফেজিয়া মাদ্রাসা করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে

একটা মসজিদ বানানোর ইচ্ছা আছে। মাকড়সার তো আর মাদ্রাসা দিতে হয় না, মসজিদও বানাতে হয় না।'

আজিজ বেপারির হাস্যকর যুক্তিতে রাগে গা জ্বলে যাবার কথা। মনসুর সাহেবের তেমন রাগ হয় না। নির্বোধ মানুষের সকল কথা ধরতে নেই। নির্বোধ মানুষের যুক্তিও শুনতে নেই। আজিজকে তিনি নির্বোধ শ্রেণীর একজন হিসেবেই জানেন। নির্বোধদের প্রতি এক ধরনের মমতা মানুষের থাকে। তাঁরও আছে। আজিজ খাঁ ঘোর বৈষয়িক মানুষ। বৈষয়িক মানুষ বিষয় ছাড়া অন্য কিছু ভালবাসতে পারে না। তাদের সেই ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু আজিজ খাঁ সত্যিকার অর্থেই মনসুর সাহেবকে ভালবাসেন। নতুন ফ্যান কিনে এনে লাগিয়ে দেয়ার পেছনে তাঁর ভালোবাসাই কাজ করেছে। অন্য কিছু না। তাঁর গুদামঘর পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটির লাইন আনার জন্যে তিনি সাবডিভিশনাল ইনজিনিয়ারকে এক হাজার টাকা ঘুস দিয়েছেন।

মনসুর সাহেবকে যেন পোলাওয়ের চালের ভাত রান্না করে দেয়া হয় সে জন্যে মাসের শুরুতেই তিনি আধমণ চিনিগুড়া চাল হরমুজের কাছে পাঠিয়ে দেন। হরমুজকে বলা হয়েছে এই ব্যাপারটা সে যেন গোপন রাখে। হরমুজ সেই পোলাওয়ের চাল বাজারে বিক্রি করে দেয়। কারণ সে লক্ষ করেছে মনসুর সাহেব পোলাওয়ের চাল এবং সাধারণ চালের পার্থক্য ধরতে পারেন না। কয়েকবার সে পোলাওয়ের চালের ভাত রেঁধে দিয়েছে। মনসুর সাহেব একটা শব্দও করেননি।

আজিজ বেপারির এই বাড়িতে মনসুর সাহেব আছেন গত এগারো বছর ধরে। প্রতি মাসে ঘরে থাকার ভাড়া বাবত ত্রিশটা টাকা নিজে আজিজ বেপারিকে দিয়ে তার কাছ থেকে রসিদ নিয়ে আসেন। তিনি জানেনও না এগারো বছর আগে ত্রিশ টাকার যে মূল্য ছিল আজ সে মূল্য নেই। এক কেজি চিনির দামই ত্রিশ টাকা। জগৎ-সংসার থেমে নেই—শুধু মনসুর সাহেব থেমে আছেন। তিনি তা জানেন না।

চোখের সমস্যা নিয়ে মনসুর সাহেব অসময়ে তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। তালা খুলে বিছানায় শুয়ে রইলেন। দুপুরে তাঁর ঘুমানোর অভ্যাস নেই। আজ বিকেল পর্যন্ত ঘুমুলেন। ঘুম ভেঙে মুখ ধুতে গিয়ে লক্ষ করলেন—চোখ জ্বালা করছে। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হল। চোখ জ্বালা করলে তো সমস্যা। রাত জেগে কাজ করতে হবে। চোখ জ্বালা করলে কাজ করবেন কীভাবে? ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসাই ভালো। তা ছাড়া ঘরে কাগজ নেই। কাগজ কিনতে হবে। কলমের কালি কিনতে হবে। বল পয়েন্টে তিনি লিখতে পারেন না। আরো কিছু টুকটাক জিনিস

বোধহয় লাগবে। চিনি নেই। লেবু নেই। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে এক গ্লাস লেবুর সরবত খান। এটাও এক অর্থে বাহুল্য। তবে অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস খুব খারাপ জিনিস। অভ্যাস মানুষকে বিলাসী করে।

'স্যার কি নিদ্রা করতেছেন?'

হরমুজ মিয়া দরজা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। কঠিন কঠিন বাক্য ব্যবহার করে সে আনন্দ পায়।

'কি ব্যাপার হরমুজ?'

'আপনের কাছে একটা আবেদন ছিল।'

'বল।'

হরমুজ ঘরে ঢুকল। দীর্ঘ কোনো গল্পের প্রস্তুতি সে নিচ্ছে। এক দুই কথায় সে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

'স্যার, আমার মধ্যম কন্যার শাদি হয়েছে—সান্দিকোনায়। জামাই ঘরামির কাজ করে। চৈত্র মাসে এরার কোনো কাজকাম থাকে না...'

মনসুর সাহেব হরমুজের গল্প সংক্ষেপ করার জন্যে বললেন—সাহায্য চাও?

'জ্বি না। সাহায্য না।'

'তাহলে কি?'

'মেয়েটার সন্তান হবে। এর আগে একবার গর্ভ নষ্ট হয়েছে। আমাকে বলেছে মদনপুরের পীর সাহেবের ফুল গাছ থেকে একটা 'পুষ্প' তার জন্যে নিয়ে যেতে...'

'ছুটি চাও?'

'জ্বি। দুই দিনের ছুটি।'

'যাও।'

'আপনার খাওয়া-দাওয়া?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। একজন তো আছেই—বসির আছে না?'

'জ্বি না। বসির ছুটি নিয়ে চলে গেছে।'

'অসুবিধে কিছু নেই।'

'বাইরে-টাইরে ভ্রমণের জন্যে গেলে গেইটে তালা দিয়ে যাবেন। এই যে স্যার তালাচাবি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'ভয় পাবেন না তো স্যার?'

'না, ভয় পাব কেন? ভয় পাবার কিছু আছে?'

'জ্বি না। ভয়ের কিছু নাই। তবে স্যার সত্য কথা বলতে কি—জিনের সামান্য উপদ্রব আছে। একটা দুষ্ট জিন আছে—গ্রামেই থাকে। মাঝে মধ্যে ফাইজলামি করে। একবার কি হয়েছে স্যার শুনুন—শ্রাবণ মাস—ঝুম বৃষ্টি...'

'তুমি এখন যাও হরমুজ। আমার শরীরটা ভালো না। আমি একটু বিশ্রাম করব।'

'জ্বি আচ্ছা। আরেকটা ছোট্ট আবেদন ছিল স্যার। অপরাধ না নিলে নিবেদন করি—আমি স্যার এই যে ছুটি নিয়ে চলে গেলাম এটা সাহেবকে বলবেন না।'

'আজিজ কিছু জিজ্ঞেস না করলে অবশ্যই বলব না। তবে জিজ্ঞেস করলে তো বলতেই হবে। আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

'মাঝে মধ্যে দু'-একটা মিথ্যা বললে কিছু হয় না স্যার। সত্য যেমন আল্লাহপাকের সৃষ্টি মিথ্যাও তেমন তাঁরই সৃষ্টি।'

'তুমি এখন যাও হরমুজ।'

হরমুজ চলে গেল, তবে যাবার আগে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মনসুর সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল।

'স্যার, গরিবের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।'

'আচ্ছা রাখব। দোয়া রাখব। এখন তুমি যাও।'

'আপনাকে একা ফেলে যেতে খুব পেরেসান, কিন্তু...'

'তুমি যাও তো।'

মনসুর সাহেব সন্ধ্যার আগে নেত্রকোনা শহরের দিকে রওনা হলেন। যে কাজগুলি সারতে হবে সেগুলি হচ্ছে :

১. কাগজ কিনতে হবে।
২. চিনি কিনতে হবে।
৩. লেবু কিনতে হবে।
৪. ডাক্তার বজলুর রহমানকে চোখ দেখাতে হবে।
৫. ফাউনটেনপেনের কালি কিনতে হবে।

মোট পাঁচটা কাজ। পাঁচ সংখ্যাটা ইন্টারেস্টিং। মৌলিক সংখ্যা। প্রাইম নাম্বার। সংখ্যার জগতে চতুর্থ প্রাইম নাম্বার। প্রথমটা হল ১, তারপর ২, তারপর ৩, তারপরই ৫, পাঁচের পর ৭, সাতের পর ১১, এগারোর পর ১৩, তেরোর পর ১৭, সতেরোর পর ১৯...

এক থেকে দশের ভেতর প্রাইম নাম্বার হল পাঁচটা।

দশ থেকে কুড়ির ভেতর চারটা...

কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে মাত্র দুটা। সংখ্যা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইম নাম্বারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর...

মনসুর সাহেব মাথা থেকে মৌলিক সংখ্যার চিন্তা-ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। সারাক্ষণ মাথায় এইসব ঘুরলে ভালো লাগে না।

আকাশে মেঘ জমছে। চৈত্রমাসে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করার অর্থ ভালো না। ঝড় হবে। খোলা মাঠে ঝড়ের ভেতর পড়ার অভিজ্ঞতা ভয়াবহ হবার কথা। মনসুর সাহেবকে তেমন উদ্বিগ্ন দেখা গেল না। অথচ তাঁর মতো আরো যারা শহরের দিকে যাচ্ছে তারা উদ্বিগ্ন। দ্রুত হাঁটছে। বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। সবচে' বড় আশঙ্কা হল শিলাবৃষ্টির। চৈত্রের শেষাশেষি আকাশ ঘন কালো হয়ে উঠলে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেই। খোলামাঠে শিলাবৃষ্টির হাতে পড়লে ভয়াবহ সমস্যা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের এই রাস্তা নতুন হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে গাছপালা কিছু নেই। বছর দুই আগে বনবিভাগ চারা লাগিয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে ছাগলে খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে।

ছোটবাজারে আজিজ বেপারির একটা স্টেশনারি দোকান আছে। মনসুর সাহেব সেখান থেকেই কাগজ, কালি কিনলেন। দাম দিতে হল না। তারা খাতায় লিখে রাখে। মাসের শুরুতে বিল করে টাকা নেয়। মনসুর সাহেবের ক্ষীণ সন্দেহ এরা হিসেবে কোনো গণ্ডগোল করে, কারণ তিনি প্রচুর কাগজ কেনেন, কিন্তু বিল এত কম হয়। আজিজ বেপারিকে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বলেছিলেন। আজিজ বলেছে, এইসব নিয়ে আপনি ভাববেন না তো স্যার। আমরা পাইকারি হিসেবে বিল করি। এতে খানিকটা কম হয়।

আজিজ আজ দোকানে ছিল না। তার এক কর্মচারী বদরুল কাগজ এবং কালি পলিথিনের ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, দিনের অবস্থা ভালো না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান স্যার। ঝড় হবে। স্যারের সঙ্গে কি ছাতা আছে?

'না।'

'একটা ছাতা নিয়ে যান।'

'ছাতা নিব না। আমার ছাতা খুব হারায়।'

'হারালে হারাবে, ছাতাটা নিয়ে যান। আমি বরং একটা রিকশা ঠিক করে দেই। রিকশা আপনাকে নিয়ে যাবে—বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে রিকশাও পাবেন না—কাঁচা রাস্তায় রিকশা যাবে না।'

'না না, রিকশা লাগবে না। রিকশায় আমি চড়ি না। রিকশার ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার অসুবিধা হয়।'

দোকানি বিস্মিত হয়ে বলল, কি চিন্তা ?

মনসুর সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, তেমন কিছু না। হাঁটতে হাঁটতে যা মাথায় আসে। যেমন ধর প্রাইম সংখ্যা...

'সেটা কি ?'

'মৌলিক সংখ্যা, যে সংখ্যাকে সেই সংখ্যা এবং ১ এই দুটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভাগ দেয়া যায় না। যেমন ধর তিন একটা মৌলিক সংখ্যা, আবার চার মৌলিক সংখ্যা না। চারকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ দিতে পারছ। তারপর আসে পাঁচ। পাঁচ মৌলিক সংখ্যা। পাঁচের পর আসছে সাত...'

বদরুল হতচকিত গলায় বলল, আর বলতে হবে না স্যার। মাথা আউলা হয়ে যাচ্ছে। আপনি হাঁটতে হাঁটতে এইসব চিন্তা করেন ?

'হ্যাঁ।'

'কি হয় এসব চিন্তা করে ?'

'কিছু হয় না। মনের আনন্দ।'

'স্যার, এর মধ্যে আনন্দের কি আছে ?'

মনসুর সাহেব আনন্দের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। ব্যাখ্যা তাঁর নিজেরও জানা নেই। চিন্তা করলে আনন্দ হয়—এটাই শুধু জানেন।

মনসুর সাহেব বললেন, কাগজ কতগুলি দিয়েছ ?

'তিন দিস্তা দিয়েছি। স্যার, আরো লাগবে ?'

'আরো কিছু দিয়ে দাও। কাগজ এখন বেশি লাগছে।'

'প্রতি সপ্তাহে কাগজ নেন। আপনি স্যার এত কাগজ দিয়ে করেন কি ?'

'হিসাব-নিকাশ করি।'

'কীসের হিসাব-নিকাশ ?'

'ইয়ে মানে একটা অঙ্ক করছি। জটিল অঙ্ক...মানে ঠিক...'

বদরুল হা করে তাকিয়ে রইল। সে এই দোকানে কাজ করছে বেশিদিন না—তিন বছরের মতো হবে। এই তিন বছর ধরেই সে এই মানুষটাকে কাগজ দিয়ে যাচ্ছে। কোনো সপ্তাহে তিন দিস্তা, কোনো সপ্তাহে পাঁচ।

'স্যার, অঙ্কটা কি ?'

'তেমন কিছু না। শখের একটা ব্যাপার। যাই কেমন ?'

'চা খেয়ে যান স্যার। ঝড়-বাদলের দিন, চা খেলে ভালো লাগবে।'

'ঝড়-বাদলা কোথায় ?'

'এখনো নাই, তবে স্যার শুরু হবে।'

'চা খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'একটু খান স্যার। আপনি কিছু না খেয়ে শুধু-মুখে চলে গেলে সাহেব রাগ করবেন। চা আনতে ফ্ল্যাস্ক নিয়ে লোক গেছে। এসে পড়বে।'

মনসুর সাহেব বসলেন। বদরুল বলল—আপনার অঙ্কটার বিষয়ে কিছু বলেন স্যার শুনি। শখের একটা অঙ্ক করছেন। শুনেই কেমন লাগে। অঙ্ক আর মানসাঙ্ক এই দুইয়ের নাম শুনলেই এখনো কলিজা কাঁপে। তাও ভালো, এখনকার ছাত্রদের মানসাঙ্ক করতে হয় না...মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে...ওরে বাপরে, কী জিনিস ছিল ! স্যার, আপনার অঙ্কটা কি ?

'ঐটা হল তোমার ফিবোনাক্কি রাশিমালা নিয়ে একটা কাজ।'

বদরুল হতভম্ব হয়ে বলল, কি রাশিমালা বললেন ?

'ফিবোনাক্কি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত গণিতবিদ লিওনার্ডো ফিবোনাক্কি এই রাশিমালা বের করেছিলেন। মরবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন—প্রকৃতির মূল সমস্যা এই রাশিমালাতে আছে।'

'স্যার, বলেন কি ?'

'মৃত্যুর সময় তিনি খুব আফসোস নিয়ে মারা গিয়েছিলেন।'

'আফসোস কি জন্যে ?'

'রহস্যময় এক রাশিমালা বের করলেন কিন্তু সেই রাশিমালা নিয়ে কাজ করে যেতে পারলেন না—এই নিয়ে আফসোস। মৃত্যুর সময় চিৎকার করে বলছিলেন—হে ইশ্বর, আমাকে আর মাত্র তিন বছর আয়ু দাও—মাত্র তিন...'

'আহা বেচারা ! আর তিন বছর বাঁচলে ফাটাফাটি হয়ে যেত। তাই না স্যার ?'

মনসুর সাহেব এই কথার কোনো উত্তর দিলেন না। চা এসে গেছে। তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন। ঠাণ্ডা চিনির সরবত। না খেলে বদরুল মন খারাপ করবে বলেই খাওয়া।

'ফিক্কি রাশিমালা ব্যাপারটা কি স্যার ?'

'ফিক্কি না, ফিবোনাক্কি। আমাদের সাধারণ রাশিমালা তো তুমি জানই।'

'জানি না স্যার। অঙ্কে আমি মারাত্মক কাঁচা। মেট্রিকে একচল্লিশ পেয়েছিলাম। অঙ্কের স্যার আমি এত নাম্বার পেয়েছি শুনে কী যে অবাক হয়েছিলেন ! আমি স্যার কিছুই জানি না।'

মনসুর সাহেব সহজ গলায় বললেন, অবশ্যই জান। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ...এই হল সাধারণ রাশিমালা।

'এটা জানি।'

'এরকম আরো রাশিমালা আছে, যেমন—শুধু মৌলিক সংখ্যার রাশিমালা—'১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১... ফিবোনাক্কি রাশিমালা হল—১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯...

'এক্কেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা।'

'না, বেড়াছেড়া না। এই রাশিমালার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—রাশিমালার প্রতিটি সংখ্যা হল আগের দু'টি সংখ্যার যোগফল। যেমন ধর, এই রাশিমালার চতুর্থ সংখ্যা হল পাঁচ। পাঁচ হল ২য় এবং ৩য় সংখ্যার যোগফল। বড়ই রহস্যময় রাশিমালা।'

'আমি তো স্যার কোনোই রহস্য দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি তো অঙ্ক নিয়ে চর্চা কর না, তাই এই রাশিমালার রহস্য ধরতে পারছ না। এই রাশিমালার ১১ নম্বর সংখ্যা হল ৮৯। রাশিমালার প্রথম সংখ্যা এককে যদি তুমি ৮৯ দিয়ে ভাগ দাও তাহলে আবার এই রাশিমালা দিয়ে আসে। যেমন...

$\frac{১}{৮৯}$ = .০১১২৩৫৮১৩২১...'

বদরুল চোখ বড় বড় করে তাকাল। কিছু না বুঝেই চোখ বড় করল। পাগলা ধরনের লোক আগ্রহ নিয়ে একটা কথা বলছে—সেই সব কথা বিস্মিত হয়ে না শুনলে ভালো দেখায় না। এই কারণেই বিস্মিত হওয়া।

মনসুর সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, প্রকৃতিতে ফিবোনাক্কি সিরিজের খুব প্রয়োগ দেখা যায়। সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ির বিন্যাস এই রাশিমালা অনুসারে হয়। শামুকের যে স্পাইরেল তাও এই রাশিমালা অনুসারে হয়। সমুদ্রে এক ধরনের লাল কাঁকড়া থাকে। সেই কাঁকড়া যে সব নকশা বালিতে তৈরি করে তার মধ্যে থাকে ফিবোনাক্কি রাশিমালা...'

'বলেন কি ?'

'শীতের সময় সাগর পাড়ি দিয়ে অতিথি পাখিরা যে আসে, ওরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে। ঝাঁকে পাখির সংখ্যা ফিবোনাক্কি রাশিমালায় যে সব সংখ্যা আছে তার বাইরে কখনো হয় না। যেমন ধর, একটা ঝাঁকে ২১ টা পাখি থাকতে পারে, কিন্তু কখনো ২২ বা ২৩টা পাখি থাকবে না। কারণ ২২ বা ২৩ ফিবোনাক্কি রাশিমালায় নেই। ২১ আছে। আজ উঠি বদরুল ?'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার। আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শুনে মনটা বড় ভালো হয়েছে।'

'তুমি তো মনে হয় কিছু বুঝতে পারনি।'

'স্যার বুঝেছি। আপনি জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনার মতো একজন শিক্ষক পেলে মেট্রিকে অঙ্কে লেটার থাকত। স্যার, ছাতাটা নিয়ে যান। বৃষ্টি নামলো বলে। আচ্ছা স্যার, বৃষ্টির ফোঁটাও কি ফিবোনাক্কি রাশিমালার মতো পড়ে?'

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হল, ছেলেটা তাঁর সাথে রসিকতা করার চেষ্টা করছে।

রাস্তায় নামতেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তিনি ডাক্তার বজলুর রহমানের ফার্মেসিতে উঠলেন। ফার্মেসি অন্ধকার। কাটআউট জ্বলে গেছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে বজলুর রহমান সাহেব জমিয়ে গল্প করছেন। কয়েকজন আগ্রহী শ্রোতা তাঁকে ঘিরে আছে। টেবিলে মরিচ দিয়ে মাখা মুড়ি। মরিচ এমন ঢেসে দেয়া হয়েছে যে ঘরে পা দিতেই মরিচের গন্ধ নাকে এল।

মনসুর সাহেবকে দেখেই বজলুর রহমান বললেন, স্যার আসুন, মুড়ি খান। হেডস্যার বলেছেন আপনার চোখের সমস্যার কথা। বাতি নেই, চোখ দেখতে পারব না। কাম্পাউন্ডার ইলেকট্রিসিয়ান আনতে গেছে। বাতি আসুক, তারপর চোখ দেখব।

আড্ডার একজন বলল, গল্পটা শেষ করুন।

ভূতের গল্প হচ্ছিল। গল্পে বাধা পড়ায় সবাই খানিকটা বিরক্ত। মনসুর সাহেব এক কোণায় চেয়ারে গুটিশুটি হয়ে বসলেন। বজলুর রহমান ভূতের গল্প আবার শুরু করলেন। ছেলেমানুষি সব ভূতের গল্প শুনতে ইচ্ছা করে না। মনসুর সাহেব বাধ্য হয়ে শুনছেন।

'ঘটনাটা বরিশালের।'

বরিশালের ঠিক না—পিরোজপুর সাবডিভিশনের গোয়ারেখা গ্রামে। আমার নিজের দেখা। অন্যের কাছে শোনা গল্প হলে আপনাদের বলতাম না। তখন ঢাকা মেডিক্যালে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আমার ছোটমামা বিয়ে করেছেন গোয়ারেখা গ্রামে। আমাকে একবার পাঠালেন মামিকে পৌঁছে দিয়ে আসতে। আমি ভেবেছি যাব—মামিকে পৌঁছে দিয়ে পরদিন চলে আসব। মেডিক্যাল কলেজ খোলা। ইচ্ছা করলেও থাকার উপায় নেই। পৌঁছার পর এমন বিপদে পড়লাম ! শুরু হল লঞ্চ স্ট্রাইক। ঐসব অঞ্চলের কায়দাকানুনই অন্যরকম। একটা কিছু শুরু হলে আর শেষ হয় না। দশদিন ধরে চলল স্ট্রাইক। আমি তিক্ত-বিরক্ত। যাব কীভাবে? যোগাযোগের একটাই ব্যবস্থা—লঞ্চ বা স্টিমার। ইচ্ছা করছে সাঁতরে রওনা দিয়ে দেই। এই সময়ের ঘটনা। গোয়ারেখা গ্রামের জঙ্গলে একটা ডেডবডি পাওয়া গেল। কেউ মেরে ফেলে রেখে গেছে। টাটকা

ডেডবডি। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে তখনো রক্ত পড়ছে। এক গরুর রাখাল জঙ্গলে গিয়েছিল গরুর খোঁজে—সে-ই ডেডবডি প্রথম দেখল। গ্রামের সমস্ত লোক ভেঙে পড়ল।

অপরিচিত মানুষের ডেডবডি। আগে কেউ কখনো দেখেনি। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। পরনে নীল লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জিনিস। মাদ্রাসার কম বয়েসী তালেবুল এলেমদের যেমন অল্প কয়েক গোছা দাড়ি থাকে, সেরকম দাড়ি।

পুলিশে খবর দেবে সেই উপায় নেই। স্বরূপকাঠি থানা সতেরো মাইল দূরে। গ্রামের লোকজন পরামর্শ করে জানাজা পড়ে গোর কবর দিয়ে ফেলল। সকাল বেলা কবর দিয়েছে, সন্ধ্যাবেলা পুলিশ এসে উপস্থিত। ওদের নিজেদের স্পিড বোট আছে। ফট ফট করে স্বরূপকাঠি থানার সেকেন্ড অফিসার চারজন কন্সটেবল নিয়ে হাজির। এসেই বিরাট হম্বিতম্বি। কেন পুলিশে খবর না দিয়ে ডেডবডি কবর দেয়া হল ? এর মধ্যে রহস্য আছে। তিনি কাউকে ছাড়বেন না। প্রয়োজনে গ্রামসুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবেন।

পয়সা খাওয়ার মতলব আর কি ? গ্রাম অঞ্চলে খুনখারাবি হওয়া মানে পুলিশের জন্যে ঈদ উৎসব। আসামি-ফরিয়াদি দুই তরফ থেকেই স্রোতের মতো টাকা আসতে থাকে।

গ্রামের মুরুব্বিরা চাঁদা তুলে হাজার খানিক টাকা সেকেন্ড অফিসার সাহেবকে দিয়ে আপাতত ঠাণ্ডা করল।

ডাব-টাব কেটে আনল। সেকেন্ড অফিসার সাহেব বললেন—গোর খোদাই করে ডেডবডি তোল। আমি দেখব। সবাই বলল সন্ধ্যাবেলা এই কাজটা করা ঠিক হবে না।

ভদ্রলোক হুংকার দিয়ে বললেন, পুলিশের কাছে আবার সকাল-সন্ধ্যা কি ?

কবর খোঁড়া শুরু হল। গ্রামের সব লোক ভেঙে পড়ল। আমিও কৌতূহলী হয়ে গেলাম। দু'টা হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয়েছে। অনেকেই এসেছে হ্যারিকেন হাতে।

কবর খুঁড়ে সবাই হতভম্ব। কারণ ডেডবডির গায়ে কাফনের কাপড়টা নেই। ডেডবডি তার কাফনের কাপড় নিজেই খেয়ে ফেলেছে। সবটা খেতে পারেনি—খানিকটা কাপড় মুখ থেকে বের হয়ে আছে...

আড্ডায় অস্ফুট গুঞ্জন উঠল।

দু'জন একসঙ্গে বলল, তারপর তারপর ?

বজলুর রহমান সিগারেট ধরাতে ধারতে বললেন—পরের ব্যাপার আরো ভয়ংকর। দাঁড়ান বলছি, চা-টা খেয়ে নেই। কথা বলতে বলতে টায়ার্ড হয়ে গেছি।

মনসুর সাহেবের অসহ্য লাগছে। এই গল্পের বাকি অংশ শোনার তাঁর আর ধৈর্য নেই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন—বজলুর রহমান সাহেব ! আমি আজ উঠি। আরেকদিন আসব।

'আরে বসুন বসুন। চোখটা দেখে দেই।'

'বাতি নেই, দেখবেন কি ?'

'গল্পের শেষটা শুনে যান। শেষটা ভয়ংকর।'

'ইচ্ছা করছে না।'

মনসুর সাহেব ঘরের বাইরে পা দিলেন। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। তিনি দ্রুত হাঁটছেন। তাঁর মন বলছে কী একটা জিনিস যেন বাকি আছে। একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে। তিনি সেই ভুল ধরতে পারছেন না। মনের অস্বস্তি দূর হচ্ছে না। ছোটবাজার ছাড়িয়ে যখন কাঁচা পথে উঠে এলেন তখনি নিজের অস্বস্তির কারণ ধরতে পারলেন। ছাতা ফেলে এসেছেন। এখন ফিরে গিয়ে ছাতা আনতে যাবার অর্থ হয় না।

বৃষ্টি ঝেঁপে আসছে। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি ভিজে সার হয়েছেন। কাগজগুলি না ভিজলেই হল—কাগজগুলির জন্যেই তাঁর দুশ্চিন্তা। চিনি আর লেবু কেনা হয়নি। আজ রাতে লেবুর সরবত খাওয়া যাবে না। তার চেয়েও বড় সমস্যা—ভাত রাঁধতে হবে। ডিম নিশ্চয়ই আছে। ভাত আর ডিমভাজি। রান্না তেমন জটিল নয়—চুলা ধরানোটাই জটিল।

৩

এঁটেল মাটির রাস্তা। বৃষ্টি পড়তেই কাদা হয়ে গেছে। জুতা কাদায় আটকে যাচ্ছে। বাতাস দিতে শুরু করেছে। মনসুর সাহেব ঠিক করলেন ছোটবাজারে ফিরে যাবেন। ঝড়-বৃষ্টির ভেতর এতটা পথ যাওয়া বড় ধরনের বোকামি হবে। শিলাবৃষ্টি শুরু হলে মাথা বাঁচানোর উপায় নেই। বৃষ্টির ফোঁটা হিমশীতল। এর মানে হল অনেক উঁচুতে বৃষ্টি তৈরি হচ্ছে যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। চশমার কাঁচে পানি জমছে। কিছু দেখাও যাচ্ছে না।

ছোটবাজারে ফিরে যাবার ব্যাপারে পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নেবার পরেও মনসুর সাহেব এগুচ্ছেন তাঁর বাসার দিকে। এবং পা বেশ দ্রুত ফেলছেন। ঘোর অন্ধকার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলে পথ চলতে অসুবিধা। বিদ্যুৎচমকে কি

ফিবোনাক্কি রাশিমালা কাজ করে ? প্রথম একবার, তারপর আবার একবার, তারপর পরপর তিনবার।

তিনি মগরা নদীর বাঁধের উপর উঠে এলেন। এই রাস্তাটা মোটামুটি ভালো। কাদা নেই। বাঁধের নিচে নৌকা বাঁধা থাকে। আজ কোনো নৌকাও নেই। বাঁধের উপর উঠে ঝড়ের ঝাপ্টা অনুভব করা যাচ্ছে। তিনি কুঁজো হয়ে হাঁটছেন এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁর মনে হচ্ছে এই বুঝি ধাক্কা দিয়ে বাতাস তাকে নদীতে ফেলে দিল।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। খুব কাজেই পড়ল। এত কাছে যে বিদ্যুতের নীল শিখার পাশে পাশে তিনি কমলা শিখাও দেখতে পেলেন। এটা একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ঝড়ের মধ্যে বের না হলে তিন হাত সামনে বজ্রপাত দেখতে পেতেন না। ঘটনাটা বিপজ্জনক তো বটেই। বজ্র উঁচু জায়গায় আঘাত করে। বাঁধে কোনো গাছাপালা নেই। উঁচু জায়গা বলতে তিনি। বজ্রটার উচিত ছিল তাঁর উপর পড়া। পড়ল না কেন ? প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলে। সে কাউকে করুণা করে না। তাঁকে এই করুণা করার মানে কি ?

প্রকৃতির এই আচরণে মনসুর সাহেব খানিকটা বিরক্তই হলেন আর তখন দ্বিতীয় বজ্রপাত হল—তিনি ছিটকে বাঁধের নিচে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান হল তখনো অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। কাদায়-পানিতে তিনি মাখামাখি। শীতে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁর হাত-পা শক্ত। তিনি কি মারা গেছেন না জীবিত আছেন—এই বোধ স্পষ্ট হচ্ছে না। মারা যাবার সম্ভাবনাই বেশি। শরীরের ভেতর দিয়ে কয়েক লক্ষ ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। শরীর ভস্ম হয়ে যাবার কথা। তিনি মারা গেছেন এটাও মনে হচ্ছে না। মৃত মানুষের শীত লাগার কথা না। কিন্তু তাঁর শীত লাগছে। ঠকঠক করে শরীর কাঁপছে। মুখের উপর কেউ একজন মনে হয় ঝুঁকে আছে। মানুষ না অন্য কিছু অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বললেন—এখানে কে ?

প্রশ্নের জবাব পাবেন মনসুর সাহেব সেই আশা করেননি। কিন্তু জবাব পেলেন। মিষ্টি এবং সহজ গলায় কেউ একজন বলল—

— 'আপনি আমার হাত ধরুন। হাত ধরে উঠে দাঁড়ান।'

'কে কথা বলছে ?'

'আমি।'

'আমিটা কে ?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমার পরিচয় দেব। তার আগে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'আমি কি বেঁচে আছি-না-কি ?'

'অবশ্যই বেঁচে আছেন। বাঁধের উপর থেকে নিচে পড়ে ব্যথা পেয়েছেন ?'

বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের আলোয় মনসুর সাহেব মানুষটাকে দেখলেন। একুশ-বাইশ বছরের একজন যুবক। শার্ট-প্যান্ট পরে আছে। প্যান্ট খানিকটা গুটানো। কাপড়-চোপড় ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

যুবকই তাঁকে টেনে তুলল।

'স্যার, আপনি কি হাঁটতে পারবেন ?'

মনসুর সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হাঁটতে না পারলে তুমি কি করবে ? আমাকে কোলে করে নিয়ে যাবে ?'

যুবক হেসে ফেলল। মনসুর সাহেব বললেন—'এখন ক'টা বাজে জান ?'

'জ্বি না। আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই। স্যার চলুন, আমরা আস্তে আস্তে হাঁটি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার কোনো অর্থ নেই। আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে পা ফেলুন।'

'হাত ধরতে হবে না। আমি হাঁটতে পারব। তোমার নাম কি ?'

যুবক জবাব দিল না। তুমি করে বলায় সে কি রাগ করল না-কি ? নেত্রকোনা অঞ্চলের মানুষ তুমি করে বললে ফট করে রেগে যায়। দীর্ঘদিন মাস্টারির কুফল হল—মুখে তুমি আগে চলে আসে। মৃত্যুর সময় আজরাইলকে ঘরে ঢুকতে দেখলে পুরানো স্কুল মাস্টাররা বলে বসবে—ও তুমি ? জান কবজ করতে এসেছ ? আজরাইল তাতে রাগ করলেও এই যুবকের রাগ করার কিছু নেই। তিনি বৃদ্ধ একজন মানুষ। সামনের মাসেই তাঁর রিটায়ার করার কথা। কুড়ি-একুশ বছরের একজন যুবককে তুমি বলার অধিকার তো তাঁর থাকাই উচিত।

'তুমি বলায় রাগ করেছ না-কি ?'

'জ্বি না স্যার, রাগ করিনি।'

'রাগ করনি, তাহলে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন ?'

'কোন্ প্রশ্ন ?'

'একটু আগে যে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কি ?'

'আমার নাম নেই।'

'নাম নেই মানে ? নাম থাকবে না কেন ?'

'আপনি একটা নাম দিয়ে দিন।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। নাম নেই বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ ? তোমার বাবা-মা তোমার কোনো নাম দেননি ?'

'জ্বি না।'

বৃষ্টি কমে এসেছে। বাতাস এখনো আছে। এত ঠাণ্ডা বাতাস সারাজীবনে মনসুর সাহেবের গায়ে লাগেনি। পৌষ মাসের বাতাসও এত ঠাণ্ডা থাকে না—এটা হল চৈত্র মাস।

'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার বাবা-মা তোমার কোনো নাম রাখেননি?'

'আমার বাবা-মা নেই।'

'তাঁরা অল্প বয়সে মারা গেছেন?'

'স্যার, ব্যাপারটা ঠিক তাও না। বাবা-মা'র যে ধারণা পৃথিবীর মানুষদের আছে—সেই ধারণা আমাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। আমি এই পৃথিবীর কেউ না।'

'তুমি এই পৃথিবীর কেউ না?'

'জ্বি না।'

মনসুর মোটেই চমকালেন না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়—বজ্রপাতের মানসিক চাপে তাঁর মাথা কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এক যুবক ছেলে তাকে বলবে সে এই পৃথিবীর কেউ না আর তিনি তা বিশ্বাস করে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠবেন, তা হয় না।

'তুমি আমাকে পেলে কোথায়?'

'আমি আপনার খোঁজেই এসেছি।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কর কি?'

'স্যার, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'জটিল কথা তো কিছু বলছি না। জানতে চাচ্ছি তুমি কি কর। চাকরি-বাকরি কর না এখনো ছাত্র?'

'আমি একজন ছাত্র।'

'কোন্ ক্লাসের ছাত্র? কলেজ শেষ করেছ?'

'স্যার, আপনাদের যেমন পড়াশোনার নানান স্তর আছে—আমার সে রকম নয়...ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে। চলুন আগে বাসায় যাই।'

যুবকটি মনসুর সাহেবের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনসুর সাহেব কিছুটা বিভ্রান্তি বোধ করছেন। মাথা ঝিম ঝিম করছে। বাঁধের উপর থেকে নিচে পড়ে যাবার সময় মাথায় ব্যথা পেয়েছেন। যা ঘটছে তা কি মাথায় ব্যথা পাওয়ার জন্যেই হচ্ছে? ফিবোনাক্কি রাশিমালার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্য বোঝা যাবে চিন্তাশক্তি ঠিক আছে না তাতে কোনো সমস্যা আছে।

ফিবোনাক্কি রাশিমালার প্রথম বৈশিষ্ট্য কি ? প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই রাশিমালার পরপর যে কোনো চারটি সংখ্যা নেয়া হলে প্রথম এবং চতুর্থ সংখ্যার যোগফল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফলের চেয়ে এক কম। যেমন—

১,১,২,৩

প্রথম এবং চতুর্থ সংখ্যার যোগাফল ৪।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল ৩।

না মাথাটা তো ঠিকই আছে। মাথায় তেমন সমস্যা হয়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে চোখও সেরে গেছে। চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়েছে। যুবকটি হঠাৎ বলে বসল,

'ফিবোনাক্কি রাশিমালার বড় বৈশিষ্ট্য হল আপনি যে নিয়মের কথা বলছেন সে নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমগুলিই হল রাশিমালার বৈশিষ্ট্য...'

'তুমি ফিবোনাক্কি রাশিমালা জান ?'

'হ্যাঁ জানি, তবে এই রাশিমালা নিয়ে আমি তেমন উৎসাহী নই। আমার উৎসাহ অন্য জায়গায়।'

'কোথায় ?'

'আপনি নিজে যে রাশিমালা তৈরি করেছেন সেই রাশিমালায়...'

'আমি তো কোনো রাশিমালা তৈরি করিনি...'

'করতে যাচ্ছেন। আপনার রাশিমালার প্রথম সংখ্যাটি শূন্য। দ্বিতীয়টি শূন্য শূন্য...'

মনসুর সাহেব রাগী গলায় বললেন—'আমি কোনো রাশিমালা তৈরি করিনি। আমি করছি ফিবোনাক্কি নিয়ে...'

'ফিবোনাক্কিকে আপনি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছেন। আপনার মূল চিন্তা নতুন রাশিমালা এবং এই রাশিমালার নিয়ম-কানুন...'

মনসুর সাহেব অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন—'তুমি নিতান্তই মূর্খের মতো কথা বলছ। প্রথমত শূন্য কোনো রাশিমালার সংখ্যা হতে পারে না। শূন্য হচ্ছে একটা প্রতীক, যে প্রতীক আমরা ব্যবহার করি কোনো সংখ্যার অবস্থান নির্দেশের জন্যে। যেমন ৮ একটি সংখ্যা। এর অবস্থান এককের ঘরে। এই আটকে আমরা দশকের ঘরে নিয়ে যেতে চাই। আটের ডানে একটি শূন্য বসাই। আট হয়ে গেল আশি। তার অবস্থানের পরিবর্তন হল।'

'আপনার কথা মেনে নিচ্ছি—তারপরেও শুনুন, শূন্য যদি শুধু কোনো প্রতীকই হয় তাহলে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে আপনি গুণফল শূন্য লিখতে পারেন না। আপনি লিখতে পারেন না—

৩ × ০ = ০ বা

৪ × ০ = ০

একই সঙ্গে আপনি বলছেন শূন্য একটি প্রতীক, আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় কাজে লাগাচ্ছেন, তা কি করে হয় ?'

মনসুর সাহেব চুপ করে গেলেন, অকাট্য যুক্তি। এবং ভালো যুক্তি। যুবকটি শব্দ করে হাসল।

মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমার যুক্তি মেনে নিলাম। ধরলাম, শূন্য একটি সংখ্যা হতে পারে। কিন্তু শূন্য/শূন্য তো সংখ্যা হতে পারে না।'

'কেন পারবে না ? হতে পারে। এই পৃথিবীর একজন মহান আঙ্কিক শূন্য/শূন্য অনেকবার ব্যবহার করেছেন। একে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন।'

'কার কথা বলছ ?'

'স্যার আইজাক নিউটন। তিনি ক্যালকুলাস বের করেন।'

'সেখানে শূন্য/শূন্য কোথায় ?'

'আছে। $\frac{dy}{dx}$ তো শূন্য / শূন্য ছাড়া আর কিছুই না। dy হচ্ছে y-এর অতিক্ষুদ্র অংশ। প্রায় শূন্য। তেমনি dy হল x-এর অতি ক্ষুদ্র অংশ, প্রায় শূন্য। অর্থাৎ তিনি কাজ করেছেন প্রায় শূন্য/প্রায় শূন্য নিয়ে। আপনি কাজ করছেন শূন্য/শূন্য নিয়ে। এই একটি কারণেই আমার আপনার কাছে আসা।'

'তুমি কে ?'

'আমার কোনো নাম নেই এবং আমি আমার অবস্থান আপনাকে এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাও করতে পারছি না...'

'কোত্থেকে এসেছ ?'

'আমি এসেছি শূন্য থেকে।'

'শূন্য থেকে ?'

'জ্বি স্যার, শূন্য থেকে। শূন্য সংক্রান্ত রাশিমালার প্রতি এ কারণেই আমার এত আগ্রহ।'

'তোমার নাম কি ?'

'আপনি বারবার নামের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। যে এসেছে শূন্য থেকে তার নাম থাকতে পারে না। তারপরেও কথাবার্তা চালানোর সুবিধার জন্যে আপনার যদি একান্তই নামের প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে একটা নাম দিতে পারেন। আপনার পছন্দসই কোনো নাম...আপনি আমাকে ফিবোনাক্কি ডাকতে পারেন।'

'ফিবোনাক্কি ?'

'জ্বি। তবে যদি এই নামটা কঠিন মনে হয় তাহলে—আরো সহজ কোনো নামে ডাকতে পারেন—স্যার, নিউটন নামটা কি আপনার কাছে সহজ মনে হয় ?'

'নিউটন ?'

'হ্যাঁ নিউটন। বিদেশী নাম যদিও তারপরেও নামটার এক ধরনের সহজ ভাব আছে। আপনি দেশী নামও রাখতে পারেন—রহিম, করিম, যদু, মধু...স্যার, আমরা এসে পড়েছি।'

মনসুর সাহেব পাঞ্জাবির পকেটে গেটের চাবির জন্য হাত ঢুকালেন। চাবি নেই। বাঁধ থেকে যখন তিনি ছিটকে নিচে পড়ে গেছেন। তখন চাবিও নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। গুদামঘরের গেটে যে বিশাল তালা ঝুলছে সেই তালা খোলা তাঁর কর্ম নয়।

'স্যার কি চাবি খুঁজছেন ?'

'হুঁ।'

'এই নিন চাবি।'

মনসুর সাহেব যন্ত্রের মতো চাবি হাতে নিলেন। গেটের তালা খুলতে খুলতে বললেন, 'চাবি কোথায় পেলে ?'

'আপনি যখন বাঁধের নিচে পড়ে গেলেন তখন পকেটের চাবিও ছিটকে পড়ে গেল। কাজে লাগবে বলে চাবি তুলে এনেছি।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'এক বোতল প্যালিকেন কালি ছিল, তা আনতে পারিনি। কালির বোতলটা ভেঙে গেছে।'

'ও।'

'আপনার সঙ্গে কাগজের যে প্যাকেট ছিল তাও আনতে পারিনি। ইচ্ছা করলে আনতে পারতাম কিন্তু কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে কাগজের যে অবস্থা—আনাটা অর্থহীন হত।'

'ও।'

গেটের তালা খোলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু গেট সরানো যাচ্ছে না। জাম হয়ে আছে। ছেলেটি তাঁকে সাহায্য করল। দু'জনে ঠেলে ঠেলে গেট সরালেন। ভালো পরিশ্রম হয়েছে। তিনি হাঁপাচ্ছেন। ছেলেটাও হাঁপাচ্ছে।

'স্যার চলুন, ঘরে যাই। বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাবেন। আপনার ঘরে কি বাড়তি কাপড় আছে ? আমার কাপড় বদলাতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তুমি মন দিয়ে আমার কথা শোন।'

'আপনি বরং আমাকে একটা নাম দিয়ে দিন। নাম দিলে আপনার সুবিধা হবে। ফিবোনাক্কি ডাকেন। এই নাম আমার পছন্দ।'

'শোন ফিবোনাক্কি, তোমাকে আমি একটা গল্প বলব। গল্পটা তুমি খুব মন দিয়ে শুনবে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে গল্প শোনার প্রয়োজন কি ? চলুন যাই। শুকনো কাপড় পরি। চা খেতে খেতে আপনার গল্প শুনি।'

'না, তুমি এখানে দাঁড়িয়েই গল্প শুনবে।'

'আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ইতিমধ্যে লেগে গেছে বলে আমার ধারণা।'

'ঠাণ্ডা লাগুক আর না লাগুক—এখানে দাঁড়িয়ে তুমি গল্প শুনবে।'

'স্যার বলুন।'

'আমার শৈশবের একটা ঘটনা। আমার দূর সম্পর্কের এক খালাতো ভাই ছিল। রমিজ নাম। বার-তের বছর বয়স। এক বর্ষাকালে সে জাম পাড়ার জন্যে জাম গাছে উঠল। বর্ষাকালে জাম গাছ থাকে পিছল...'

'স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনি নিজেও কিন্তু আপনার দারোয়ান হরমুজ মিয়ার মতো বেশি কথা বলছেন—মূল ব্যাপারটা বলতে দেরি করছেন।'

'রমিজ গাছে উঠল...পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেল। ঘণ্টাখানিক অজ্ঞান হয়ে রইল—মাথায় পানি-টানি ঢেলে তার জ্ঞান ফেরানো হল। জ্ঞান আসার পরই সে তার মা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। কথা বলে, হাসে। কিন্তু তার মা বেঁচে নেই। অনেক আগেই মারা গেছেন। অথচ সে এরকম ভাব করছে যেন মা বেঁচেই আছেন। তার সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার ওষুধপত্র দিলেন। সে সেরে গেল।'

'রমিজ সাহেব কি এখনো জীবিত আছেন ?'

'হ্যাঁ আছে। ঢাকা কাস্টমস-এ কাজ করে। প্রচুর পয়সা করেছে মালিবাগে তার দোতলা বাড়ি। বাড়ির নাম কেয়া ভবন। কেয়া হল তার প্রথম স্ত্রীর নাম। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আবার বিয়ে করেছে। সেই বৌয়ের নাম মিতা। এখন শুনছি বাড়ির নাম পালটে মিতা ভবন...'

'স্যার, আপনি যে বেশি কথা বলছেন সেটা বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি।'

'মূল গল্পে কি ফিরে যাবেন, না যা বলার বলে ফেলেছেন ?'

'না, আসল ব্যাপারটা বলা হয়নি—রমিজ মাথায় ব্যথা পেয়ে তার মৃতা মা'কে দেখতে পেয়েছিল। সেটা ছিল তার মনের কল্পনা। ব্যাপারটা ঘটেছে মাথায় ব্যথা পাওয়ার কারণে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে—আমি মাথায়

ব্যথা পেয়েছি। ব্যথা পাওয়ার কারণে তোমাকে দেখছি। তুমি হচ্ছ আমার মনের কল্পনা। এর বেশি কিছু না।'

যুবক হাসল। মনসুর সাহেব তাঁর হাসি দেখলেন না—তবে তার হাসির শব্দ শুনলেন।

'শোন যুবক।'

'যুবক না—বলুন, শোন ফিবোনাক্কি।'

'শোন ফিবোনাক্কি—তুমি আমার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। তুমি এই মুহূর্তে বিদেয় হবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। শুধু...'

'শুধু কি ?'

'ঠাণ্ডায় কাহিল হয়েছি। আপনার ঘরে বসে এক কাপ চা খেতে পারলে...'

'বিদেয় হও বলছি।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। গেটটা তো বন্ধ করা দরকার। আপনি একা পারবেন না। আপনি ভেতর থেকে ঠেলা দিন। আমি বাইরে থেকে টানি।'

মনসুর সাহেব আপত্তি করলেন না। একা তাঁর পক্ষে গেট সরানো আসলেই কষ্টকর।

গেট বন্ধ করে মনসুর সাহেব ভেতর থেকে তালা দিলেন। ছেলেটি গেটের বাইরে থেকে বলল, 'স্যার, আমি দেয়ালের বাইরেই থাকব। যদি প্রয়োজন মনে করেন।'

মনসুর সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন।

৪

সমস্ত শরীর ভিজে জবজব করছে। কাদায় মাখামাখি হয়েছেন। গা ধোয়া দরকার। কাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরা দরকার। তারচেয়েও বেশি যা দরকার তা হচ্ছে গরম এক কাপ চা। আগুন-গরম চা। নেত্রকোনার লোকজন বলে আগুইন্যা চা। যে চা জিভ-মুখ পুড়িয়ে পাকস্থলিতে নেমে যায়। মনসুর সাহেব ক্ষুধার্তও বোধ করছেন। তারচেয়েও হাজারগুণে যা বোধ করছেন তার নাম ক্লান্তি। মনে হচ্ছে শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষ ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো এরমধ্যে ঘুমিয়েও পড়েছে।

ভেজা কাঠের চুলা এই মুহূর্তে ধরানো সম্ভব নয়। চোঙা দিয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে হবে। তাঁর ফুসফুসে সেই জোর নেই। ছেলেটাকে নিয়ে এলে হত। যুবক ছেলে জোরালো ফুসফুস। আগুন জ্বালালে শরীর আরাম পেত। কোনোমতে চারটা ভাত ফুটাতে পারলে—ভাতের উপর ঘি ছড়িয়ে দিয়ে খেয়ে ফেলা যেত। আজিজ খাঁ হরলিক্সের কৌটা ভর্তি এককৌটা ঘি দিয়ে গেছে। গরম ভাত-ঘি, সঙ্গে একটা ভাজা শুকনা মরিচ।

ক্লান্তি লাগছে, ক্লান্তি। তিনি শুয়ে পড়বেন। আরাম করে ঘুমুবেন। তাঁর মতে আজকের রাতের মতো আরামের ঘুম তাঁর আর কোনো দিনও হবে না। এই সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না। কাপড় বদলানোর দরকার নেই। ভেজা কাপড়েই শুয়ে পড়বেন।

মনসুর সাহেব ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানার দিকে এগুচ্ছেন। আর তখন শুনলেন ফিবোনাক্কির গলা—স্যার ! স্যার !

দেয়ালের বাইরে থেকেই ডাকছে। তবে ডাকছে তার ঘরের জানালার ঠিক নিচে থেকে। কষ্ট করে উঁকি দিলে দেখতে পাওয়ার কথা। মনসুর সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছায় জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন—আবছা আবছা একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

'কি চাও ?'

'স্যার, আপনি ভেজা কাপড়ে বিছানায় যাবেন না।'

'আমি কি করি না করি সেটা সম্পূর্ণই আমার ব্যাপার।'

'ভেজা কাপড়ে ঘুমুতে গেলেই ভয়ংকর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নিওমোনিয়া তো হবেই। আপনার যে বয়স ! নিওমোনিয়ার ধকল সামলাতে পারবেন না।'

'তাতে তোমার কি সমস্যা ?'

'আমার খুব সমস্যা। আপনি যে জটিল অঙ্কটি শুরু করেছেন তার শেষটা আমাদের দরকার। আপনি যে কাজটি করতে পারছেন—আমরা তা পারছি না। আপনি কিছু ছোট ছোট ভুল করছেন। সেই ভুলগুলি ধরিয়ে দিলে আপনার জন্যে কাজ সহজ হয়...'

'আমি কি ভুল করছি ?'

'স্যার, সবই বলব। আমাকে ভেতরে আসতে দিলে ভালো হয়। গেট খুলতে হবে না। আমি দেয়াল বেয়ে উঠে আসব।'

'তোমাকে উঠে আসতে হবে না—তুমি যেখানে আছ সেখানে থাক।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আমি কি ভুল করছি বল।'

'স্যার বলব, তার আগে আপনি কাপড়গুলি বদলে শুকনো কাপড় পরে আসুন।'

'আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ভুল কি করেছি বল...'

'ভুল ঠিক না—একটা ব্যাপার আপনাদের চোখে পড়েনি।'

'বল কি সেটা।'

'আপনি শুকনো কাপড় না পরলে আমি বলব না।'

'মনসুর সাহেবের কৌতূহলই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। তিনি কাপড় ছাড়লেন। শুকনো কাপড় পরলেন। গায়ের কাদা এখনো আছে। থাকুক। তিনি জানালার কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন—'ফিবোনাক্কি ! ফিবোনাক্কি !'

'জ্বি স্যার।'

'কাপড় বদলেছি। আমার ভুলটা কি বল।'

'স্যার শূন্য এবং ১ এই দু'-এর ভেতরের মিল কি আপনি লক্ষ করেছেন ?'

'কি রকম মিল ?'

'১ × ১ = ১

আবার

১ × ১ × ১ = ১

একইভাবে ০ × ০ = ০

০ × ০ × ০ = ০

১-এর বর্গমূল বা কিউব রুট যেমন ১

তেমনি ০-এর বর্গমূল বা কিউব রুটও ১।'

মনসুর সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই সামান্য তথ্য আমার অজানা নয়।'

ফিবোনাক্কি বলল, 'অনেক সময় সামান্যের মধ্যে অসামান্য লুকানো থাকে। এই দুটি সংখ্যার ভেতর রহস্যময় মিল আছে।'

'মিল আছে তো বটেই। রহস্যময় বলছ কেন ?'

'জর(-১) কে নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন। এর আলাদা নাম দিয়েছেন—কাল্পনিক সংখ্যা ইমাজিনারি নাম্বার। কিন্তু জর(-০) নিয়ে আপনাদের মাথাব্যথা নেই।'

'মাথাব্যথার কারণ নেই বলেই মাথাব্যথা নেই।'

'স্যার, আপনি খুব ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। একটা চাদর-টাদর কিছু গায়ে দিয়ে ঘুমান।'

'তুমি বিদেয় হও।'

'আমি তো বিদেয় হয়েই আছি। গেটের বাইরে ঠাণ্ডায় হাঁটাহাঁটি করছি। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

'তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি হচ্ছ কল্পনা। আমার মনের কল্পনা। ঠিক বলিনি?'

'অবশ্যই ঠিক বলেছেন। আমি এসেছি শূন্য জগৎ থেকে। আমি তো শূন্য হবই। কল্পনাও শূন্য।'

'শাট আপ!'

'স্যার, ঘুমুতে যান। তবে আমাকে অনুমতি দিলে আমি ছোট্ট একটা কাজ করতে পারি। আমি দেয়াল বেয়ে উঠে এসে চারটা ভাত ফুটিয়ে দিতে পারি। দেয়াল বেয়ে উঠা আমার জন্যে কোনো সমস্যা নয়।'

'শাট আপ!'

'স্যার, আপনি এমন রাগারাগি করছেন কেন? রাগারাগি করা, গালাগালি করা এইসব তো আপনার মধ্যে কখনো ছিল না। স্যার, আপনার ঘুম দরকার। খুব ভালো ঘুম। আমি তো আপনার সঙ্গে কোনো অভদ্র ব্যবহার করছি না। অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করছি। কথায় কথায় স্যার বলছি। আপনার কাছ থেকে সামান্য ভদ্রতা কি আমার প্রাপ্য নয়?'

'ফিবোনাক্কি, কিছু মনে করো না।'

'আমি কিছুই মনে করছি না। আমি বাইরেই আছি। আপনি ডাকলেই আমি আসব। স্যার, শুয়ে পড়ুন। আমি যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

মনসুর সাহেব বিছানায় গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলেন। তাঁর ঘুম ভাঙল সকাল ন'টায়। ঘরে ঝলমলে রোদ। কাল রাতের কাণ্ডকারখানা মনে হয়ে তাঁর হাসি পেতে লাগল।

তাঁর ঠাণ্ডা লাগেনি। শরীর ভালোই আছে। প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। দশটায় স্কুল। চারটা খেয়ে স্কুলে যেতে হবে। তার আগে গোসল করতে হবে। কাদা শুকিয়ে শরীরে শক্ত হয়ে গেলে বসে আছে।

স্কুলে পা দিতেই হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—শরীর ঠিক আছে?

মনসুর সাহেব হাসলেন। হেডমাস্টার সাহেব বললেন—বজলুর সঙ্গে দেখা। সে আপনাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিল। আপনি না-কি ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

'জ্বি না।'

'চোখের সমস্যা দূর হয়েছে?'

'জ্বি।'

'গতকাল স্কুলে না আসায় খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। আপনি তো স্কুলে না আসার লোক না। ভেবেছিলাম, আজও যদি না আসেন তাহলে খোঁজ নিতে যাব।'

মনসুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আজ ক' তারিখ?

'আঠারো তারিখ।'

'আঠারো তারিখ? আজ কি মঙ্গলবার।'

'হ্যাঁ। তারিখ জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

মনসুর সাহেব ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসতে চেষ্টা করলেন। তিনি তারিখ জিজ্ঞেস করছেন সঙ্গত কারণেই। হেডমাস্টার সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি চব্বিশ ঘন্টা এক নাগাড়ে ঘুমিয়েছেন। মাঝখানের একটা দিনের কোনো হিসেব নেই।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'কি ব্যাপার, এমন করে তাকাচ্ছেন কেন?'

'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না।'

'শরীর ভালো না লাগে এসেছেন কেন? আপনারা সিনিয়ার লোক। দু'দিন পর রিটায়ার করবেন—বিশ্রাম তো আপনাদের প্রাপ্য।'

মনসুর সাহেব বিরক্ত বোধ করছেন। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ক্লাসে যাওয়া দরকার। যে ধরনের আলাপ শুরু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে না হেডমাস্টার সাহেব সহজে থামবেন। মনসুর সাহেব বললেন, 'ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেছে স্যার।'

'পড়ুক না। ঘন্টা তো পড়বেই। জীবনেরই ঘন্টা পড়ে গেছে আর ক্লাস! রবার্ট ব্রাউনিং-এর এই বিষয়ে একটা কবিতা আছে Ring Ring-ding ding...না, এটা বোধহয় ব্রাউনিং-এর না—অন্য কারো।'

'যদি অনুমতি দেন ক্লাসে যাই।'

'ক্লাসে যাবেন তার আবার অনুমতি কি? আপনার পাংচুয়ালিটির কথা আমি সর্বত্র বলি। সবাইকে বলি— এই লোকটাকে দেখ। দেখে শেখ। শিক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন! ক'টা পুরুষ পারে? চিরকুমার একজন মানুষ।'

'আমি চিরকুমার না। বিবাহ করেছিলাম। অল্পবয়সে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তারপর আর বিবাহ করিনি।'

'ঐ একই হল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করে না এমন লোক আমাকে দেখান তো। বুড়ো হাবড়াগুলি চক্ষুলজ্জায় বিয়ে করতে পারে না—এ ছাড়া সবাই করে।

আমার এক শ্যালক আছে। ক্যানসারে তার স্ত্রী মারা গেল। শোকে সে উন্মাদ রাতে ঘুমায় না। হা হা করে কাঁদে। মনে হয় হায়না ডাকছে। কী গভীর প্রেম ! দশ দিনের মাথায় শুনি—সে বিয়ের জন্যে মেয়ে খোঁজাখুঁজি করছে। শালা বলে গালি দিতে ইচ্ছা করে। গালি কি দেব—সে আসলেই আমার শালা। আপন শালা।'

'আমার ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'যান যান, ক্লাসে যান। ভালো কথা—ঐদিন ব্ল্যাকবোর্ডে কি লিখেছিলেন ?'

'বুঝতে পারছি না। কীসের কথা বলছেন ?'

'ব্ল্যাকবোর্ডে দেখলাম কি সব হাবিজাবি লেখা-ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ—খাঁজকাটা খাঁজকাটা সার্কেল...ছেলেদের বললাম, এইসব কে লিখেছে ? ওরা বলল—আপনি।'

মনসুর সাহেব চুপ করে রইলেন। তিনি নিজেও কিছু বুঝতে পারছেন না। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'আচ্ছা যান, পরে এই নিয়ে কথা বলব। এটা এমন জরুরি কিছুও না। আপনার ব্লাডপ্রেসার নেই তো ?'

'জানি না।'

'ব্লাডপ্রেসার থাকলে মাথায় মাঝে মাঝে ইয়ে হয়। আপনি বজলুকে দিয়ে প্রেসারটা মাপাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'ওর প্রেসারের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি-না কে জানে। ঐদিন প্রেসার মাপতে নিয়েছি, সে প্রেসার-ট্রেসার মেপে বলল—আবার মাপতে হবে। রিডিং ভুল আসছে। আমি বললাম, কত আসছে ? সে বলল ২৫। এখন আপনিই বলুন ২৫ কি কোনো প্রেসার ? একটা মাঝারি সাইজের ইলিশ মাছের প্রেসারও পঁচিশের চেয়ে বেশি হয়।'

মনসুর সাহেব পনেরো মিনিট দেরি করে ক্লাসে ঢুকলেন। প্রথমেই তাকালেন বোর্ডের দিকে। তারিখ এবং বার বোর্ডের মাথায় লেখা আছে। তাঁর মনে ক্ষীণ সন্দেহ ছিল হয়তো হেডমাস্টার সাহেব তারিখ ভুল করছেন।

না, হেডমাস্টার সাহেব তারিখ ভুল করেন নি। তারিখ ঠিকই বলেছেন। মনসুর সাহেব রিপ ভ্যান উইংকেলের মতো পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমিয়েছেন।

মনসুর সাহেব বললেন, 'বাবারা, তোমরা কেমন আছ ?'

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মনসুর সাহেবের কাছ থেকে তারা এ জাতীয় কথা আগে শুনেনি।

'আজ ক্লাসে আসতে দেরি করে ফেললাম। আজ আমরা কি পড়ব ?'

কোনো ছাত্র জবাব দিচ্ছে না। মনসুর সাহেব রেজিস্ট্রার খাতা খুলে ডাকলেন—'রোল নাম্বার ওয়ান।'

ক্লাস ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াল।

তাকে প্রেজেন্ট মার্ক দিয়েই মনে হল—শূন্য কোনো প্রতীক না। শূন্য একটা সংখ্যা অথচ আমরা তাকে বাদ দিয়ে সংখ্যা শুরু করছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

মনসুর সাহেব বললেন, 'রোল নম্বর ওয়ান, তোমার নাম কি?'

'মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন।'

'শূন্য কাকে বলে সাব্বির হোসেন?'

সাব্বির ভীত মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে শূন্য শব্দটা এই প্রথম শুনল।

'শূন্য কাকে বলে তুমি জান না?'

'জ্বি না।'

'তোমরা কেউ জান?'

মনসুর সাহেব ছাত্রদের মুখের দিকে তাকালেন। কেউ শব্দ করছে না। মনে হচ্ছে কেউ নিশ্বাসও ফেলছে না।

'আশ্চর্য ব্যাপার, তোমরা জান না শূন্য কি?'

'শূন্য হল স্যার গোল্লা।'

মনসুর সাহেব বোর্ডে একটা চক্র আঁকলেন—সহজ গলায় বললেন, 'এই কি শূন্য?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা শোন, আমার হাতের এই ডাস্টারটার দিকে তাকাও। ডাস্টারটা যদি আমরা ভাঙতে থাকি তাহলে ভেঙে কি পাব?'

'অণু পাব।'

'হ্যাঁ, অণু পাব। অণুটা যখন ভাঙব তখন কি পাব?'

'পরমাণু?'

'পরমাণু ভাঙলে?'

'ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন।'

'এদের যদি ভাঙা যায় তাহলে কি পাব?'

'জানি না স্যার।'

'আমার ধারণা, ভাঙতে ভাঙতে এক সময় দেখব কিছুই নেই। এই জগৎ সংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গাছপালা, পর্বত-নদী সব তৈরি হয়েছে শূন্য দিয়ে—সব কিছুই শূন্যের উপর। শুরুটা হল শূন্যে। যার শুরু শূন্যে তার শেষ কোথায়?'

ছাত্ররা ভীত চোখে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মনসুর সাহেব বললেন—'তার শেষও শূন্যে। বিশ্বজগৎ হল আঙটির মতো। আঙটির যেখানে শুরু সেখানেই শেষ। তোমরা কি বুঝতে পারছ ?'

সব ছেলে এক সঙ্গে মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছে তারা সবাই ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে।

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে। ঘণ্টা পড়ার পরেও ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা বিশাল শূন্যের দিকে মনসুর সাহেব তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ডে তিনি অপরূপ কোনো চিত্র এঁকেছেন। চিত্রকলার সৌন্দর্য থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না।

৫

বদরুল হাসিমুখে বলল, 'কি ব্যাপার স্যার ?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'কাগজ নিতে এসেছি। পাঁচ দিস্তা দিন।'

'পরশুদিনই না কাগজ নিয়ে গেলেন।'

'নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে...'

বদরুল কাগজ বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'অঙ্কটার অবস্থা কি ? খুব টেনশানে আছি।'

মনসুর সাহেব কিছু বললেন না। উঠতে যাচ্ছেন বদরুল হাহাকার করে উঠল, 'চা আনতে পিচ্চিকে পাঠিয়েছি। একটু স্যার বসুন গল্পগুজব করি।'

'গল্পগুজব করতে আমার ভালো লাগে না বদরুল।'

'তাতো স্যার জানি। আপনিতো 'বাদাইম্যা' না কাজের লোক। দিন রাত অঙ্ক করাতো সহজ ব্যাপার না। অঙ্কটার নাম যে কি ? ফেক্কি ?'

'ফিবোনাক্কি !'

'নাম শুনলেই প্যালপিটিশন হয়। অঙ্কটা শেষ হলে দেশের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন হবে স্যার ?'

মনসুর সাহেবের মন খানিকটা বিষণ্ন হল। এই ছোকরা তাকে নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করছে। অতি বুদ্ধিমানরা নির্বোধদের নিয়ে যে জাতীয় রসিকতা করে সে জাতীয় রসিকতা। মনসুর সাহেব সহজভাবেই বদরুলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—'অঙ্কের সমাধানের সঙ্গে দেশের অবস্থার সরাসরি কোনো যোগ নেই।'

'আপনি স্যার কথাটা বিনয় করে বলেছেন। আমরা ধারণা ফাটাফাটি হয়ে যাবে। ইউরোপ আমেরিকায় আপনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।'

চা নিয়ে এসেছে, মনসুর সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। বদরুল একটু ঝুঁকে এসে গলা নিচু করে বলল, 'অপরাধ যদি না নেন একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'জিজ্ঞেস কর।'

'বাংলাদেশে আপনার চেয়ে কোনো জ্ঞানী লোক কি স্যার আছে?'

স্থূল রসিকতায় মনসুর সাহেবের মন আরো খারাপ হল। তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'না নেই।'

'স্যার আমিও তাই ভেবেছি। আপনি হচ্ছেন জ্ঞানীদের সম্রাট।'

'যাই বদরুল?'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। আপনি আসেন এত ভালো লাগে। জ্ঞানী লোক কিছুক্ষণ সামনে বসে থাকলেও জ্ঞান বাড়ে। আমার স্যার এর মধ্যেই অনেক জ্ঞান বেড়ে গেছে।'

মনসুর সাহেব সরাসরি বাসার দিকে রওনা হলেন না। হেডমাস্টার সাহেব প্রেসার মাপাতে বলেছেন। ডাক্তার বজলুর রহমানের কাছে প্রেসার মাপাতে গেলেন। আজো সেখানে আড্ডা বসেছে। ডাক্তার সাহেব আজ ভূতের গল্প করছেন না। ব্যাঙের পেটে যে মণি থাকে তার গল্প করছেন—

'লোকাল ভাষায় একে বসে ব্যাঙের লাল। সাত রাজার ধন—এরকম বলা হয় থাকে। প্রাণী থেকে পাওয়া মণি মুক্তার মধ্যে সাপের মণি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু হচ্ছে ব্যাঙের মণি, নাম্বার থ্রি হাতির মাথায় যেটা থাকে—গজমতি। নাম্বার ফোর গরুর বুকে যেটা থাকে।'

'গরুর বুকেও থাকে না-কি?'

'তাও জানেন না। গরুর বুকে যেটা থাকে তার নাম 'গোচনা। সবচে' কমদামি রত্ন থাকে ঝিনুকের মধ্যে—মুক্তা...'

উদ্ভট গল্প শুনতে ইচ্ছা করে। গল্পে বাধা দিতেও মন চায় না। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছে...তারপরেও মনসুর সাহেব বললেন—ইয়ে আমার প্রেসারটা...

বজলুর রহমান গল্প থামিয়ে ড্রয়ার থেকে প্রেসার মাপার যন্ত্র বের করলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হেডস্যার বলেছেন—আপনার না-কি হাই প্রেসার—বোর্ডে আবোল তাবোল কী সব লিখেছেন। দেখি হাত দিন।'

মনসুর সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রেসার মাপার যন্ত্রের বাল্ব টিপতে টিপতে গল্পে ফিরে গেলেন—

'ব্যাঙের লালের রঙ হল আপনার সবুজাভ লাল...ওজন ত্রিশ থেকে চল্লিশ রতির বেশি হয় না...মনসুর সাহেব আপনার ব্লাড প্রেসার নরম্যালের একটু উপরে—তেমন কিছু না। হাঁটাহাঁটি করবেন—হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম ব্যাঙের লাল ছাড়ার টাইম হল ভাদ্র-আশ্বিন মাস...'

৬

মনসুর সাহেব বাসার দিকে রওনা হলেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। পথ অন্ধকার। আকাশে চাঁদের আলো নেই—শুধু নক্ষত্রের আলো। নক্ষত্রের আলোয় পথ চলতে তাঁর ভালোই লাগছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শারীরবৃত্তির নিয়মে পরিবর্তন হয়—আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি ভালো লাগে।

বাঁধের উপর যে জায়গায় বজ্রপাত হয়েছিল মনসুর সাহেব ঐ জায়গাটা খুঁজতে শুরু করলেন। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছেন যেখানে বজ্রপাত হয় সেখানে গর্ত হয়ে থাকে। গর্ত খুঁড়লে লৌহ জাতীয় কিছু পাওয়া যায়। বাঁধের উপর তিনি এমন কোনো গর্ত খুঁজে পেলেন না, যাকে বজ্রপাতজনিত গর্ত বলে ভাবা যায়। গরুর গাড়ির চাকায় তৈরি গর্ত, মাটি ডেবে যাবার গর্ত প্রচুর আছে ; কিন্তু বজ্রপাতের গর্ত কই ? তাঁর হাত থেকে কাগজের প্যাকেট পড়ে গিয়েছিল—সেই প্যাকেটটাই বা কোথায় ?

'স্যার কী খুঁজছেন ?'

মনসুর সাহেব চমকে উঠলেন। এতটা চমকানোর কোনো কারণ ছিল না। প্রশ্নকর্তা তাঁর অপরিচিত কেউ নয়। ফিবোনাক্কি। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'ও।'

'আমাকে চিনতে পেরেছেন তো স্যার আমি ফিবোনাক্কি।'

'হুঁ।'

'বজ্রপাতের জায়গাটা খুঁজছেন ?'

'হুঁ।'

'ঐ রাতে বজ্রপাত হয়েছিল আপনার শরীরে। আপনার গা বেয়ে বিদ্যুৎ নিচে নেমে যায়।'

'আমার গায়ে বজ্র পড়ল আর আমার কিছু হল না ? তালগাছে বজ্রপাত হলে তালগাছ জ্বলে যায়।'

'স্যার আপনিতো আর তালগাছ না।'

ফিবোনাক্কিও রসিকতা করছে। আশ্চর্য !

'স্যার চলুন হাঁটা শুরু করি। গল্প করতে করতে আপনার সঙ্গে যাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। হাঁটাও শুরু করলেন না। ফিবোনাক্কির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করা মানে তাকে শুধু যে স্বীকার করে নেয়া তাই না তাকে প্রশ্রয়ও দেয়া। স্বীকার করা বা প্রশ্রয় দেয়া কিছুতেই উচিত হবে না। মনের ভ্রান্তি মনেই থাকুক। তাঁর প্রেসার নিশ্চয়ই অনেক বেশি। ডাক্তার বজলুর রহমানের নষ্ট যন্ত্রে ধরা পড়ে নি। প্রেসার বেশি না হলে ফিবোনাক্কি নামক ব্যাপার স্যাপার চোখের সামনে উপস্থিত হত না।

'স্যার ঐ রাতেতো এক ম্যারাথন ঘুম দিলেন। আমি হিসেব করে দেখেছি আপনি সর্বমোট ২৩ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১১ সেকেন্ড ঘুমিয়েছেন। আপনি কি স্যার লক্ষ করেছেন—২৩, ৩৭, ১১ তিনটাই প্রাইম নাম্বার। আবার এদের যোগফলও প্রাইম নাম্বার। এদের যোগাফল হল ৭১, ইন্টারেস্টিং না ?'

'হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং। বেশ ইন্টারেস্টিং।'

ফিবোনাক্কি লজ্জিত গলায় বলল, 'আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন স্যার। আসলে আপনি ঘুমিয়েছেন ২৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। কোনোটাই প্রাইম নাম্বার না। আপনাকে মিথ্যা করে প্রাইম নাম্বারের কথা বলেছি যাতে আপনি আগ্রহী হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন। প্রাইম নাম্বারের প্রতি আপনার এই আগ্রহের কারণ কি ?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'একটা সংখ্যাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না। অখণ্ড অবস্থায় থাকছে এই জন্যেই ভালো লাগে।'

'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত গণিতবিদ জন্মেছেন সবারই প্রাইম নাম্বার সম্পর্কে কৌতূহল। ভারতের মাদ্রাজের এক গণিতবিদ ছিলেন—আপনি তাঁর নাম শুনেছেন—রামানুজন ?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'প্রাইম নাম্বার সম্পর্কে উনার আগ্রহ ছিল সীমাহীন। উনার সেই বিখ্যাত গল্পটা কি স্যার জানেন ?'

'কোন গল্প ?'

'ঐ যে নিদারুণ অসুস্থ হয়ে তিনি শুয়ে আছেন। শরীরের এমন অবস্থা যে, যে কোনো মুহূর্তে তিনি মারা যাবেন। এই সময় তাঁকে এক ভদ্রলোক দেখতে এলেন। রামানুজন বললেন—তুমি যে গাড়িতে করে এসেছ তার নাম্বারটা কত।

ভদ্রলোক নাম্বার বললেন। রামানুজন আনন্দিত ভঙ্গিতে বললেন—আরে প্রাইম নাম্বার ! তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কি কৌতূহল।'

মনসুর সাহেব রাগী গলায় বললেন, 'প্রাইম নাম্বার তুচ্ছ বিষয় ?'

'অবশ্যই তুচ্ছ বিষয়। মৌলিক সংখ্যায় এমন কি বিশেষত্ব আছে যে একে মাথায় নিয়ে নাচতে হবে ? পৃথিবীর রহস্যের সবটাই শূন্যের ভেতর। যে কোনো রাশিকে শূন্য দিয়ে গুণ দিলে উত্তর হবে ০, আবার সেই রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিন হয়ে যাবে অসীম।'

'তুমি আমাকে এইসব শেখাতে এসো না। এসব আমার অজানা নয়।'

'স্যার আমরা হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি ?'

'চল।'

'আপনার কাগজের প্যাকেটটা আমার হাতে দিন।'

'তোমার হাতে দিতে হবে না—তুমি হাঁট। এটা এমন কিছু ভারি নয়।'

ফিবোনাক্কি পাশপাশি হাঁটছে। নিজের উপর রাগে মনসুর সাহেবের গা জ্বলে যাচ্ছে। ফিবোনাক্কিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটার মানে তাকে স্বীকার করে নেয়া।

'ফিবোনাক্কি তুমি কি ধূমপান কর ?'

'জ্বি না স্যার। তবে আপনি যদি দেন একটা সিগারেট টেনে দেখতে পারি।'

'আমার কাছে সিগারেট নেই, আমি ধূমপান করি না।'

'না করাই ভালো হার্টের বারোটা বাজিয়ে দেয়।'

'ফিবোনাক্কি।'

'জ্বি স্যার ?'

'ব্যাঙের পেটে মণি থাকে তুমি জান ?'

'আমি শুনেছি। ব্যাঙের পেটের মণিকে বলে—লাল। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ব্যাঙ এই লাল উগরে মাটিতে ফেলে। এতে জায়গাটা আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকা মাকড় আসে। ব্যাঙ তখন এইসব পোকা মাকড় ধরে ধরে খায়। এইসব কেন জিজ্ঞেস করছেন ?'

'তোমার জ্ঞান কতটুকু তা জানার চেষ্টা করছি।'

'কি জানলেন ?'

'জানলাম যে আমার যে জ্ঞান এবং তোমার যে জ্ঞান তা একই। তুমি আমার চেয়ে বেশি কিছু জান না। অর্থাৎ তুমি ফিবোনাক্কি নাও—কিছুই নও—তুমি আমার কল্পনা। এবং এই সত্য আমি খুব সহজে প্রমাণ করতে পারি।'

'কীভাবে করবেন ?'

'কাউকে না কাউকে আমি পাব যে নেত্রকোনার দিকে যাচ্ছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে কি না। সে যদি তোমাকে দেখতে না পায় তাহলে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সৃষ্টি।'

ফিবোনাক্কি চুপ করে রইল। মনসুর সাহেব বললেন—'আমার এই ক্ষুদ্র পরীক্ষা তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?'

'খুব ভালো পরীক্ষা স্যার!'

'তুমি কি এই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে চাও?'

'অবশ্যই যেতে চাই। কেন যেতে চাইব না। পরীক্ষাটা হলে আমারই লাভ।'

'কি লাভ?'

'আপনি বুঝবেন যে আমি কল্পনা নই। আমার অস্তিত্ব আছে। এবং আমার কথা আপনার মন দিয়ে শোনা উচিত। আমি আপনাকে বিপদে ফেলার জন্যে বা বিভ্রান্ত করার জন্যে আসিনি। আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি।'

মনসুর সাহেব কথা বললেন না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন। এই মুহূর্তে একজন কাউকে তাঁর প্রয়োজন যে নেত্রকোনা যাচ্ছে, বা নেত্রকোনা থেকে ফেরত আসছে।

কাকে যেন আসতে দেখা যাচ্ছে। বাঁধের উপর উঠে এল। সিগারেট বা বিড়ি টানছে। আগুনের ফুলকি উঠানামা করছে। মনসুর সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ফিবোনাক্কির গলাতেও আগ্রহ ঝরে পড়ল, 'স্যার কেউ একজন আসছে।'—

মনসুর সাহেব এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন। এই বয়সে উত্তেজনা ভালো না। তাছাড়া ডাক্তার বলে দিয়েছে তার প্রেসারের সমস্যা আছে নরম্যালের চেয়ে বেশি। প্রেসারের মানুষদের জন্যে উত্তেজনা—শুভ না।

সিগারেট টানতে টানতে যে আসছিল সে মনসুর সাহেবের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সিগারেট ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে মনসুর সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। মনসুর সাহেব চিনতে পারলেন না। অন্ধকারে চেনার কথাও না। তার পুরানো ছাত্রদের কেউ হবে। মনসুর সাহেব বললেন, 'থাক থাক সালাম লাগবে না।' বলেই বিরক্ত হলেন—এই বাক্যটা সব সময় সালাম শেষ হবার পর বলা হয়। কাজেই এটা অর্থহীন বাক্য।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম। রোগা হয়ে গেছেন।'

'শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না।'

'কি স্যার।'

'চোখে সমস্যা, তারপর তোমার ইদানিং প্রেসারও সম্ভবত বেড়েছে। নরম্যালের চেয়ে বেশি।'

'খুব হাঁটাহাঁটি করবেন। প্রেসার আর ডায়াবেটিস এই দুইয়ের একটাই ওষুধ-'হন্টন'।'

'ফিবোনাক্কি হঠাৎ কথা বলল, 'ভাই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। আমার নাম ফিবোনাক্কি।'

'কি নাক্কি।'

'ফিবোনাক্কি। একটু অদ্ভুত নাম।'

'আপনি কে?'

'আমিও আপনার মতোই আপনার স্যারের ছাত্র।'

'ও।'

'ফিবোনাক্কি হাসতে হাসতে বলল, 'ছাত্রে ছাত্রে ধুল পরিমাণ।'

'ছাত্রে ছাত্রে ধুল পরিমাণ, মানে কি?'

'কথার কথা বললাম। সব কথাকে গুরুত্ব দিতে নেই। ভাই আপনি এখন চলে যান। আমরা হাঁটা শুরু করি। স্যারের সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে।'

'আপনার নামটা কি যেন বললেন— ?'

'ফিবোনাক্কি।'

'আপনি কি বাঙালি।'

'এই মুহূর্তে ১০০ ভাগ বাঙালি। জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইনও জানি। শুনবেন?'

'জ্বি না।'

'শুনুন না। ভালো লাগবে— ।'

'জ্বি না কবিতা শুনব না।'

'তাহলে আপনি আর আপনার স্যারকে আটকে রাখবেন না। ছেড়ে দিন। উনার সঙ্গে আমার ভয়াবহ ধরনের জরুরি কিছু কথা আছে।'

মনসুর সাহেব নিঃশব্দে হাঁটছেন। ফিবোনাক্কি হাঁটছে তার পাশে পাশে। ফিবোনাক্কি বলল, 'স্যার আপনার পরীক্ষার ফলাফল তো মনে হয় পজেটিভ। আপনার ঐ ছাত্রতো আমাকে দেখতে পেল এবং কথাবার্তাও বলল।'

'হুঁ।'

'এখন কি আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন যে আমার একটা অস্তিত্ব আছে। আমি কল্পনার কেউ না।'

মনসুর সাহেব কিছু বললেন না।

'স্যার বাঁধের নিচে নৌকা বাঁধা আছে। খালি নৌকা। ঐখানে একটু বসবেন? জরুরি কথা দ্রুত সেরে ফেলতাম।'

'ঢালু বাঁধ। নামতে কষ্ট। ফিবোনাক্কি মনসুর সাহেবের হাত থেকে কাগজের প্যাকেট নিয়ে নিল। মনসুর সাহেবকে হাত ধরে সাবধানে নামাল।

দু'জন চুপচাপ নৌকার গলুইয়ে মুখোমুখি বসে আছে। প্রথম কথা বললেন মনসুর সাহেব—'বল কি বলবে?'

'স্যার আপনি খুব বড় একটা কাজ করছেন। কত বড় কাজ যে করছেন সেই সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'তুমি কে?'

'আমি এসেছি শূন্য জগত থেকে।'

মনসুর সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সবই কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিবোনাক্কি বলল, 'আমার জগতটা কি আমি ব্যাখ্যা করব?'

'করতে পার।'

'আপনার ভেতর কোনো আগ্রহ দেখছি না। আপনি যদি কোনো আগ্রহ না দেখান তাহলে আমি কথা বলে আরাম পাব না।'

'আগ্রহ বোধ করছি না বলেই তুমি আগ্রহ দেখছ না।'

'আগ্রহ না দেখালেন—কি বলছি মন দিয়ে শুনুন।'

'শুনছি।'

'স্যার এই পৃথিবীর বস্তু জগৎ হচ্ছে ত্রিমাত্রিক। পৃথিবীর বস্তু জগতের প্রতিটি বস্তুর আছে তিনটি মাত্রা—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। ঠিক না স্যার।'

'হ্যাঁ।'

'আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে সময় নিয়ে এসে, সময়কে একটা মাত্রা ধরে পৃথিবীর বস্তুজগতকে কেউ কেউ চার মাত্রার জগতও বলেন, তবে আমাদের বোঝার জন্যে পৃথিবীর জগতটাকে তিন মাত্রার জগত বলা চলে। ঠিক আছে স্যার?'

'হুঁ।'

'তিন মাত্রার জগতের মতো দুই মাত্রার জগতওতো হতে পারে। পারে না স্যার?

যে জগতে শুধু দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে। উচ্চতা বলে কিছু নেই।'

'থিওরিটেক্যালি থাকতে পারে।'

'দুই মাত্রার জগতের মতো একমাত্রার জগতও থাকতে পারে যে জগতের সব বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য আছে আর কিছু নেই। থাকতে পারে না স্যার?'

'হুঁ।'

'এখন তাহলে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চলে আসুন। শূন্য মাত্রার জগতও তো থাকতে পারে। যে জগতে কোনো মাত্রা নেই। মাত্রা নেই বলে মাত্রার বন্ধনও নেই। শূন্য মাত্রার জগত এবং অসীম মাত্রার জগত কি একই নয়?'

মনসুর সাহেব তাকিয়ে আছেন।

ফিবোনাক্কি বলল, 'শূন্য এবং অসীম এই দুটি সংখ্যার ধর্ম এক রকম। যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে উত্তর হয় শূন্য। আবার যে কোনো সংখ্যাকে অসীম দিয়ে গুণ করলে উত্তর হয় অসীম। এখন স্যার আপনিই বলুন শূন্যকে অসীম দিয়ে গুণ করলে কি হবে?

মনসুর সাহেব ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন।

ফিবোনাক্কি বলল—'আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আপনার সমাধান মানব জাতির জন্যে বিরাট ব্যাপার হবে। এই সমাধানের জন্যে মানুষ শূন্যের প্রবেশ...'

মনসুর সাহেব তার কথা থামিয়ে মেঘস্বরে ধমকে উঠলেন—'স্টপ।'

ফিবোনাক্কি থতমতো খেয়ে চুপ করে গেল। মনসুর সাহেব বললেন, 'তুমি কোনো কথা বলবে না। তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা...এর বেশি কিছু না।'

'একটু আগেই কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তি—আপনার ছাত্র আমাকে দেখতে পেরেছে। আমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

'আমার ঐ ছাত্রও আমার মনের কল্পনা। তুমি যেমন আমার কল্পনা থেকে এসেছ—সেও এসেছে। সে যে আচরণ আমার সঙ্গে করেছে কোনো ছাত্র আমার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করবে না। আমাকে উপদেশ দিচ্ছে। বলছে 'হন্টন' করবেন। হন্টন আবার কি?'

'সামান্য রসিকতাও আপনার ছাত্র আপনার সঙ্গে করতে পারবে না?'

'পারা উচিত কিন্তু পারে না। আমার বত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কোনো ছাত্র আমার সঙ্গে রসিকতা করেনি। তারচে'ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল—ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার সঙ্গে তার দেখা। সে অন্ধকারে আমাকে চিনে ফেলল? কেমন করে চিনল?'

মনসুর সাহেব উঠে পড়লেন। ফিবোনাক্কি বলল, 'স্যার চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ চলে যাচ্ছি। আর শোন খবর্দার আমার পেছনে পেছনে আসবে না।'

'বাঁধে তুলে দেই। খাঁড়া বাঁধ। একা উঠতে পারবেন না।'

'খুব পারব। তুমি আসবে না। বললাম...'

মনসুর সাহেব দেখলেন তারপরেও ফিবোনাক্কি তাঁকে অনুসরণ করছে। মনসুর সাহেব বাসার কাছাকাছি এসে আবারো কড়া করে ধমক দিলেন। ফিবোনাক্কি বলল, 'ঠিক আছে স্যার আমি চলে যাচ্ছি। তবে কাছাকাছিই থাকব। যদি প্রয়োজন হয়...'

ফিবোনাক্কি ক্লান্ত ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে। গেট খুলে কম্পাউন্ডের ভেতর মনসুর সাহেব বললেন—'হরমুজ ফিরে এসেছে। একদিন থাকার কথা বলে দু'দিন কাটিয়ে এসেছে। মেয়ের বাড়ি থেকে আসার পর প্রথম কয়েকদিন হরমুজের মেজাজ খুব ভালো থাকে। আজ তার মেজাজ অত্যন্ত ভালো। কথা বলার জন্যে সে ছটফট করছে, বলার লোক পাচ্ছে না।'

মনসুর সাহেবকে দেখে তাঁর আনন্দ তীব্র হল। সে গ্যারাজের বারান্দায় কেরোসিনের চুলায় ভাত চড়িয়েছে। ডাল ইতিমধ্যে নেমে গেছে। ইচ্ছা করলে কয়েক টুকরা বেগুন ভেজে ফেলা যায়। ঘরে বেগুন আছে। তবে না ভাজলেও ক্ষতি নেই—ডাল ভাত দিলেই স্যারের চলবে। বেগুন ভাজা দেখলে উনি বিরক্ত হতে পারেন।

হরমুজ একগাল হেসে বলল, 'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আপনারে নিয়া খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'কেন?'

'আপনার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা—কি খাইলেন, না খাইলেন।'

'কোনো অসুবিধা হয় নি। তোমার মেয়ে ভালো?'

'আপনের দোয়া স্যার। মেয়ে ভালো আছে। তবে স্যার শরীর দুর্বল। ডাক্তার ওষুধ একটা দিয়েছে সত্তুর টাকা দাম। চিন্তা করেন—নয় আঙ্গুলের এক বোতল তার দাম সত্তুর টাকা।'

মনসুর সাহেব প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বললেন, 'একটা কাজ করে দিতে পারবে হরমুজ।'

'অবশ্যই পারব।'

'গেটের বাইরে গিয়ে দেখতো কোনো ছেলে আছে কি-না।'

'কি ছেলে?'

'যুবক এক ছেলে। আমার কাগজগুলি ছিল তার হাতে। পাঁচ দিস্তা কাগজ।'

হরমুজ তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেল। লোকটাকে সে পেল না।

'কেউ ছিল না?'

'জ্বি না কেউ ছিল না।'

'ভালো করে দেখেছ?'

'খুব ভালো করে দেখেছি।'

'স্যার খানা হয়ে গেছে দিয়ে দেব?'

'না। খিদে নেই। আজ কিছু খাব না।'

মনসুর সাহেব রাত ন'টা বাজার আগেই ঘুমুতে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল রাত দু'টায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সব কেমন ভৌতিক লাগছে। দীর্ঘকাল পর তার একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

তিনি হারিকেন জ্বালালেন। ঘুম যখন ভেঙেছে তখন একটু কাজ করা যাক। ফাইলপত্র নিয়ে বসা যাক। অনেকদিন কিছু লেখা হয় নি। অবহেলা করা হচ্ছে। বয়স হচ্ছে—বয়সের প্রধান ধর্ম আলস্য। কাজ এড়ানোর অজুহাত খোঁজা। অথচ উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। অল্প বয়স্করা আলস্য দেখাতে পারে তাদের হাতে সময় আছে। তাঁর হাতে সময় কই? বৃদ্ধরা কাজ করবে যন্ত্রের মতো—কোনোদিকে তারা তাকাবে না। কারণ তাঁদের ঘণ্টা বেজে গেছে। ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা বেজেই যাচ্ছে। একদিন শেষ ঘণ্টা বাজবে তখন...

আচ্ছা শূন্য জগতের ব্যাপারগুলি কেমন? ফিবোনাক্কি কথাটা মন্দ বলে নি—মাত্রাহীন জগত হল—অসীম মাত্রার জগত। তাঁর পিপাসা বোধ হচ্ছে। লেবুর সরবত খেয়ে ঘুমতে যান নি। পিপাসা হবারই কথা। চিনি লেবু কিছুই কেনা হয়নি। আজও ছোটবাজারে গিয়ে শুধু কাগজ কিনে ফিরেছেন।

তাঁর একজন এ্যাসিসটেন্ট থাকলে মন্দ হত না। হরমুজের মতো এ্যাসিসটেন্ট না—ফিবোনাক্কির মতো এ্যাসিসটেন্ট। যার সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায়। যে যুক্তি নির্ভর কথা বলবে প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজও করে দেবে। যেমন চট করে গ্লাস ভর্তি লেবুর সরবত নিয়ে এল। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখল—।

ভালো কথা, তিনি যে পাঁচ দিস্তা কাগজ কিনেছিলেন—সেই কাগজতো রয়ে গেছে ফিবোনাক্কির কাছে। স্পষ্ট মনে আছে—দু'জন নৌকোয় বসে কথা বলছেন। কাগজের প্যাকেটটা ফিবোনাক্কির হাতে। নৌকা থেকে তিনি রাগ করে উঠে এলেন। প্যাকেট নেয়া হল না। বাসার কাছাকাছি এসে ফিবোনাক্কিকে ধমকে বিদেয় করলেন। প্যাকেট ফেরত নিতে ভুলে গেলেন।

কাগজ ছাড়া তিনি হারিকেন জ্বালিয়ে করবেন কি ? মনসুর সাহেব বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকে দেয়ালের বাইরের খানিকটা অংশ দেখা যায়। ফিবোনাক্কি কি আছে সেখানে ?

আচ্ছা তিনি হাস্যকর চিন্তা করছেন কেন ? কল্পনার মানুষকেই বাস্তব মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করছেন। তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাথা খারাপ রোগ তাঁদের বংশে আছে। তাঁর দাদাজান চল্লিশ বছরে হঠাৎ একদিন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন। রাতে ঘুমুচ্ছিলেন ঘুম ভেঙে স্ত্রীকে ডেকে তুলে বললেন, ওগো ওই। আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। আমার মাথায় পানি ঢাল। দাদিজান ভয়ে অস্থির হয়ে পানি আনতে গেলেন। দাদাজান বললেন—বউ শোন পানি আনতে যাবার আগে দড়ি এনে আমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখ, নয়ত দেখবে আমি ঝাঁপ দিয়ে দোতলা থেকে নিচে পড়ে গেছি। পাগল মানুষতো—কিছুই বলা যায় না।

মনসুর সাহেবের দাদিজান দড়ি আনার আগে বালতি ভর্তি পানি এনে দেখেন মানুষটা বিছানায় নেই। ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়েছে। তখনো জ্ঞান আছে। কথা বলতে পারছে। মৃত্যুর আগে মানুষটা বিড়বিড় করে বলল—তোমার মনে কোনো কষ্ট রাখবে না। এটা আত্মহত্যা না। আমি আত্মহত্যার মানুষ না। মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে এই কাজ করেছি। মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। বড় আফসোস।

তার মাথাটাও কি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে ? তিনি নিশিরাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিবোনাক্কি নামক কল্পনার এক যুবককে ভাবতে শুরু করেছেন।

মনসুর সাহেব ডাকলেন, 'ফিবোনাক্কি !'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'জ্বি স্যার আমি আছি।

হ্যাঁ সে আছে তো বটেই। ঐতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মরা আলোয় সুদর্শন এক তরুণ দাঁড়িয়ে। তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'ফিবোনাক্কি !'

'জ্বি স্যার।'

'আমার কাগজের প্যাকেটতো তোমার কাছে ছিল।'

'জ্বি !'

'কোথায় সেগুলি ?'

'নষ্ট করে ফেলেছি।'

'নষ্ট করে ফেলেছি মানে ?'

'আপনি আমার উপর রাগ করলেন। আমার মনটা হল খারাপ। আমি মন খারাপটা ঝাড়লাম কাগজের উপর।'

'তুমি কি করলে—এতগুলি কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললে?'

'জ্বি না। কাগজগুলি দিয়ে নৌকো বানিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি।'

'কি বললে?'

'কাগজের নৌকা বানিয়ে নদীতে ভাসিয়েছি। অনেকগুলি নৌকা হয়েছে। দেখতে খুব ভালো লাগে। সকালে মর্নিং ওয়াক করার জন্যে যদি নদীর পাড়ে আসেন তাহলে দেখবেন। একটা নৌকাও নষ্ট হয়নি।'

'আচ্ছা।'

'নৌকাগুলি ছেড়েছিও আপনার প্রিয় রাশিমালা অনুযায়ী প্রথম ছাড়লাম একটা, তারপর একটা, তারপর একসঙ্গে দু'টা। তারপর একসঙ্গে তিনটা, তারপর পাঁচটা।...

'চুপ কর।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'ফিবোনাক্কি!'

'জ্বি স্যার।'

'সত্যি করে বলতো আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মাথা খারাপের ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে আছে। আমার দাদাজানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'আমি জানি।'

'তুমি জান?'

'আমি শূন্য জগতের একজন, সবকিছুই আমার জানা থাকার কথা। আপনার দাদাজানের হঠাৎ পাগল হয়ে যাবার ব্যাপারটা আমি জানি...একদিন তিনি ছাদে পাটি পেতে ঘুমুচ্ছিলেন—হঠাৎ তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ওগো ওঠ। আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে...'

মনসুর সাহেব ফিবোনাক্কিতে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'তুমি এসব জান কারণ তুমি এসেছ আমার কল্পনা থেকে। সঙ্গত কারণেই আমি যা তুমি তাই জানবে।'

'আপনার দাদাজানও আপনার মতো অঙ্ক করতে ভালোবাসতেন। তাই না স্যার।'

'হুঁ।'

'তাঁর ট্রাংক ভর্তি ছিল গুটি গুটি হাতে লেখা কাগজ।'

'হুঁ।'

'স্যার আপনি কি সেইসব দেখেছেন ?'

'দেখেছি। বেশির ভাগই উইপোকায় কেটে ফেলেছিল।'

'অল্প যা রক্ষা পেয়েছিল আপনি তা আপনার ফাইলে যত্ন করে রেখেছেন।'

'আমি রাখিনি। আমার বাবা রেখেছিলেন। বাবার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি।'

'আপনার বাবাওতো স্যার অঙ্কের ছাত্র ছিলেন ?'

'হুঁ। কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অঙ্কে এম. এ ডিগ্রি নেন। গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন।'

'আপনারা তাহলে তিনপুরুষের গণিতজ্ঞ।'

'হুঁ।'

'অঙ্কে তো আপনারও এম. এ ডিগ্রি আছে। আপনি নিজেও তো কালি নারায়ণ স্কলার।'

'হুঁ।'

'ইউনিভার্সিটি বা কলেজে ইচ্ছা করলেই আপনি ভালো চাকরি পেতে পারতেন, তা না করে স্কুলে চাকরি নিলেন—কেন ?'

'চট করে পেয়ে গেলাম। ঝামেলা কম, নিরিবিলি—।'

'আপনার বাবাও ঝামেলা পছন্দ করতেন না। নিরিবিলি কাজ করতে চাইতেন। তিনিও তো অতি অল্প বয়সে মারা গেছেন।'

'হুঁ।'

'তাঁর মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু, না অস্বাভাবিক মৃত্যু ?'

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর কপালে ঘাম জমছে। শরীর কাঁপছে। ফিবোনাক্কি বলল—'স্যার একটা জটিল রাশিমালার সমাধান আপনারা তিন পুরুষ ধরে চেষ্টা করছেন। চতুর্থ পুরুষ বলে আপনাদের কিছু নেই। কিছু করার হলে আপনাকেই করতে হবে। যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে আপনাতেই সব শেষ। স্যার আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'তুমি কেউ না। তুমি আমার অবচেতন মনের কল্পনা।'

'যদি কল্পনাও হয়ে থাকি তাতেও তো ক্ষতি নেই। কাজ হওয়া নিয়ে কথা।'

'তুমি কী ভাবে সাহায্য করতে চাও ?'

'আপনি অনেক রাশিমালা নিয়ে কাজ করছেন—একটি রাশিমালা আছে যার যোগফল শূন্য।'

'অনেকগুলি রাশিমালার যোগফলই শূন্য।'

'ফিবোনাক্কি রাশিমালার একটি আছে যার ফলাফল শূন্য।'

'মনে পড়ছে না।'

'খুঁজে বের করুন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমাদের শূন্য জগতটা কেমন?'

'অন্য রকম। সে জগতে সবই শূন্য। সেখানে আনন্দ, দুঃখ, বেদনা কিছুই নেই।'

'আনন্দ, দুঃখ, বেদনা নেই। শূন্য জগত তো ভয়াবহ জগত।'

'স্যার আপনি ভুলে যাচ্ছেন—শূন্যের সঙ্গে অসীম সম্পর্কিত। আনন্দ, দুঃখ, বেদনা যেমন শূন্য—তেমনি একই সঙ্গে অসীম। আপনি রহস্যের খুব কাছাকাছি আছেন। খুব কাছাকাছি। আপনি নিজেও তা জানেন। জানেন না?'

'হ্যাঁ জানি।'

'স্যার আপনি খুব কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। রহস্যের খুব কাছাকাছি এসে মানুষ ভেঙে পড়ে। আপনার দাদাজান ভেঙে পড়েছিলেন। আপনার বাবার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে।'

মনসুর সাহেবের শীত করতে লাগল। চৈত্র মাসের রাতে এরকম শীত লাগার কথা নয়।

'স্যার আমি এসেছি আপনাকে সাহস এবং শক্তি জোগানোর জন্যে।'

'তুমি আমার অবচেতন মনের ছায়া।'

'তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আপনি কাজ শুরু করুন—যে ভাবে বলছি সেই ভাবে...'

'থ্যাংক য়্যু।'

'স্যার আমি আপনাকে কি পরিমাণ ভালোবাসি তা আপনি জানেন না।'

'তুমি তো ভালোবাসবেই। তুমি আমারই অংশ।'

'সব সময় মানুষের নিজের অংশই যে মানুষকে ভালোবাসে তাতো নয়। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে বেঁচে থাকে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা শোন—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

'আমি যে জগতে বাস করি সে জগতে স্বপ্ন ও বাস্তবের কোনো সীমারেখা নেই। স্বপ্ন যা বাস্তবও তা।'

'ফিবোনাক্কি!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি কি চা বানাতে পার?'

'কেন বলুনতো ?'

'তাহলে চা বানাতে বলতাম। চা খেয়ে অঙ্ক শুরু করতাম।'

'ফিবোনাক্কি হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন ?'

'এম্নি হাসছি স্যার। আপনি চা খেতে পারবেন না। ঘরে চিনি নেই। আপনি চিনি ছাড়া চা খেতে পারেন না। তাছাড়া রাত প্রায় শেষ হতে চলল—কিছুটা হলেও বিশ্রাম আপনার দরকার।'

'শুয়ে পড়তে বলছ ?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কথা ফিবোনাক্কি, শূন্য জগতে মানুষের আয়ু কি ? মানুষ সে জগতে কতদিন বাঁচে ?'

'সেই জগতে মানুষের আয়ু একই সঙ্গে শূন্য এই সঙ্গে অসীম ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'সেটা হচ্ছে অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতার জগত।'

'বুঝতে পারছি না।'

'স্যার আপনি বিশ্রাম করুন। ঘুমুতে যান।'

'আমার ঘুমুতে ভয় লাগছে।'

'কেন ?'

'হঠাৎ হয়তো ঘুম ভেঙে আমার দাদাজানের মতো...'

'উনার সমস্যা আপনার হবে না।'

'কেন ?'

'উনার পাশে সেই দুঃসময়ে কেউ ছিল না। আপনার পাশে আমি আছি।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি আমার কল্পনা, নাকি তুমি শূন্যের জগত থেকে উড়ে এসেছ ?'

'আমি আপনার কল্পনা কিন্তু আমার বাস শূন্য জগতে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারবেন। খুব শিগ্‌গিরই বুঝতে পারবেন। আপনার কাজ শেষ করুন।'

'কাগজ তো নেই। কীভাবে কাজ করব ?'

মনসুর সাহেব ঘরে ফিরে এলেন। হারিকেন নিভিয়ে বিছানায় গেলেন। ভয়াবহ ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আকাশে মরা চাঁদ, সেই আলো এসে পড়েছে তাঁর বিছানার এক অংশে।

শূন্য জগতে কি চন্দ্রলোক আছে ? সেই জগতে কি জোছনার ফুল ফুটে। পাখি গান গায় ?

Everything was once created from nothing.

শূন্য থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। শূন্যতেই সব ফিরে যাবে।

মনসুর সাহেবের মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ভোতা যন্ত্রণা। মানুষের প্রধান অংশ কি ?

মানুষের প্রধান অংশ তার চেতনা। এই চেতনাকে ধারণ করছে শরীর। শরীরকে বাদ দিয়ে চেতনার যে অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বের জগতই কি শূন্যের জগত, না-কি এর বাইরেও কিছু।

খাটের নিচে ইঁদুর খচখচ করছে। এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর চেতনা কি আদি চেতনারই অংশ ? বিরাট এক রাশিমালা ? যে রাশিমালার যোগফল শূন্য।

শরীরে এত ক্লান্তি অথচ ঘুম আসছে না। ঘুম আনতে হলে কি করতে হয়—মেষ গুণতে হয়।

মনসুর সাহেব মেষের বিশাল পাল কল্পনা করতে লাগলেন। একটি মেষ আসছে। আবার একটি। এখন একটির সঙ্গে আসছে দু'টি। এইবার তিনটি...মেষ পাল আসছে ফিবোনাক্কি রাশিমালায়—

১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩...

আচ্ছা এখন এই মেষের পালে কয়েকটা নেকড়ে ঢুকিয়ে দেয়া যাক। নেকড়েগুলি মেষ খেতে শুরু করবে। ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটবে যে মেষ এবং নেকড়ের সংখ্যা শুরুতে সমান থাকলেও সময়ের সঙ্গে কমতে শুরু করবে। নেকড়ে যেমন মেষ মারবে তেমনি মেষরা নেকড়ে মারবে...কাজেই নেকড়ের জন্যে একটি রাশিমালা প্রয়োজন...

মনসুর সাহেব উঠে বসলেন—পাওয়া যাচ্ছে। কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে। কাগজ ঘরে নেই। কাগজের খুব প্রয়োজন ছিল।

৭

বদরুল চোখ বড় বড় করে বলল, 'আবার কাগজ ?'

মনসুর সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ।'

মনসুর সাহেবের চোখ লাল। চুল উস্কুখুস্কু। গায়ে জ্বর আছে। আজ তিনি ক্লাসেও যাননি।

'কাগজ কতগুলো দেব ? পাঁচ দিস্তা ?'

'না। দশ দিস্তা।'

'গতকালই তো স্যার পাঁচ দিস্তা কাগজ নিয়ে গেছেন। শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এক রাতে অঙ্ক করে ভরিয়ে ফেলেছেন?'

'না। অন্য কাজে...'

বদরুল কৌতূহল চাপতে পারল না। আগ্রহ নিয়ে বলল, 'পাঁচ দিস্তা কাগজ দিয়ে কি করেছেন?'

'নৌকা বানালাম।'

'নৌকা বানালেন? কাগজের নৌকা?'

'হুঁ।'

'সেই নৌকা দিয়ে কি করলেন স্যার?'

মনসুর সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন—'নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি।'

বদরুলের মুখ হা হয়ে গেল। সে গলার বিস্ময় চাপা দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল—'মগরা নদীতে সব কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছেন?'

'হুঁ।'

'খুব ভালো করেছেন। পুলাপানরা কাগজের নৌকা ভাসাবে, আমরা ভাসাব না তা হয় না। বসেন স্যার চা খান।'

'না চা খাব না। শরীর ভালো না।'

'চা না খেলেও একটু বসুন। আপনার মতো জ্ঞানী লোকের পাশে কিছুক্ষণ থাকলেও গায়ে জ্ঞানের বাতাস লাগবে। প্লিজ স্যার চেয়ারটায় বসুন।'

মনসুর সাহেব কথা বাড়ালেন না। বসলেন।

'আপনি হলেন স্যার জ্ঞান-সমুদ্র। ছোটখাটো জ্ঞানী প্রায়ই দেখা যায়—জ্ঞান-চৌবাচ্চা, জ্ঞান-ডোবা, জ্ঞান-পুকুর। কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্র কখনো দেখা যায় না। আপনি যে এসে বসে থাকেন এত ভালো লাগে।'

মনসুর সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটা ভালো রসিকতা করছে। সে সবার সঙ্গেই রসিকতা করে না শুধু তার সঙ্গেই করছে।

বদরুল চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমি স্যার একটা কাজ করব। আপনার কিছু পায়ের ধুলা ডেনোর একটা টিনে ভয়ে রাখব। জীবনের একটা সঞ্চয় হয়ে থাকবে। লোকজনদের বলতে পারব—হায়াৎ মউতের কথাতো বলা যায় না। হঠাৎ একদিন মরে গেলেন তখন ধুলা পাব কোথায়?'

'আমি আজ উঠি বদরুল?'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনসুর সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—'রসিকতা আমি করতে পারি না। সবাই সব জিনিস পারে না। রসিকতা করার বিদ্যা আমার অনায়ত্ত। তুমি করতে পার। তোমার রসিকতা শুনতে ভালো লাগে। তোমার রসিকতা শোনার লোভেই মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে থাকি।'

বদরুল হা করে তাকিয়ে রইল। মনসুর সাহেব বললেন—'তোমাকে দেখি আর ভাবি প্রকৃতি মানুষকে কত বিচিত্র ক্ষমতা দিয়েই না পাঠিয়েছেন। রসিকতা করতে হলে তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন। তুমি নির্বোধ। তারপরেও তুমি অসাধারণ সব রসিকতা কর। তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়ে প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের একটা জিনিস বুঝিয়ে দেন—তা হচ্ছে—দেখ আমাকে দেখ। দেখ কি করতে পারি। বদরুল যাই। শরীরটা ভালো লাগছে না। নয়ত আরো কিছুক্ষণ বসতাম।'

তিনি সরাসরি বাসার দিকে রওনা হলেন। স্কুলে গেলেন। তাঁর পকেটে একটা দরখাস্ত সেখানে লিখলেন—

"...আমার শরীর খুবই অসুস্থ। স্কুলের দায়িত্ব পালনে বর্তমানে অক্ষম। আমার অতি জরুরি কিছু ব্যক্তিগত কাজও শেষ করা প্রয়োজন। কাজেই আমি আর স্কুলে আসব না বলে স্থির করেছি। অবসর গ্রহণের আগেই আমি অবসর প্রার্থনা করছি।..."

হেডমাস্টার সাহেব স্কুলে ছিলেন না। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রগ্রামে সরকার গম দিচ্ছে তিনি সেই গমের ব্যাপারে সিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। মনসুর সাহেব হেডস্যারের টেবিলে দরখাস্ত রেখে বাসার দিকে রওনা হলেন। তাঁর গায়ের তাপ আরো বেড়েছে, তিনি ঠিকমতো পা ফেলতেও পারছেন না। তাঁর মনে হল—প্রকৃতির একটা নিষ্ঠুর দিক আছে। এই নিষ্ঠুরতা তিনি মানুষের ক্ষেত্রেই সবচে' বেশি প্রয়োগ করেন। বয়সের সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, বিচক্ষণতা বাড়ে, যুক্তি বাড়ে কিন্তু এই সবের সমন্বয় করে কাজ করার যে ক্ষমতা তা কমতে থাকে। পরিপূর্ণ মাত্রায় সব দেয়ার শেষে হঠাৎ একদিন তিনি একসঙ্গে সব কেড়ে নেন।

হরমুজ বলল, 'স্যার আপনের কি হইছে?'

'শরীর ভালো না জ্বর আসছে। আর কিছু না। দুপুরে আমি কিছু খাব না। উপায় দিব।'

'ডাক্তার আনি।'

'না ডাক্তার লাগবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

'আপনার শরীরের এই অবস্থা আমি ব্যস্ত হব না। এটা স্যার কি বলেন।'

'তুমি ভালো করে আমাকে লেবুর সরবত দাও। আর কিছু লাগবে না।'

লেবুর সরবত বানিয়ে এনে হরমুজ মনসুর সাহেবের গায়ে হাত রেখে প্রায় কেঁদে ফেলল। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। সে ভীত গলায় বলল, 'এত জটিল অবস্থা।'

মনসুর সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, 'অবস্থা মোটেই জটিল না। অবস্থা সহজ। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও—আমি কাজ করব।'

'এই শরীরে কি কাজ করবেন।'

'কাজ শুরু করলে শরীরের কথা মনে থাকবে না।'

'আপনার পায়ে ধরি স্যার আপনি বিশ্রাম করেন।'

হরমুজ সত্যি সত্যি পা ধরতে এগিয়ে এল। মনসুর সাহেব ধমক দিয়ে তাকে বিদেয় করে সত্যি সত্যি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। পুরানো সব ফাইল বের করলেন। সব হাতের কাছে থাকুক। একটা ভালো ক্যালকুলেটর থাকলে খুব উপকার হত। হিসেবগুলি দ্রুত করা যেত। আজিজ বেপারিকে বললে সে এনে দেবে। এই লোক তাকে পছন্দ করে। খুবই পছন্দ করে। এই জীবনে তিনি তেমন কিছু পান নি—মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। হরমুজের কথা ধরা যাক। তাকে অসুস্থ দেখে সে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। হেডমাস্টার সাহেবের কথাই ধরা যাক। তিনি অসুস্থ শুনলে ভদ্রলোক স্কুল ছুটি দিয়ে সব ছাত্র নিয়ে চলে আসবেন। ডাক্তার বজলুর রহমান...এমনকি বদরুল...

মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণা। একটু আগে লেবুর সরবত খেয়েছেন—এখন আবার পিপাসা বোধ করছেন। শরীরও কাঁপছে। ঘরে থার্মোমিটার থাকলেও জ্বর মাপা যেত। ঘরে কোনো থার্মোমিটার নেই।

মনসুর সাহেব উবু হয়ে বসেছেন—বসার ভঙ্গির জন্যেই কি লিখতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বুকে হাঁপ ধরছে। ধরুক। ঘরে আলো কমে আসছে। আকাশে কি মেঘ আছে। চৈত্র মাসে এসব কি শুরু হল দু'দিন পর পর বৃষ্টি—মনসুর সাহেব অঙ্কের পাশাপাশি লিখলেন—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।

'স্যার কেমন আছেন ?'

মনসুর সাহেব মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন—ফিবোনাক্কি। দিনের বেলা এই প্রথম তাঁর দেখা পাওয়া। বাহ সুন্দর চেহারাতো। এত সুন্দর চোখ। যে কোনো সুন্দর

জিনিস দেখামাত্র হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করে, শুরু চোখ ছুঁতে ইচ্ছে করে না। ফিবোনাক্কি আবার বলল, 'কেমন আছেন স্যার ?'

'ভালো।'

'কাজতো অনেকদূর করেছেন।'

'চেষ্টা করছি।'

'ঐ দু'টা লাইন কি স্যার কবিতা ?'

'হুঁ।'

'হঠাৎ কবিতা লিখলেন যে ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় আপনার এখন বিশ্রাম করা উচিত। শুয়ে থাকুন।'

'শুয়েই তো আছি।'

'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন।'

'অল্প কিছু বাকি আছে ঐটা শেষ হলেই...'

মনসুর সাহেব কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন। ফিবোনাক্কি বলল— 'আমাকে কিছু কাগজ দেবেন স্যার।'

'কি করবে ?'

'নৌকা বানাব। কাগজের নৌকা। ঐদিন নৌকা বানিয়ে খুব আরাম পেয়েছি। আপনি কি স্যার মগরা নদীতে আমার ভাসানো কাগজের নৌকা দেখেছেন ?'

'না।'

'সবগুলি নৌকা যখন চলছিল দেখতে খুব মজা লাগছিল।'

'তোমার কথায় আমার কাজের অসুবিধা হচ্ছে।'

'তাহলে স্যার আর কথা বলব না। আমি যদি নিঃশব্দে নৌকা বানিয়ে যাই তাহলে কি কাজের অসুবিধা হবে ?'

'না।'

'স্যার ঘরে কি মোম আছে।'

'কেন ?'

'নৌকা পানিতে ভাসালে সমস্যা যা হয় তা হল কাগজ ভিজে যায়। কাগজ ভিজে নৌকা পানিতে তলিয়ে যায়। আমি ভাবছি মোম গলিয়ে নৌকার পেছনে লাগিয়ে দেব। তাহলে নৌকা আর ডুববে না।'

'ঘরে মোম নেই।'

'হরমুজকে দিয়ে আনানো যায় না ?'

'ফিবোনাক্কি তুমি আমাকে বিরক্ত করছ।'

'নৌকার নিচটায় মোমতো মাখিয়ে দিলে নৌকা ভারি হবে বাতাসে সহজে দুলবে না।'

'তুমি অকারণ কথা বলছ ফিবোনাক্কি—আমার চিন্তায় অসুবিধা হচ্ছে।'

'আমি খুব দুঃখিত—স্যার 'পাই' সংখ্যাটির রহস্যময়তা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? 'পাই' হল বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত। আপাত দৃষ্টিতে কত সহজ একটা ব্যাপার। আপনার রাশিমালায় এই 'পাই' নিয়ে আসা যায় না...'

'তুমি আমাকে আমার মতো কাজ করতে দাও।'

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'আমার কারোর সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই।'

'স্যার খুব ভুল কথা বলছেন—একা একা আগানো যায় না। আগাতে হলে সাহায্য লাগে...'

'সবার লাগে না। গণিতজ্ঞ এবেলিয়ানের লাগেনি, রামানুজনের লাগেনি, আমার দাদাজানের লাগেনি...

'আপনার দাদাজানকে এঁদের সঙ্গে তুলনা করাটা কি ঠিক হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। তিনি মহান গণিতজ্ঞ ছিলেন—তার প্রতিভা বাইরের কেউ জানতে পারেনি।'

ফিবোনাক্কি হাসছে। শব্দ করে হাসছে। মনসুর সাহেব বললেন, 'হাসছ কেন ?'

'হাসছি কারণ গণিতজ্ঞরা দুর্ভাগা। বেশির ভাগ গণিতজ্ঞের প্রতিভা অজ্ঞাত থেকে গেছে। সেই তুলনায় নিম্নমানের প্রতিভা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।'

'যেমন ?'

'যেমন ধরুন গানের প্রতিভা। একজনের সুন্দর গানের গলা—তার প্রতিভা কখনোই চাপা থাকবে না—সে গান গাইবে। কেউ তা শুনবে। তারা অন্যদের জানাবে—প্রতিভার খবর ছড়াবে জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেসনের নিয়মে—কিন্তু আপনাদের বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন। আপনারা কাজ করবেন সেই কাজ ফাইলবন্দি পড়ে থাকবে। এক সময় ফাইল যাবে হারিয়ে।'

'তুমি আমাকে বিরক্ত করছ ফিবোনাক্কি। তোমার জন্যে আমি কাজ করতে পারছি না।'

'আর বিরক্ত করব না কাজ করুন। আপনার মাথার যন্ত্রণার অবস্থা কি ? এখনো যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বেশি ?'

'হ্যাঁ।'

'হরমুজকে বলুন যন্ত্রণার কোনো ওষুধ নিয়ে আসতে।'

'তুমি আমাকে খুব বিরক্ত করছ।'

'আপনার কষ্ট দেখে খারাপ লাগছে বলেই করছি। আর করব না।'

মনসুর সাহেব লিখে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ আবার সমস্যা করছে—পানি পড়ছে। চোখ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। মাথার যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘুমুতে পারলে ভালো হত। একবার ঘুমুতে গেলে সেই ঘুম আর ভাঙবে না। ঝম ঝম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে না-কি ?

'ফিবোনাক্কি।'

'জ্বি স্যার।'

'বৃষ্টি হচ্ছে না-কি।'

'হচ্ছে স্যার। এই জন্যেইতো নৌকা বানিয়ে এত আরাম পাচ্ছি।'

ফিবোনাক্কি নৌকা বানাচ্ছে। একটা দু'টা না অসংখ্য। দ্রুত বানিয়ে যাচ্ছে। সে ঘর ভর্তি করে ফেলছে কাগজের নৌকায়।

ফিবোনাক্কি গুন গুন করে গাইছে—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান

একই লাইন বার বার, বার বার। গান শুনতে শুনতেই মনসুর সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন।

হরমুজ হেডমাস্টার সাহেবকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে। হেডমাস্টার সাহেব সত্যি সত্যি স্কুল ছুটি দিয়ে এসেছেন। এসেছেন আজিজ খাঁ, বদরুল।

মনসুর সাহেব চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। মুখের কষ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ ধারা। বুক ওঠা নামা করছে। প্রাণ এখনো আছে। কতক্ষণ থাকবে সেটাই কথা।

ঘরময় কাগজ ছড়ানো—লেখা কাগজ, ছেঁড়া কাগজ, আর অসংখ্য কাগজের নৌকা।

আজিজ খাঁ বললেন, 'এসব কি ? কাগজের নৌকা।'

বদরুল বলল, 'স্যারের মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল—আমার কাছ থেকে কাগজ নিতেন—নৌকা বানিয়ে নদীতে ছাড়তেন।'

আজিজ খাঁ হুংকার দিয়ে বললেন, 'আগে বলনি কেন ? কেন আগে বলনি ?'

বদরুল কাঁদছে। তার চোখ দিয়ে টপ টপ পানি পড়ছে। হরমুজ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'এই কাগজগুলাই স্যারের সর্বনাশ করেছে। স্যার দিন রাত লেখতেন—লেখতে লেখতে...'

হেডমাস্টার সাহেব ক্ষিপ্ত গলায় বললেন—'সব কাগজ নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেল। সব কাগজ। একটাও যেন না থাকে। হারামজাদা কাগজ।'

অচেতন অবস্থাতেও মনসুর সাহেব কথা বলার চেষ্টা করলেন—'না না।' বলতে পারলেন না—শুধু তাঁর ঠোঁট কাঁপল।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন—এক্ষুণি উনাকে ঢাকায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এক সেকেন্ডও দেরি করা যাবে না—আশ্চর্য কেউ একজন বললও না লোকটার এই অবস্থা ? আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে...' বলতে বলতে হেডমাস্টার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল—।

আজিজ খাঁ গাড়ি নিয়ে এসেছেন। গাড়ি সরাসরি ঢাকা যাবে। হরমুজ সব কাগজ আগুনে দিয়েছে। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে—

হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে কিছুক্ষণের জন্যে মনসুর সাহেবের জ্ঞান ফিরল। অপরিচিত ঠাণ্ডা ঘর। শরীরে নানা যন্ত্রপাতি লাগানো। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। কয়েকজন ডাক্তার এবং নার্স উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। মনসুর সাহেব ব্যস্ত হয়ে খুঁজলেন ফিবোনাক্কিকে। ঐ তো ফিবোনাক্কি। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করার ক্ষমতা তাঁর নেই—কথাতো অনেক দূরের ব্যাপার। তিনি মনে মনে ডাকলেন—'ফিবোনাক্কি !'

ফিবোনাক্কি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'জ্বি স্যার।'

'ওরা আমার সমস্ত কাগজপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে।'

'স্যার আমি জানি।'

'তুমি কি খুশি হয়েছ ফিবোনাক্কি ?'

ফিবোনাক্কি জবাব দিল না। মনসুর সাহেব বললেন—'আমি তোমাকে আমার কল্পনার একটি অংশ ভেবে ভুল করেছিলাম। তুমি আমার কল্পনার অংশ নও। তুমি আসলেই শূন্য জগতের কেউ।'

'স্যার আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'তোমাকে পাঠানো হয়েছিল আমার কাজ নষ্ট করে দেয়ার জন্যে।'

'জ্বি স্যার।'

'যখন বুঝতে পারলাম তখন আর করার কিছু নেই। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাচ্ছি তাই না ফিবোনাক্কি।'

'স্যার আমার তাই ধারণা।'

'মৃত্যু কেমন ফিবোনাক্কি?'

'মৃত্যু কেমন আমি বলতে পারছি না স্যার। আমাদের জগতে মৃত্যু নেই। আমরা বাস করি মৃত্যুহীন জগতে।'

'ও।'

'আমরা যদি আমাদের জগতটাকে সুরক্ষিত রাখতে চাই সেটা কি অন্যায়?'

'না অন্যায় নয়।'

'পৃথিবীর মানুষরা আমাদের জগতে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে। তারা শূন্যের রহস্য একবার ধরে ফেললে আমাদের কি হবে? আমরা থাকতে চাই আমাদের মতো। সেখানে কারোরই প্রবেশাধিকার নেই। আমরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করতে দেব না। যারাই এই চেষ্টা করবে তাদেরই আমরা দূরে সরিয়ে দেব। তাদের কাজ নষ্ট করে দেব।'

'আমি এখন তোমাদের রহস্য জানি। আমিতো সমাধান করেছি।'

'স্যার আমি জানি। এই জন্যেইতো আপনার কাজ পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'আমাতেই তো সব শেষ হচ্ছে না। আবারো একজন আসবেন।'

'আমরা লক্ষ রাখি। কিছুই আমাদের লক্ষের বাইরে নয়।'

মনসুর সাহেবের ঘুম পাচ্ছে। চোখ আর মেলে রাখতে পারলেন না। মনে হচ্ছে এটাই শেষ ঘুম। ফিবোনাক্কি বলল—'স্যার শুনুন।' তিনি বললেন, 'শুনছি।'

'আমাকে ক্ষমা করে দিন স্যার। আমি যা করেছি আমার জগতের দিকে তাকিয়ে করেছি। আপনিও নিশ্চয়ই আপনার পৃথিবী, আপনার প্রিয় জগৎ রক্ষার জন্যে যা করণীয় তা করবেন। করবেন না স্যার?'

'হ্যাঁ করব।'

'স্যার আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্যে।'

'আমার সময় শেষ—এই শেষ সময়ে তুমি কি করবে?'

'আপনার মস্তিষ্কে অনেক সুখ স্মৃতি আছে। তার একটি দেখতে দেখতে যেন আপনার জীবনের ইতি হয় সেই ব্যবস্থা করব।'

'তার প্রয়োজন নেই ফিবোনাক্কি!'

'আপনার জন্যে কিছু একটা করতে ইচ্ছা হচ্ছে স্যার। আমাকে দয়া করে অনুমতি দিন—আপনার মস্তিষ্কের অতি গোপন একটা জায়গা থেকে মিষ্টি একটা

স্মৃতি আমি বের করে আনি—আপনার ভালো লাগবে। আপনার খুব ভালো লাগবে।...'

মনসুর সাহেব কিছু বলার আগেই ঝমঝম শব্দ শুনতে পেলেন। বৃষ্টির শব্দ। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে। তিনি দেখলেন—তিনি তাদের গ্রামের বাড়িতে শোবার ঘরে আধাশোয়া হয়ে আছেন। হাতে একটা বই। গভীর রাত। পাশের টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের ক্ষীণ আলোয় তিনি বৃষ্টির রাতে বই পড়ছেন—দরজা ঠেলে কে ঢুকছে ? আরে রূপা না ! হাঁ রূপা। তাঁর কিশোরী বধূ। আহা কতদিন পর দেখলেন রূপাকে। এত সুন্দর মেয়ে। এত মিষ্টি চেহারা। রূপা বলল—'এই বৃষ্টি হচ্ছে ! বৃষ্টিতে ভিজবে ?'

'না না—পাগল হয়েছ দুপুর রাতে বৃষ্টিতে ভিজব কি ? তোমার কি সব পাগলামি।'

রূপা মন খারাপ করে বসে আছে। তার চোখ ভিজে উঠেছে। ফিবোনাক্কি এই স্মৃতি কেন দেখাল ? এই স্মৃতি তাঁর জীবনের দুঃখময় স্মৃতির একটি। তিনি সে রাতে স্ত্রীর সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে যাননি। এইসব ছেলেমানুষি তার চরিত্রে ছিল না।

তিনি দেখছেন অভিমানে রূপার চোখ ভিজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তখন তিনি বই ফেলে দিয়ে বললেন—'চল যাই ভিজি। রূপা আনন্দে হেসে ফেলল।'

ঘটনা এ রকম ঘটে নি। তিনি রূপাকে অগ্রাহ্য করে সে রাতে বই পড়েছেন—এখানে ঘটনা বদলে যাচ্ছে। ফিবোনাক্কি তাঁর স্মৃতি পাল্টে দিচ্ছে—

তিনি দেখছেন—রূপাকে নিয়ে উঠোনে নেমে গেছেন। ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রূপা হাসছে খিলখিল করে...আহ কী সুন্দর স্মৃতি—কী মধুর স্মৃতি। ফিবোনাক্কি চমৎকার একটি স্মৃতি তৈরি করে তাঁকে উপহার দিচ্ছে। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন—'ধন্যবাদ ফিবোনাক্কি। ধন্যবাদ।'

রূপার হাত ধরে তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় দেখছেন জলভেজা আশ্চর্য মায়াবী এক মুখ...তিনি আবারো বললেন—'ধন্যবাদ ফিবোনাক্কি।'

নি

নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার মবিনুর রহমান, বি.এসসি. (অনার্স), এম. এসসি. (প্রথম শ্রেণী) খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। বয়স ছত্রিশ/ সাতত্রিশ, রোগা লম্বা। গলার স্বরে কোনরকম কোমলতা নেই। ভদ্রলোক এমনভাবে তাকান যাতে মনে হতে পারে যে সমস্ত পৃথিবীর উপর তিনি বিরক্ত। কোন কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি আরাম পাবেন।

এম.এসসি. পাস করার পর সব মিলিয়ে আঠারো বার তিনি চাকরির ইন্টারভ্যু দিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটল তা হচ্ছে—তিনি ইন্টারভ্যু দিতে ঢুকলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, বসুন।

তিনি বসলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার নাম ?

মবিনুর রহমান সহজ গরায় বললেন, নাম তো আপনি জানেন। এই নামেই ডেকে পাঠালেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

'আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

তিনি শান্ত মুখে উঠে চলে এলেন।

এ জাতীয় মানুষদের কোন চাকরি-বাকরি হবার কথা না। তবে মবিনুর রহমান হাল ছাড়লেন না। দু'বছর চেষ্টা করলেন, প্রাণপণ চেষ্টা। 'ইন্টারভ্যু গাইড' নামের সাতশ একুশ পৃষ্ঠার একটা বই প্রায় মুখস্থ করে ফেললেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ন্যাটো চুক্তিভুক্ত দেশের নাম, কোন কোন বছর সাহিত্যে নবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি, আমেরিকান সব প্রেসিডেন্টের নাম এবং বংশ পরিচয়—পাঠ্য তালিকা থেকে কিছুই বাদ গেল না। খুব ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হয়েও মায়ের পীড়াপীড়িতে সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল এবং হযরত শাহ্ পরাণের মাজার জিয়ারত করে এলেন। রাজশাহীতে গিয়ে জিয়ারত করলেন শাহ মখদমের মাজার। এই তিন মহাপুরুষের কল্যাণেই হয়তবা তিনি নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচারের চাকরিটা পেয়ে গেলেন। অবশ্যি এই চাকরি পাওয়ার পেছনে অন্য একটি কারণ থাকতে পারে। এই চাকরির জন্যে তাঁকে ইন্টারভ্যু দিতে হয়নি। কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের চাকরির নিয়োগপত্র এবং দু'কেজি মিষ্টি নিয়ে তিনি কুমিল্লার মতলবে তাঁর মা'কে দেখতে গেলেন। মা তখন রোগে শয্যাশায়ী। মবিনুর রহমানের চাকরির খবরে তাঁকে মোটেই আনন্দিত মনে হল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বরলেন, শেষ পর্যন্ত স্কুল মাস্টার ?

মবিনুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, স্কুল মাস্টারি খারাপ কিছু না। নাও, মা মিষ্টি খাও।

'আমি মিষ্টি খাব না, বাবা। তুই খা।'

'মিষ্টি না খেলে মনে কষ্ট পাব, মা।'

ভদ্রমহিলা ছেলেকে মনোকষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য মিষ্টি খেলেন। এই মিষ্টিই তাঁর কাল হল। ভোরবেলা পেট নেমে গেল। সন্ধ্যার মধ্যে মৃত্যু।

আশেপাশের সবাই সান্ত্বনা দিতে ছুটে এসে দেখে মবিনুর রহমান পাথরের মত মুখ করে মিষ্টি খাচ্ছে। নিতান্তই অস্বাভাবিক দৃশ্য কিন্তু আসলে তেমন অস্বাভাবিক নয়। মিষ্টিই তার মা'র মৃত্যুর কারণ কি-না এটাই মবিনুর রহমান পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দু'কেজি কালোজাম খেয়েও তার যখন কিছু হল না তখন তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হলেন —বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুতে খুব বেশি দুঃখিত হবার কিছু নেই। প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মরতে হবে। তবে এই মৃত্যু মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয়। মানুষের শরীরের অযুত, কোটি, নিযুত ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস যেমন—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন—এদের কোন বিনাশ নেই। এরা থেকেই যাবে। ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। কাজেই মানুষের মৃত্যুতে খুব বেশি কষ্ট পাবার কিছু নেই।

মবিনুর রহমান তাঁর বসতবাড়ি এবং অল্প যা জমিজমা ছিল বিক্রি করে দিয়ে নীলগঞ্জ চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে দুই ট্রাংক বই, একটা ম্যাকমিলন কোম্পানির দূরবীন। দূরবীনটা ঢাকা থেকে অনেক দাম দিয়ে কেনা। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর শখ ছিল ভাল একটা দূরবীন কেনা। টাকার অভাবে কেনা হয়নি। জমি বিক্রির টাকাটা কাজে লাগল। এই সঙ্গে একটা মাইক্রোসকোপ কিনতে পারলে হত। টাকায় কুলালো না।

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে মবিনুর রহমানের আট বছর কেটে গেছে। শুরুতে তাঁকে যতটা বিচিত্র বলে মনে হয়েছিল এখন আর ততটা মনে হয় না। মবিনুর রহমান বদলান নি, আগের মতই আছেন। ছাত্ররা এবং সহকর্মী শিক্ষকরা তাঁর আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এইটুকু বলা যায়। তাঁর আচার-আচারণের সামান্য নমুনা দেয়া যাক।

তাঁর বুক পকেটে সব সময় একটা গোলাকার নিকেলের ঘড়ি থাকে। নীলগঞ্জে আসার আগে চৌদ্দশ টাকায় ইসলামপুর থেকে এই ঘড়িটা কেনা হয়েছে। সাধারণ ঘড়ি নয়—একের ভেতর তিন। ঘড়ির সঙ্গে আছে স্টপ ওয়াচ এবং একটি আর্দ্রতা মাপক কাঁটা।

ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়া মাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন যদি তাঁর কপাল কুঁচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমত পড়েনি। দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যেমন—আজ বাতাসের আর্দ্রতা ৭৭ পারসেন্ট। বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা। আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী খুব লেগে যায়। তিনি বৃষ্টি হবে বলেছেন অথচ বৃষ্টি হয়নি এমন কখনো দেখা যায়নি।

তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। হাসা যায় না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া যায় না, খাতায় কাটাকুটি খেলা যায় না। মনের ভুলেও কেউ যদি হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব হয়ে দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন গলায় বলেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়বার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অংক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ?

মবিনুর রহমান স্কুল থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে দু'কামরার একটা পাকা ঘরে একা বাস করেন। ঘরটি জরাজীর্ণ। ভেঙে পড়তে পড়তেও কেন জানি পড়ছে না। ছোটখাটো ভূমিকম্প কিংবা দমকা বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। বাড়িটি সাপের আড্ডাখানা। বর্ষাকালে যেখানে-সেখানে সাপ দেখা যায়। বাড়ির মালিক কালিপদ রূপেশ্বর স্কুলের দপ্তরি। সাপের ভয়েই সে পূর্বপুরুষের ভিটায় বাস করে না। সাপের কামড়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রথম সন্তান মারা গেছে। মবিনুর রহমান সেই বাড়িতে সুখেই আছেন। স্বপাক আহার করেন। তাঁকে নিরামিষভোজী বলা চলে। মাছ মাংস খান না। না খাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ-মাংস রাঁধতে জানেন না। তাঁর বাড়িটা রূপেশ্বর নদীর ধারে। শীতকালে এই নদীতে পায়ের পাতাও ভিজে না। বর্ষাকালে কিছু পানি হয়। গত বর্ষায় মবিনুর রহমান দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটা নৌকা কিনেছেন। নৌকার কোন মাঝি নেই। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। মাঝে মাঝে তিনি নৌকার ছাদে সারারাত বসে থাকেন। নৌকার ভেতরটাও সুন্দর। ঘরের মত। দু'দিকে দরজা আছে। বাথরুম আছে। বিছানা বালিশ দিয়ে ভেতরটা চমৎকার গোছানো। মবিনুর রহমারেন প্রিয় কিছু বই নৌকায় থাকে। অধিকাংশই গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক বই।

এই জাতীয় আধাপাগল নিঃসঙ্গ মানুষকে সবাই খানিকটা ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে।মবিনুর রহমানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই অঞ্চলের মানুষদের প্রচুর ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। এই ভালবাসা পাবার পেছনের আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি শিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর। ইতিমধ্যেই অংকের ডুবো জাহাজ হিসেবে তাঁর খ্যাতি রটেছে। ডুবো জাহাজ নামকরণের রহস্য হচ্ছে তিনি যে খুব ভাল অংক জানেন এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল।

সেকেন্ড পিরিয়ডে মবিনুর রহমানের কোন ক্লাস নেই। তিনি টিচার্স কমনরুমে তাঁর নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর বুক পকেটের ঘড়ি শতকরা আশি ভাগ হিউমিডিটির কথা বলছে। কিন্তু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। মবিনুর রহমানের ভুরু কুঁচকে আছে এই কারণে। কমনরুমে আরো কিছু শিক্ষক আছেন। তাঁরা সরকারি ডিএ নিয়ে আলাপ করছেন। এবারের সরকারি সাহায্য এখানো এসে পৌছায়নি। মবিনুর রহমান এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন না। কখনোই করেন না। স্কুলের ধর্ম ও আরবি শিক্ষক জালালুদ্দিন সাহেবের চেয়ার মবিনুর রহমানের চেয়ারের ঠিক পাশেই। পাশাপাশি বসতে হয় বলেই বোধ হয় দু'জনের মধ্যে সামান্য সখ্যতা আছে। জালালুদ্দিন সাহেব মবিনুর রহমানকে তুমি তুমি করে বলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে যে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার প্রচুর কৌতূহল। তা ঠিক না। কোন বিষয় সম্পর্কেই তাঁর কোন আগ্রহ নেই। ভদ্রলোক কোন ক্লাসই ঠিকমত নেন না। আজও ক্লাস শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে বের হয়ে এলেন। মবিনুর রহমানের পাশে বসতে বসতে মধুর গলায় বললেন, তারপর মবিন, তোমার সায়েন্সের খবর কি ?

'কোন খবরটা জানতে চান ?'

'বৃষ্টি হবে কি হবে না ?'

'বৃষ্টি হবে। হিউমিডিটি ৮০।'

জালালুদ্দিন পানের কৌটা খুলতে খুলতে বললেন, বৃষ্টি যে হবে এটা বলার জন্য তোমার সায়েন্স লাগে না। আষাঢ় মাস, বৃষ্টি তো হবেই। পান খাবে না-কি ?

'জ্বি-না।'

'খাও একটা। জর্দা দেয়া আছে। আকবরি জর্দা। অতি সুঘ্রাণ।'

'আমি পান খাই না।'

'এমনভাবে তুমি কথাটা বললে যেন পান খাওয়া বিরাট অপরাধ। পান খাওয়া কোন অপরাধ না। এটা হজমের সহায়ক। দাঁত ভাল থাকে।'

জালালুদ্দিন একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিলেন। আঙুলের ডগায় চুন নিতে নিতে বললেন, আচ্ছা মবিন, এই যে পানের সঙ্গে আমরা চুন খাই। কেন খাই? তোমার সায়েন্স কি বলে?

'আপনি সত্যি জানতে চান?'

'অবশ্যই চাই। আরবি পড়াই বলে সায়েন্স জানব না? সায়েন্সের সঙ্গে এরাবিকের তো কোন বিরোধ নাই।'

মবিন শীতল গলায় বললেন, পানের সঙ্গে চুন কেন খাওয়া হয় আমি ব্যাখ্যা করছি। মন দিয়ে শুনুন।

'শুনছি। তুমি হাসি মুখে বল। মুখ এমন শুকনো করে রেখেছ কেন?'

মবিনুর রহমান ক্লাসে বক্তৃতা দেয়ার ঢং-এ বললেন,

'শুধু শুধু পান চিবুলে দেখবেন টকটক লাগছে। টক লাগার কারণ হচ্ছে পানে আছে এক ধরনের এ্যাসিড বা অম্ল। অম্ল টক স্বাদযুক্ত, চুন হচ্ছে এক জাতীয় ক্ষার। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। এই ক্ষার অম্লকে প্রশমিত করে। এই জন্যেই পানের সঙ্গে চুন খেতে হয়।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। ভাল কথা। অম্ল এবং ক্ষার। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে একটা খটকা ছিল। আচ্ছা, এখন বল তো দেখি, তেঁতুলের সঙ্গে চুন মিশালে কি তেঁতুলের টক-ধর্ম চলে যাবে?'

মবিনুর রহমান চুপ করে রইলেন। এই বিষয়টা তাঁর জানা নেই। অনুমানের উপর কিছু বলা ঠিক হবে না। বিজ্ঞান অনুমানের উপর চলে না। পরীক্ষা করে তারপর বলতে হবে।

জালালুদ্দিন পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, কি কথা বলছ না কেন? কি হবে তেঁতুলের সঙ্গে চুল মেশালে?

'কাল আপনাকে বলব।'

'কাল কেন? আজই বল।'

'আজ বলতে পারব না। পরীক্ষা করে তারপর বলব।'

'একদিন যাব তোমার বাড়িতে। তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাব।'

'দূরবীনের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, দূরবীন। বৃহস্পতির বলয় না-কি দেখা যায়, হেড স্যার বলছিলেন।'

'হ্যাঁ দেখা যায়। চৈত্র মাসে দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাস আসুক, আপনাকে দেখাব।'

মবিনুর রহমান উঠে পড়লেন। তাঁর ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়বার আগেই ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দীর্ঘ আট বছরের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা ঠিক না।

ক্লাস টেন, সেকশান বি-র সঙ্গে ক্লাস। পড়বার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলো। আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং বস্তু। কি অসাধারণ ব্যাপার। ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবশ্যি এইসব বুঝবে না, তবে বড় হয়ে যখন বুঝবে তখন চমৎকৃত হবে।

মবিনুর রহমান ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আজ বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা আশি। যদিও বাইরে রোদ দেখা যাচ্ছে তবু আমার ধারণা সন্ধ্যানাগাদ বৃষ্টিপাত হবে। এখন তোমরা বল আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে কত ? যারা জান ডান হাত তোল। যারা জান না বাঁ হাত তোল।

সাতজন ছেলে ডান হাত তুলল। মবিনুর রহমানের মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই ডান হাত তুলবে। মাত্র সাতজন ? ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না ? তা কি করে হয় ?

'তুমি বল, আলোর গতিবেগ কত ?'

'প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, স্যার।'

'ভেরি গুড। এখন তুমি বল—হ্যাঁ, তুমি ইয়েলো শার্ট, তুমি বল আলোর গতি কি এরচে' বেশি হতে পারে ?'

'জ্বি-না স্যার।'

'কেন পারে না ?'

'এটাই স্যার নিয়ম।'

'কার নিয়ম ?'

'প্রকৃতির নিয়ম।'

'ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যার কখনো কোন ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেমন ধর মাধ্যাকর্ষণ। একটা পাকা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তা পড়বে মাটিতে। আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার ?'

'জ্বি স্যার।'

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক কে ?'

'নিউটন।'

'নামটা তুমি এমনভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম, বজলু-ফজলু। নাম উচ্চারণে কোন শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম বল।'

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

মবিনুর রহমান শুকনো মুখে বললেন, একজন অতি শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে আজ বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের বার প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দু'টি অংক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ?

ফোর্থ পিরিয়ড শেষ হবার আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। ঝুম বৃষ্টি নামল ক্লাসের শেষ ঘণ্টার পর। ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত বৃষ্টি। মবিনুর রহমান টিচার্স কমনরুমে বসে রইলেন। স্কুল ফাঁকা হতে শুরু করেছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই সবাই নেমে পড়ছে। পুরো স্কুলে এখন মানুষ আছে তিনজন। দপ্তরি কালিপদ, মবিনুর রহমান এবং ক্লাস টেনের হলুদ শার্ট গায়ে দেয়া ছাত্র মফিজ। বার প্রশ্নমালার অংক দু'টি সে কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না।

মবিনুর রহমান চুপচাপ তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তিনি তাকিয়ে আছেন বৃষ্টির দিকে। তাঁর মন বেশ খারাপ। গত দশদিন ধরেই রোজ সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। দূরবীন দিয়ে আকাশ দেখা হচ্ছে না। বর্ষাকালের মেঘমুক্ত আকাশ দূরবীন দিয়ে দেখার জন্যে খুব ভাল। আকাশে ধুলোবালি থাকে না। অনেক দূরের নক্ষত্রও স্পষ্ট দেখা যায়।

মবিনুর রহমান উঁচুগলায় ডাকলেন, কালিপদ।

কালিপদ ছুটে এল।

'মফিজ নামের ছেলেটাকে দু'টা অংক করতে দিয়েছিলাম, অংক হয়েছে কি-না খোঁজ নিয়ে আস।'

'জ্বি, আচ্ছা স্যার।'

'তুমি স্কুল বন্ধ করে চলে যাও। আমার প্রাইভেট টিউশ্যানি আছে। সন্ধ্যাবেলা স্কুল থেকে যাব। আমি তালা দিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

কালিপদ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল, ছেলেটির অংক দু'টা এখনো হয় নি। মবিনুর রহমান তাঁর সামনের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সাদা কাগজ বের করলেন। অতি দ্রুত সেই কাগজে অংক দু'টি করলেন। কাগজের এক মাথায় লিখলেন—মফিজ, তুমি আরো মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। প্রকৃতি তোমাকে যে মস্তিষ্ক দিয়েছে তা প্রথম শ্রেণীর। সেই মস্তিষ্ক ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য।

'কালিপদ, ছেলেটাকে এই কাগজটা দিয়ে আস। সে যেন দেখে দেখে অংক দু'টা বোর্ডে করে রাখে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'অংক করা হলে তাকে চলে যেতে বল।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

স্কুলঘর এখন পুরো ফাঁকা। মবিনুর রহমান চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে তখন বাজে ছ'টা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি দু'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা—এই চার ঘণ্টা তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাতাসে মাথার চুল না নড়লে তাঁকে মূর্তি বলেই মনে হত। দীর্ঘ সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার এই ব্যাপারটা শুধু কালিপদ জানে। সে কাউকে তা বলেনি। মাঝে মাঝে এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় করে। অথচ মানুষটা ভাল। প্রতি মাসের তিন তারিখে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা তাকে দিচ্ছে। তবে কালিপদের ধারণা এই বর্ষাকালেই মানুষটা সাপের কামড়ে মারা যাবে। বাড়ি ভাড়া হিসেবে ১০০ টাকা আসা বন্ধ হতে বেশি দেরি নেই।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় মবিনুর রহমান এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনীব্যক্তি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, স্কুল কমিটির মেম্বার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আফজাল সাহেবের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আফজাল সাহেবের বড় মেয়ে রূপাকে গত ছ'মাস ধরে তিনি পড়াচ্ছেন। রূপা এই বছর এস.এস.সি. দেবে। গত বছর দেবার কথা ছিল, টাইফয়েড হওয়ায় দিতে পারেনি। এবার দিচ্ছে। রূপার ধারণা এবারো সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। পরীক্ষার ঠিক আগে চিকেন পক্স কিংবা হাম হবে। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী তবে পড়াশোনায় মন নেই। কখনো সময়মত আসবে না। এমনও হয়েছে তিনি আধঘণ্টা বসে আছেন রূপার দেখা নেই।

আজ অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার এই বৃষ্টির মধ্যে আসছেন। আমি ভাবলাম, আসবেন না।

মবিনুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, ঝড়বৃষ্টির জন্যে আসিনি এরকম কি কখনো হয়েছে?

'একবার হয়েছে স্যার। মে মাসের দু' তারিখে আপনি আসেননি। ঝড় হচ্ছিল তাই আসেননি।'

মবিনুর রহমান চুপ করে গেলেন। কথা সত্যি। মে মাসের দু' তারিখে তিনি আসেননি। মেয়েটা এটা মনে করে রাখবে তা ভাবেননি। এই মেয়ের অনেক

কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। যেমন, মাঝে মাঝে সে পড়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি বিরক্ত হয়ে যখন ধমক দেন—কি ব্যাপার, পড়ছ না কেন ? তখনো চোখ নামিয়ে নেয় না। ক্লান্ত গলায় বলে, আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না, স্যার। আজ আপনি যান। বলেই অতি অভদ্রের মত উঠে চলে যায়।

রূপা বলল, স্যার, একটা গামছা এনে দেই। মাথাটা মুছে ফেলুন, মাথা ভিজে গেছে।

'অসুবিধা হবে না—তুমি অংক নিয়ে বস। বার প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দু'টা অংক কর তো দেখি পার কি-না।'

রূপা নিমিষেই অংক দু'টা করে ফেলল। মবিনুর রহমান মনে মনে বললেন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই মেয়েটির সঙ্গে বেশির ভাগ কথাই তিনি মনে মনে বলেন।

'স্যার, অংক দু'টা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা শোন, তোমাদের বাসায় কি তেঁতুল আছে ?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'একটা পিরিচে করে সামান্য তেঁতুল আর খানিকটা চুন আন। পান খাওয়ার চুন।'

'কি করবেন স্যার ?'

'ছোটখাটো একটা এক্সপেরিমেন্ট। পিরিচটা দিয়ে তুমি এ্যালজেব্রা নিয়ে বস। কাল করেছিলে দশ প্রশ্নমালা। আজ এগারো।'

রূপা উঠে চলে গেল। ফিরতে অনেক দেরি করল। মেয়েটার এই এক অভ্যাস—একবার উঠে গেলে ফিরতে অনেক দেরি করে। মবিনুর রহমান বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এবার নিশ্চয় বন্যা হবে। এক বছর পর পর দেশে বন্যা হচ্ছে। গত বছর হয়নি। এবার তো হবেই।

'স্যার, নিন তেঁতুল। খানিকটা লবণও নিয়ে এসেছি। স্যার লবণ লাগবে ?'

'না। তোমাকে তো লবণ আনতে বলিনি। তুমি এ্যালজেব্রা নিয়ে বস।'

মবিনুর রহমান আঙুল দিয়ে ডলে ডলে চুন এবং তেঁতুল মেশাচ্ছেন। রূপা নিঃশব্দে অংক করে যাচ্ছে। মবিনুর রহমান এক সময় হঠাৎ লক্ষ করলেন, রূপা অংক করা বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘোর-লাগা চোখের দৃষ্টি।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, কি ব্যাপার, কি দেখছ ? অংক কর।

'আজ আর করব না, স্যার।'

'কেন ?'

'ভাল লাগছে না।'

রূপা তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মবিনুর রহমান চুন মেশানো তেঁতুল খানিকটা জিভে লাগালেন। তিতা তিতা লাগছে। টক ভাব এখনো আছে। অম্ল এবং ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। আরো খানিকটা চুন মেশানো দরকার। এবং একটু বোধ হয় গরম করা দরকার।

'রূপা !'

'জ্বি স্যার।'

'আরেকটু চুন এনে দাও তো।'

রূপা উঠে দাঁড়াল। ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা স্যার, আমার মধ্যে কি কোন পরিবর্তন লক্ষ করেছেন ?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি পরিবর্তন ?

'সত্যি লক্ষ করেননি ?'

'না তো।'

'প্রথম আমার গায়ে ছিল সবুজ রঙের একটা শাড়ি। এখন একটা ডোরাকাটা শাড়ি। যখন তেঁতুল আনতে বললেন, তখন শাড়ি বদলালাম।'

'ও।'

'সবুজ শাড়িটা ময়লা ছিল তো তাই বদলেছি।'

'ও আচ্ছা।'

চুন নিয়ে রূপা এল না। একটা কাজের মেয়ে একগাদা চুন দিয়ে গেল। সরু গলায় বলল, আপার মাথা ধরছে আইজ আর পড়ব না।

'আচ্ছা।'

'আম্মা আফনেরে ভাত খাইয়া যাইতে বলছে।'

'না, ভাত খাব না। চলে যাব। শোন, আমি তেঁতুল আর চুন নিয়ে যাচ্ছি, কেমন ? ঘরে বাড়তি ছাতা থাকলে আমাকে একটা ছাতা দাও।'

বাড়তি ছাতা ছিল না।

মবিনুর রহমান বাড়িতে ফিরলেন কাকভেজা হয়ে। নদীর পাশ ঘেঁষে বাড়ি ফেরার রাস্তা। নদী ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়েছে। কান পাতলেই নদীর ভেতর থেকে আসা হুঁ-হুঁ গর্জন শোনা যায়। খানিকটা ভয় ভয় লাগে। শুধু ভয় না। ভয়ের সঙ্গে এক ধরনের আনন্দও মেশানো থাকে।

মবিনুর রহমান বাড়ি ফিরেই রান্না চড়ালেন। হাঁড়িতে দু'ছটাক আন্দাজ পোলাওয়ের চাল, মুগের ডাল, কয়েক টুকরা আলু এবং তিন চামচ ঘি। অল্প আঁচে অনেকক্ষণ সিদ্ধ হবে। এক সময় অতি সুস্বাদু ঘন স্যুপের মত একটা

জিনিস তৈরি হবে। গরম গরম খেতে চমৎকার লাগবে। ডিম থাকলে ভাল হত। ডিমটাও ছেড়ে দেয়া যেত। প্রোটিন কম খাওয়া হচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই। মনে হচ্ছে আকাশটা যেন অনেক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান একটা টর্চ এবং ছাতা হাতে ঘরে তালা দিয়ে বের হলেন। আজ রাতটা তিনি নৌকায় কাটাবেন। নৌকায় বিছানা বালিশ সবই আছে। প্রশস্ত পাটাতনে তোষক বিছানো। দু'পাশের দরজা লাগিয়ে নৌকায় শুয়ে থাকলে চমৎকার লাগবে। সারারাত নদীতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাবে। বাতাসে নৌকা এপাশ-ওপাশ করবে। চারদিকে থাকবে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাবে। সেই বিদ্যুৎ চমকে চারদিক আলো হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

মবিনুর রহমান নৌকার বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় ঘুম, এত গাঢ় যেন মৃত্যুর কাছাকাছি। এই ঘুমের মধ্যেই তিনি অতি বিচিত্র একটি স্বপ্ন দেখলেন। যেন কয়েকজন বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সবার চেহারা এক রকম। তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিও এক রকম। সবার মুখেই এক ধরনের প্রচ্ছন্ন হাসি। সেই হাসি একই সঙ্গে কঠিন এবং কোমল। তাঁরা কথা বলতে শুরু করলেন।

সবাই এক সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের গলার স্বর এক রকম। সবাই এক সঙ্গে কথা বলার জন্যেই বোধ করি এক ধরনের অস্বাভাবিক রেজোনেন্স তৈরি হচ্ছে। শব্দটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরের প্রতিটি কোষ ঝনঝন করে বাজছে। তার চেয়েও বড় কথা, ঘুমের মধ্যেই মবিনুর রহমানের মনে হল এই বৃদ্ধদের তিনি আগেও স্বপ্ন দেখেছেন। অতি দূর শৈশবে। যার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে হলেও রয়ে গেছে।

'মবিনুর রহমান !'

'জ্বি।'

'তুমি কি মাতৃগর্ভের স্মৃতি মনে করতে পারছ ?'

'না।'

'মাতৃগর্ভে যখন ছিলে তখন চারদিকে ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এখনো কি চারদিকে অন্ধকার নয় ?'

'হ্যাঁ।'

'মাতৃগর্ভে তুমি এক ধরনের তরল পদার্থের উপর ভাসছিলে—যাকে তোমরা বল এমনোটিক ফ্লুয়িড। এখনো তুমি ভাসছ পানির উপর। দোল খাচ্ছ। খাচ্ছ না ?'

'জ্বি।'

'খানিকটা হলেও মাতৃগর্ভের মত অবস্থা তৈরি হয়েছে। নয় কি?'

'হ্যাঁ, তৈরি হয়েছে। আপনারা কে?'

'আমরা হচ্ছি—নি।'

'নি?'

'হ্যাঁ—নি। আমরা স্বপ্ন তেরি করি।'

'বুঝতে পারছি না।'

'এখন বুঝতে না পারলেও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। আমরা তোমাকে বুঝতে সাহায্য করব। তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই আমরা এসেছি। তুমি আমাদেরই একজন।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তুমিও একজন—নি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তোমার মধ্যে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। তুমি এই ক্ষমতা ব্যবহার কর।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মন দিয়ে শোন—তোমার ভেতর আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। অকল্পনীয় ক্ষমতা। ক্ষমতা ব্যবহার কর। স্বপ্ন দেখ। স্বপ্ন দেখ।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

মবিনুর রহমান ঘুমের ঘোরেই কাতর শব্দ করলেন, তারপর তলিয়ে গেলেন গভীর ঘুমে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারদিক আলো হয়ে আছে। অনেক বেলা হয়েছে, কড়া রোদ। দীর্ঘ আট বছর পর এই প্রথম মবিনুর রহমানের মনে হল আজ স্কুলে না যেয়ে সারাদিন নৌকায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন হয়?

নীলগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব একটা ছোট সমস্যা নিয়ে বিব্রত। সমস্যাটির বয়স সাত মাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যাই খানিকটা পাতলা হয়। তাঁরটা হচ্ছে না। বরং খানিকটা ঘোরালো হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা এ রকম—ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে গত মাসে নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে পঞ্চাশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। তিনি মবিনুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে গম আনতে গেলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা সমস্যা হয়েছে হেড মাস্টার সাহেব।

তিনি বললেন, কি সমস্যা ?

'পঞ্চাশ বস্তা গম তো আপনাকে দিতে পারছি না। দশ বস্তা নিয়ে যান।'

'দশ বস্তা ?'

'হ্যাঁ, দশ। আর ক্যাশ টাকা দিচ্ছি পাঁচ হাজার।'

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, খাতায় সই করতে হবে পঞ্চাশ বস্তা গম ?

'হ্যাঁ। নানান ফ্যাকরা রে ভাই। সাহায্যের গম বার ভূতে লুটে খাচ্ছে। সৎভাবে কিছু করব তার উপায় নেই। আপনি তো সবই বুঝেন। বুঝেন না ?'

'জ্বি-বুঝব না কেন ?'

'দশ বস্তা গম নিয়ে যান। আর নিতে যদি না চান কোন অসুবিধা নেই। আমরা অন্য প্রোগ্রামে ট্রান্সফার করে দেব। নেবেন, না নেবেন না ?'

'নিব।'

'আসুন তাহলে খাতায় সই করুন।'

হেড মাস্টার সাহেব বিচক্ষণ লোক। নিজে সই করলেন না, মবিনুর রহমানকে সই করতে বললেন। তিন মাস পর উপর থেকে চিঠি এল—বিশেষ ব্যবস্থায় নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে যে একশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল তা কিভাবে খরচ হয়েছে ? উন্নয়নের কোন কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা যেন অতি সত্বর জানানো হয়।

হেড মাস্টার সাহেব ছুটে গেলেন উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে। আমতা আমতা করে বললেন, একশ বস্তা গমের কথা কিভাবে এল স্যার ?

চেয়ারম্যান সাহেব হাই তুলে বললেন, কাগজপত্রে তাই লেখা আছে, আপনি নিজে সই করে নিয়েছেন।

'আমি সই করিনি স্যার, মবিনুর রহমান করেছে।'

'মবিনুর রহমানটা কে ?'

'আমাদের স্কুলের সায়েন্স টিচার।'

'তাহলে তো আপনি বেঁচেই গেলেন। তদন্ত কমিটি করে দেন। ব্যাটার চাকরি চলে যাক। সব সমস্যার সমাধান। নতুন টিচার নিয়ে নেবেন। বাংলাদেশে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের কোন অভাব নেই। আমার এক ভাইস্তা আছে বি.এসসি. পাস করে ঘুরছে, তাকেও নিতে পারেন।'

হেড মাস্টার সাহেব মুখ শুকনো করে বসে রইলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব চা এবং কেক খাওয়ালেন। কোন কিছুই তাঁর মুখে রুচল না।

হেড মাস্টার সাহেব তদন্ত কমিটি তৈরির ব্যাপারটা অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার "অতি

জরুরি" সিল মেরে চিঠি পাঠিয়েছেন। আর দেরি করা যায় না। হেড মাস্টার সাহেব জালালুদ্দিন সাহেবকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। সরু গলায় বললেন, জালাল সাহেব, আপনাকে তো একটা অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটা তদন্ত কমিটি হচ্ছে, আপনি তার চেয়ারম্যান, তিনজন মেম্বার। আফজাল সাহেব, সেক্রেটারি সাহেব, এবং উপজেলা চেয়ারম্যান। আমাদের মধ্যে আপনি সবচে' বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি—সেই হিসেবে আপনি চেয়ারম্যান।

জালাল সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের তদন্ত ?

হেড মাস্টার সাহেব গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, কেলেংকারি ব্যাপার হয়েছে। স্পেশাল পারমিশনে নীলগঞ্জ স্কুলকে একশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। মবিনুর রহমান সইসাবুদ করে গম নিয়েছে। আমাকে বলেছে দশ বস্তা। আমি তো তাই সরল মনে বিশ্বাস করলাম। মবিনকে অবিশ্বাস করার কি কোন কারণ আছে ? আপনি বলেন। যাই হোক, দু'মাস পর ডিও-র চিঠি পেয়ে আমি তো যাকে বলে থান্ডারস্ট্রাক, বজ্রাহত।

জালালুদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, মবিন এই কাজ করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসে বলে—'মবিন গম চুরি করেছে।' আমি বিশ্বাস করব না।

'বিশ্বাস তো আমিও করি না। করি না বলেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করলাম আপনাকে। আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মবিনকে আজই কিছু বলার দরকার নেই...'

'আমার তো মনে হয় আজই কথা বলা দরকার।'

'দরকার মনে হলে বলবেন—আপনি হচ্ছেন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। আপনি যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। থরো ইনকোয়ারি হবে।'

'আমি কিছুই বুঝছি না। কিছুই না—এমন একজন ভাল মানুষ।'

'ভাল মানুষ, মন্দ মানুষ চট করে চেনা যায় না জালাল সাহেব। চট করে মানুষ চেনা গেলে কি আর দুনিয়ার আজ এই হালত ? তবে আপনাকে একটা কথা বলি, গোড়া থেকেই কিন্তু এই লোকটাকে আমার পছন্দ না। তারপর যখন দু'মাস আগে নৌকা কিনে ফেলেছে—দুই না তিন হাজার টাকা দাম। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে তখনো মনে খচ করে উঠল।'

জালাল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হেড মাস্টার সাহেবের কথা শুনতে তাঁর এখন আর ভাল লাগছে না। টিচার্স কমনরুমে মবিনুর রহমানকে পেলেন না। দীর্ঘদিন পর এই মানুষটা স্কুল কামাই করেছে এবং বেছে বেছে আজকের দিনে।

এটা কি পুরোপুরি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ? জালাল সাহেব ক্লাস সিক্সে ধর্ম পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বললেন, সুরা বনি ইসরাইলে দু'টা চমৎকার বাক্য আছে—"মানুষ যেভাবে ভাল চায়, সেভাবেই মন্দ চায়। মানুষের বড়ই তাড়াহুড়া।" তোমরা এই দুই লাইনের ব্যাখ্যা কর। তোমাদের যা মনে আসে তাই লেখ। আর শোন, কেউ হৈ চৈ করবে না। আমার মন আজ ভাল না। মন অসম্ভব খারাপ। বলতে বলতে জালাল সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

ক'দিন ধরে রোজ বিকেলে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করছে। আজ ব্যতিক্রম। সারাদিন আকাশ ছিল ঘন নীল। মেঘের ছিটাফোঁটাও ছিল না। এখন সাড়ে ছ'টার মত বাজে, এখনো আকাশ পরিষ্কার। গাছের মাথায় মাথায় ঝকঝকে রোদ।

রূপা এই সময় তার মা'র ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জানালায় পর্দা দেয়া। পর্দা দেয়া থাকলেও পর্দার ফাঁক দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। ঠিক সাড়ে ছ'টায় রূপার মাস্টার সাহেব তাদের বাড়ির গেটে হাত রাখেন। হাত রাখার আগে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বিরক্ত চোখে তাকান। এই দৃশ্য দেখতে রূপার বড় ভাল লাগে।

তার কি যে হয়েছে। রোজ দুপুরের পর থেকেই এক ধরনের অস্বস্তি। অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে আশংকা : যদি না আসেন। যতই বিকেল হতে থাকে আশংকা ততই বাড়তে থাকে। এক সময় বুকের ভেতর ধুকধুক শব্দ এত বেশি হয় যে মনে হয় সবাই শুনে ফেলছে। সাড়ে ছ'টার পর অবধারিতভাবে এই শব্দ কমে যায়। নিজেকে তখন খুব ক্লান্ত লাগে। সারাদিন খুব পরিশ্রমের কোন কাজ করলে কাজের শেষে যে রকম ক্লান্তি অনেকটা সে রকম ক্লান্তি।

এই যে ব্যাপারগুলি তার মধ্যে হচ্ছে এটা কি অন্যায় ? অন্যায় তো বটেই, তবে খুব বেশি অন্যায় নিশ্চয়ই না। সে তেমন কিছু তো করে না। স্যার যা পড়তে বলেন পড়ে। যে অংক করতে বলেন করে। বাড়ির কাজ করে। মাঝে মাঝে অবশ্যি সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়—তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই সময় শরীরে এক ধরনের ব্যথা বোধ হয়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বমি বমি ভাব হয়। তখন সামনে থেকে উঠে গিয়ে বমি করতে হয়। তবে এই ব্যাপারগুলি ঘনঘন হয় না। ঘনঘন হলে সবার চোখে পড়ত। ভাগ্যিস কিছুদিন পর পর হয়।

রূপা তার স্যারকে গত ছ'মাসে গভীর মনোযোগে লক্ষ করেছে। এত মনোযোগ দিয়ে এর আগে সে কাউকেই লক্ষ করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। কারণ করার প্রয়োজন নেই। রূপার ধারণা এই মানুষটিকে সে যতটা ভাল জানে অন্য কেউ তা জানে না, এমন কি মানুষটা নিজেও এতটা জানেন না।

মানুষটা কি জানেন যে তিনি মাঝে মাঝে অসম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে যান ? হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই জানেন। তবে অন্যমনস্ক হবার আগ মুহূর্তে তিনি কি করেন তা-কি জানেন ? না, জানেন না। এটা জানে শুধু রূপা। এই মানুষটা যখন বাঁ হাত দিয়ে খুব শান্ত ভঙ্গিতে মাথার চুল ভাঁজ করতে থাকেন তখন বোঝা যাবে তিনি অন্যমনস্ক হতে শুরু করেছেন। অন্যমনস্ক অবস্থায় মানুষটা কি ভাবেন তা রূপার খুব জানার ইচ্ছা। রোজই ভাবে জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করা হয় না। শেষ মুহূর্তে লজ্জা লাগে। তবে একদিন সে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে। হয়ত আজই করবে।

মানুষটা রূপাকে খুবই বাচ্চা মেয়ে বলে মনে করেন এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি রূপা যখন কিছু বলে তখন তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেন এবং রূপার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেন। রূপা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। খুব যে গুছিয়ে মিথ্যা বলে তাও না, অথচ মানুষটা তা বিশ্বাস করেন। রূপার তখন খুব খারাপ লাগে।

একবার রূপা বলল, মশা যে খুব বুদ্ধিমান প্রাণী তা কি স্যার আপনি জানেন ?

তিনি অবাক হয়ে বললেন, জানি না তো। খুব বুদ্ধিমান হবার তো কথা না। ক্ষুদ্র প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি অল্প।

'স্যার মস্তিষ্ক অল্প হলেও মশা খুব বুদ্ধিমান। আমি পরীক্ষা করে বের করেছি।'

মানুষটা এতে খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। মাথা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এল, আবেগশূন্য কণ্ঠস্বরেও খানিকটা আবেগ চলে এল। তিনি ছেলেমানুষি কৌতূহল নিয়ে বললেন, কি পরীক্ষা ?

রূপার লজ্জা লাগছে। কারণ এখন সে যা বলবে তার পুরোটাই ডাহা মিথ্যা। অনেক ভেবেচিন্তে বের করেছে।

'পরীক্ষাটা করেছি আমার মামাতো বোনকে দিয়ে। মামাতো বোনের নাম ইয়াসমিন। আমার দুই বছরের ছোট। সে মশারি খাটিয়ে ঘুমুতে পারে না, তার নাকি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমি একদিন লক্ষ করলাম, যখন সে জেগে থাকে তখন মশা খুব কম কামড়ায়। যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন খুব বেশি কামড়ায়।

বুদ্ধিমান বলেই তারা অপেক্ষা করে কখন মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে। আরাম করে রক্ত খাওয়া যাবে। ঠিক না স্যার?'

'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এমন হেলাফেলা করে হয় না রূপা। আরো সূক্ষ্মভাবে করতে হয়। যেমন ধর, ঘুমুবার আগে ঘন্টায় ক'টা মশা কামড়াচ্ছে। ঘুমুবার পর ক'টা। একজনকে দিয়ে পরীক্ষা করলেও হবে না। অনেককে দিয়ে করতে হবে। বুঝতে পারছ কি বলছি?'

'জ্বি স্যার।'

'তবে তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে মশার মনে মৃত্যুভয় আছে। মৃত্যুভয় আছে বলেই জাগ্রত মানুষকে কামড়াচ্ছে না। মৃত্যুভয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। শুধুমাত্র নির্বোধদেরই মৃত্যুভয় থাকে না।'

'স্যার আমার কিন্তু মৃত্যুভয় নেই। আমি কি নির্বোধ?'

'এইসব কথা এখন থাক। ফিজিক্স বইটা খুল তো।'

'ফিজিক্স পড়তে আমার ভাল লাগে না, স্যার।'

'ফিজিক্স পড়তে ভাল লাগে না? তুমি এইসব কি বলছ? খুবই অন্যায় কথা বলছ। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব?

'তোমার নিজের কাছে।'

'আচ্ছা স্যার ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এবং নিজেকে নিজে ক্ষমা করে দিলাম।'

'বই খোল, থার্ড চেপ্টার বের কর—স্থির বিদ্যুৎ।'

রূপা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে থার্ড চেপ্টার বের করল। মানুষটা হাত নেড়ে নেড়ে স্থির বিদ্যুৎ বুঝাচ্ছেন। এমনভাবে বুঝাচ্ছেন যেন স্থির বিদ্যুৎ তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। রূপা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। আবার বমি বমি লাগছে। মাথা ঘুরছে। কেন এ রকম হয়? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কি আছে এই মানুষটার মধ্যে, কেন তাকে এত ভাল লাগে?

ছ'টা চল্লিশ বাজে।

এখনো মানুষটার দেখা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড়-বৃষ্টি কিছুই নেই। এ রকম তো হবার কথা নয়। রূপার কেমন যেন লাগছে। গা কাঁপছে, ঘাম হচ্ছে। মাথার ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। রূপা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাদের উঠোনে অনেক গাছপালা। গাছপালার জন্যেই রাস্তা দেখা যায় না। রূপার মনে হল গেটের কাছে দাঁড়ালেই সে দেখবে লম্বা মানুষটা মাথা নিচু করে দ্রুত

আসছেন। দেরি করার জন্যে রূপা আজ কিছু কঠিন কথা শুনাবে। অবশ্যই শুনাবে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই আজ দেরি করবেন কেন?

রূপা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার অনেকখানিই দেখা যায়। রাস্তায় লোকজন আছে কিন্তু ঐ মানুষটা নেই। রূপার মনে হল খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর যখন সে তাকাবে তখনই মানুষটাকে দেখতে পাবে। অবশ্যই পাবে। সে দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে রইল, এক সময় চোখ মেলল। রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই।

সন্ধ্যা মিলাচ্ছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। রূপা এখনো গেটের বাইরে। রূপার মা এক সময় বারান্দায় এসে বিস্মিত গলায় বললেন, ভরসন্ধ্যায় বাইরে কেন রে মা?

রূপা জবাব দিল না।

'আয়, ঘরে আয়।'

রূপা ঘরে ঢুকলো। রূপার মা বললেন, তোর কি হয়েছে? তোকে এমন লাগছে কেন? চোখ লাল।

রূপা ক্লান্ত গলায় বলল, মনে হয় আমার জ্বর আসছে।

'কই গা তো ঠাণ্ডা।'

'শরীরটা ভাল লাগছে না মা।'

'যা শুয়ে থাক।'

'আচ্ছা। স্যার এলে বলবে, আজ আমি পড়ব না।'

'বলব।'

রূপা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তার প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল— এই বুঝি স্যার এসেছেন।

স্যার এলেন না, তবে রাত দশটায় রূপার বড় ভাই রফিক তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে খুলনা থেকে বিনা নোটিসে এসে উপস্থিত হল। সে তিন বছর পর গ্রামের বাড়িতে এসেছে। তার দ্বিতীয় মেয়ে রুবাবাকে এবাড়ির কেউ দেখেনি। সেই মেয়ে এখন ফড়ফড় করে কথা বলে। যা দেখছে সে দিকেই ডান হাতের পাঁচ আঙুল বাড়িয়ে বলছে, এটা কি? বড় মেয়ের নাম জেবা। এই মেয়ে নিঃশব্দবতী, তার মুখে কোন কথা নেই। রূপা এখন পর্যন্ত তার মুখ থেকে একটি কথাও শুনেনি। বাড়িতে আনন্দের সীমা নেই। রূপার মা ছেলেকে এবং ছেলের বৌকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত কাঁদছেন। রূপারও অসম্ভব ভাল লাগছে। সে ভাইয়ের ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। মেয়েটি এক সময় আকাশের চাঁদের দিকে হাতের পাঁচ আঙুল মেলে বলল, এটা কি?

রূপা বলল, এটা চাঁদ। পূর্ণিমার চাঁদ। তোমাদের খুলনার পচামার্কা চাঁদ না। আমাদের ময়মনসিংহের চাঁদ। দেখেছ কত সুন্দর ?

কয়েকটা জোনাকি উড়ে গেল। রুবাবা বলল, এটা কি ?

'এর নাম জোনাকি। এরা চাঁদের কণা গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কি সুন্দর তাই না রুবাবা ?'

একটা বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল। রুবাবা বলল, এটা কি ?

রফিক এক সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পেছনে পেছনে বাড়ির সবাই। রফিক তার মা'কে বলল, রূপা তো মা পরীর মত সুন্দর হয়েছে। আশ্চর্য।

ভাইয়ের কথা শুনে রূপার চোখে কেন জানি পানি এসে গেল।

রফিক বলল, এই রূপা অন্ধকারে বাগানে ঘুরছিস ? সাপখোপ আছে না ?

রূপা হালকা গলায় বলল, অন্ধকার কোথায় ? দেখছ না কত বড় চাঁদ। দিনের মত আলো।

রূপার বাবা বাড়িতে নেই। মামলার ব্যাপারে নেত্রকোনা গিয়েছেন। কয়েকদিন সেখানে থাকবেন। তাঁকে খবর দেবার জন্য রাতেই লোক গেল। একজন গেল ঘাটে। মাছ কিনতে।

ঘাটে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। বেপারিরা ঢাকায় চালান দেবার জন্যে কিনে এনে জড় করে।

মবিনুর রহমান নৌকার ছাদে বসে আছেন। নদীতে জোছনা যেন গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী তাঁর কাছে এত সুন্দর এর আগে কখনো মনে হয়নি। এই ব্যাপারটাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি কবি নন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে প্রকৃতির নিয়ম-নীতির সৌন্দর্য তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। আজ সারাদিন তিনি কিছু খান নি। কারণ ঘরে কোন খাবার নেই। সব এক সঙ্গে শেষ হয়েছে। হরলিক্সের একটা কৌটায় চিড়া ছিল। মুখ খুলে দেখা গেল পোকা পড়ে গেছে। ডালের টিনে ডাল আছে। দুপুরে একমুঠ ডাল চিবিয়ে খেলেন। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড় হল। বিকেল পর্যন্ত তিনি ক্ষিধেয় কষ্ট পেয়েছেন। এখন আর পাচ্ছেন না। বরং এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে হয় ক্ষুধার্ত অবস্থায়। ক্ষুধার্ত মানুষের স্নায়ু থাকে তীক্ষ্ণ। আহারে পরিতৃপ্ত একজন মানুষ ভোতা স্নায়ু নিয়ে তেমন কিছু বুঝে না।

রাত ন'টার দিকে জালালুদ্দিন এসে উপস্থিত হলেন।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলেন। কেউ সাড়া দিল না। সাপের ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন না। নদীর দিকে রওনা হলেন। ঘরে যখন নেই। নৌকায় থাকতে পারে। না-কি সাপের কামড়ে ঘরে মরে পড়ে আছে?

দূর থেকে জালালুদ্দিনের মনে হল নৌকার উপর একটা পাথরের মূর্তি বসে আছে। জীবন্ত মানুষ এইভাবে বসে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও নড়াচড়া করে। জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন, এই মবিন।

পাথরের মূর্তি ডাক শুনতে পেল না। জালালুদ্দিনের কেন জানি মনে হচ্ছিল শুনতে পাবে না। চিৎকার করে ডাকলেও এই মানুষ কিছু শুনবে না। গায়ে ঝাঁকি দিয়ে তাকে জাগাতে হবে।

তিনি নৌকায় উঠে এলেন।

মবিনুর রহমান চমকে উঠে বললেন, আপনি।

'স্কুলে যাও নাই, খোঁজ নিতে আসলাম। করছ কি?'

'জ্যোৎস্না দেখছি।'

'কবি-সাহিত্যিকরা জ্যোৎস্না দেখে বলে শুনি—তুমি হলে গিয়ে সায়েন্সের লোক। আজ স্কুলে যাও নাই কেন? শরীর ভাল আছে?'

'জ্বি—শরীর ভালই আছে।'

'শরীর ভাল তো স্কুলে যাও নাই কেন? সারাদিন করেছ কি? ঘরে বসে ছিলে?'

'জ্বি-না। নৌকায় ছিলাম। কিছু করছিলাম না—এই দৃশ্য-দৃশ্য দেখছিলাম।'

'কি দৃশ্য দেখছিলে?'

'সন্ধ্যাবেলা কয়েক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। দেখতে খুব ভাল লাগল। পাখির ঝাঁকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করলাম। সব ঝাঁকে পাখি থাকে বেজোড় সংখ্যা।'

'এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কি?'

'খুবই ইন্টারেটিং। পাখিদের নিয়ম হচ্ছে এরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা পুরুষ পাখির সঙ্গে একটা মেয়ে পাখি থাকবেই। কিন্তু ঝাঁকগুলায় একটা পাখি আছে সঙ্গিহীন। এর কারণটা কি? আর এই নিঃসঙ্গ পাখিটা পুরুষ না মেয়ে এটাও আমার জানার ইচ্ছা। কিভাবে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। কিভাবে এটা বের করা যায় বলুন তো?'

জালালুদ্দিন কিছু বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মানুষটিকে তিনি আট বছর ধরে চেনেন। তবু মনে হচ্ছে আট বছরে ঠিকমত চেনা হয়নি।

'মবিন !'

'জ্বি।'

'ইয়ে একটা কাজে তোমার কাছে এসেছিলাম।'

'কি কাজ ?'

'ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে তুমি একবার কিছু গম এনেছিলে মনে আছে ?'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

'কয় বস্তা গম ছিল ?'

'দশ বস্তা।'

'তোমার পরিষ্কার মনে আছে তো ?'

'মনে থাকবে না কেন ? আমি নিজে সই করে আনলাম।'

'দশ বস্তাই ছিল ? এর বেশি না ?'

'বেশি থাকবে কেন ? অবশ্যি বস্তা আমি গুনি নাই। হেডস্যার গুনলেন। আমি শুধু সই করে দিয়েছি।'

'হেড স্যার বস্তা গুনেছিলেন ?'

'এইসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'এম্নি। এম্নি জিজ্ঞেস করছি। তোমার ঘরে কি চায়ের ব্যবস্থা আছে ?'

'না, আমি তো চা খাই না।'

'চায়ের একটা বাজে নেশা হয়েছে। বিকালে চা না খেলে ভাল লাগে না। আচ্ছা আসছি যখন তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশ দেখে যাই। শনির বলয় দেখা যাবে না ?'

'আজ দেখা যাবে না। চাঁদের আলো খুব বেশি।'

'তাহলে থাক। নৌকায় বসে থাকতে তো ভালই লাগছে। বড়ই সৌন্দর্য। কোরান মজিদে আল্লাহপাক কি বলেছেন জান ? সূরা কাহফ্-এর সপ্তম পারায় আছে—"পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি ওসগুলিকে তার শোভা করেছি।" এই অর্থ ধরলে চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর শোভা। কি, ঠিক না ?'

মবিনুর রহমান জবাব দিলেন না। তার মাথায় চমৎকার একটা চিন্তা এসেছে। যদি পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকতো তাহলে পৃথিবীর একদিকে থাকতো সূর্যের আলো, অন্যদিকে চির অন্ধকার। তখন যদি চাঁদটার অবস্থান এমন হত যে, চির-অন্ধকার পৃথিবীতে থাকবে চির-জ্যোৎস্না—তাহলে ব্যাপারটা

কি দাঁড়াতো ? সেই চির-জ্যোৎস্নার জগতের গাছপালাগুলি নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। মানুষগুলিও হত অন্যরকম। সেই অন্যরকমটা কি রকম ?

জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন !

মবিন জবাব দিলেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনায় আছে চির-জ্যোৎস্নার দেশ। ঠিক এই রকম অবস্থায় মবিনুর রহমান দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখলেন। এই স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় ঘোরের মধ্যে দেখা। কাজেই তাকে হয়ত স্বপ্ন বলা যাবে না। মবিনুর রহমান স্পষ্ট দেখলেন—অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। তারা এক সঙ্গে বলে উঠল—হচ্ছে, তোমার হচ্ছে। তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর 'নি'। তুমি তোমার প্রচণ্ড ক্ষমতা ব্যবহার কর।

'মবিন ! এই মবিন !'

'জ্বি।'

'কি হচ্ছে তোমার, এই রকম করছ কেন ?'

'কি করছি ?'

'গোঁ গোঁ শব্দ করছিলে।'

মবিনুর রহমান ক্লান্ত গলায় বললেন, স্বপ্ন দেখছিলাম।

'স্বপ্ন দেখছিলে মানে ? তুমি ঘুমুচ্ছিলে না-কি ?'

মবিনুর রহমান বিব্রত গলায় বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রূপার বড় ভাই রফিক খুব আমোদে মানুষ। হৈচৈ করতে পছন্দ করে। লোকজন জড়ো করে আড্ডা দেয়ায় তার খুব আগ্রহ। সে আসার পর থেকে রূপাদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন। আসছে, যাচ্ছে, চা খাচ্ছে। বড় চায়ের কেতলি চুলায় আছেই।

বাড়ি-ভর্তি মানুষ, কিন্তু রূপার অস্থিরতা কমছে না। সে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে, পারছে না। মনে হচ্ছে এ জীবনে আর কোনদিনও সে স্বাভাবিক হতে পারবে না। রফিকের এক গল্প শুনে সে খুব শব্দ করে হাসল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছিস কেন ?

রূপা ক্ষীণ গলায় বলল, হাসির গল্প তাই হাসলাম।

'আমি তো মোটেই হাসির গল্প বলিনি। আমাদের এক কলিগের স্ত্রী কিভাবে এ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু হয়ে গেছে, সেই গল্প করলাম। এর মধ্যে হাসির তো কিছু নেই।'

রূপা চুপ করে রইল। ভাইয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও এখন তার ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভাইয়ার দিকে তাকালেই সে সব কিছু বুঝে ফেলবে।

'রূপা !'

'জ্বি।'

'তোর কি হয়েছে বল্ তো ?'

'কিছু হয়নি।'

'আমার তো মনে হয় কিছু-একটা হয়েছে। তুই কারো কথাই মন দিয়ে শুনছিস না। তোর মধ্যে একটা ছটফটানি ভাব চলে এসেছে। আগে তো তুই এমন ছিলি না।'

'মানুষতো বদলায় ভাইয়া।'

'অবশ্যই বদলায়—এমনভাবে বদলায় না। তুই মাকে ডেকে আনতো, মাকে জিজ্ঞেস করি।'

'তাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে ?'

'ডেকে আনতে বলছি, ডেকে আন।'

রূপা মাকে ডেকে নিয়ে এল। নিজে সামনে থাকল না। থাকতে ইচ্ছা করল না। সে লক্ষ করেছে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঘনঘন বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে এমন কিছু আলোচনা হচ্ছে যেখানে তার উপস্থিতি কাম্য নয়। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে—সে কাছে এলেই থেমে যাচ্ছে। এর মানে কি ?

রূপা বাগানে নেমে গেল। সাতটা বাজতে বেশি বাকি নেই। রূপা নিশ্চিত আজ স্যার আসবেনই। আজ ছ'তারিখ। ছ'তারিখ তার জন্যে খুব লাকি। ক্লাস এইটে বৃত্তি পাবার খবর সে পেয়েছিল ছ'তারিখে। মবিনুর রহমান স্যার প্রথম এ বাড়িতে এসেছিলেনও ছ'তারিখে। রূপা লক্ষ করল ভাইয়া মা'র সঙ্গে কথা বলছে এবং আড়চোখে তাকে দেখছে। রূপা এমন ভাব করলো যেন সে বাগানের গাছগুলি দেখছে। যদিও গাছপালার প্রতি তার তেমন মমতা নেই।

বারান্দায় জেবা এসে দাঁড়িয়েছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রূপার দিকে। এই মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যে অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় এই মেয়েটার দু'টা চোখের ভেতরও কয়েকটা চোখ আছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি চোখ যেন তাকে দেখে। রূপা জেবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাগান দেখবে জেবা ?

জেবা হ্যাঁ-না কিছু বলল না, তবে বাগানে নেমে এল।

রূপা বলল, এই বাগানের নাম কি জান ? জংলী বাগান। কোন যত্ন নেই—গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। তাই জংলী বাগান।

জেবা কিছু বলল না। এই মেয়েটা একেবারেই কথা বলে না।

'আমাদের এই জংলী বাগান তোমার কাছে কেমন লাগছে জেবা?'

জেবা নিশ্চুপ। যেন সে পণ করেছে কোন কথা বলবে না। রূপা হাসতে হাসতে বলল, তুমি কি কারো সঙ্গেই কথা বল না?

জেবা হাসল। ঠিক হাসিও না। তার ঠোঁট বাঁকাল না, তবে চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সে এবারে স্পষ্ট গলায় বলল,

তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছ ফুপু?

রূপা চমকে উঠে বলল, কারো জন্যে অপেক্ষা করছি নাতো। আমি কারো জন্যে অপেক্ষা করছি এটা তোমার মনে হল কেন?

জেবা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাগান থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। রফিক হাসিমুখে বলল, কি মা বাগান ভাল লাগল না? জেবা জবাব দিল না। রফিক আবার বলল, আমাদের এই বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে তো মা? জেবা এই প্রশ্নের উত্তরেও কিছু বলল না। তাকে আরো প্রশ্ন করা হতে পারে এই ভয়েই হয়ত-বা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

রফিকের মা বললেন, তোর এই মেয়ে বোধহয় আমাদের কাউকে পছন্দ করছে না। কারো কোন কথার জবাব দেয় না। রফিক বলল, ও এ রকমই মা। কথা বলার ইচ্ছা হলেই কথা বলবে। ইচ্ছা না হলে বলবে না। খুব সমস্যা করছে। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

'ডাক্তার কি করবে?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট, ওরা এইসব ব্যাপার জানে। বাচ্চারা থাকবে বাচ্চাদের মত। ওকে দেখ কেমন বড়দের মত ভঙ্গি করে ঘুরে। ওর কথা বাদ দাও মা। এখন রূপার ব্যাপারটা বল। ওর হয়েছে কি?'

'কিছু হয়নি তো।'

'আগেও তো বললে কিছু হয়নি। ভাল করে ভেবে বল ও কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়েনি তো?'

'কি বলিস তুই।'

'আজগুবি কোন কথা বলছি না মা, রূপার ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না বলেই বলছি। শেষটায় বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর দেখা যাবে সে বেঁকে বসেছে।'

'এ রকম কিছু নাই।'

'জান তো ভালমতো?'

'জানি।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। রূপাকে দেখ কেমন মূর্তির মত দেখাচ্ছে। আগে তো ও এরকম ছিল না।'

রফিক ঘরের ভেতরে চলে গেল। ছোট মেয়ে রুবাবা তারস্বরে চিৎকার করছে। সে ছাড়া এই মেয়েকে কেউ সামলাতে পারে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত চিৎকারেও রূপার কোন ভাবান্তর নেই। যেন সে কিছু শুনছে না। এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছে।

রূপা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাগানে বসে রইল। বাঁধানো বকুর গাছের নিচে বসার ব্যবস্থা আছে।

রফিক বাইরে বেরুতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে বিরক্ত গলায় বলল, এখনো বাগানে বসে আছিস কেন ?

'মাথা ধরেছে ভাইয়া। ফ্রেশ বাতাস নিচ্ছি।'

'বর্ষার সময়, সাপখোপ বেরুবে। উঠে আয়।'

রূপা উঠে এলো। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তুই কি কাঁদছিলি নাকি ?

'কাঁদব কেন শুধু শুধু ?'

'তোর গাল ভেজা, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

রূপা শাড়ির আঁচলে গাল মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদছিলাম। মাথার যন্ত্রণায় কাঁদছিলাম। মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয়। মাথাটা কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

'সে কি ! যন্ত্রণা খুব বেশি ?

'হুঁ।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিস ?'

'না।'

'তোদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা। অসুখ-বিসুখ হবে, ডাক্তার দেখাবি না ? দেশে ডাক্তার আছে কি জন্যে ? আচ্ছা, আমি বিধুবাবুকে নিয়ে আসব।'

'কাউকে আনতে হবে না।'

'যা ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক। রাতে তোর সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

'এখন বল।'

'না এখন না। রাতে বলব। এখন একটা কাজে যাচ্ছি। আর শোন, তোর যদি বিশেষ কোন কথা বলার থাকে যা আমাকে বা মাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস তাহলে তোর ভাবিকে বলবি।'

'আমার আবার বিশেষ কি কথা...'

'থাকতেও তো পারে। এই জন্যই বলছি।'

রূপা নিজের ঘরে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তাঁর এখন সত্যি সত্যি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। অসম্ভব কষ্টও হচ্ছে। আজ ছ'তারিখ, কিন্তু স্যার এলেন না। উনার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে? মোতালেবকে কি পাঠাবে খোঁজ নিতে? যদি পাঠায় কেউ কি তা অন্য চোখে দেখবে? অন্য চোখে দেখার তো কিছু নেই। একটা লোকের অসুখ-বিসুখ হলে খোঁজ নিতে হবে না।

হারিকেন হাতে মিনু ঘরে ঢুকল। কোমল গলায় বলল, তোমার নাকি প্রচণ্ড মাথা ব্যথা?

'হ্যাঁ, ভাবি।'

'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'না, তুমি এখন যাও। আমার একা থাকতে ইচ্ছা করছে। কিছুক্ষণ একা থাকলে মাথা ধরাটা কমবে।'

''এ রকম কি তোমার প্রায়ই হয়?'

'হুঁ।'

'মশারি খাটিয়ে শোও। মশা কামড়াচ্ছে তো।'

'মশা কামড়াচ্ছে না ভাবি, তুমি যাও, হারিকেন নিয়ে যাও—আলো চোখে লাগছে।'

মিনু হারিকেন নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, তোমার স্যার এসেছিলেন। উনাকে বলেছি আজ পড়তে পারবে না। তোমার মাথা ব্যথা। তাঁকে চলে যেতে বলেছি।

রূপা উঠে বসল। তার বুক ধকধক করছে। মনে হচ্ছে, সে নিজেকে সামলাতে পারবে না। সে কাঁপা গলায় বলল, ভাবি উনি কি চলে গেছেন?

'জানি না। বলেছিলাম তো চা খেয়ে তারপর যেতে। বসেছেন কি-না জানি না।'

'ভাবি প্লিজ, উনাকে একটু বসতে বল।'

'তোমার মাথা ব্যথা?'

'এখন কমেছে। অনেকখানি কমেছে, জরুরি কিছু পড়া আছে দেখে নি।'

'কাল আসতে বলি?'

'না ভাবি না।'

মিনু হারিকেন হাতে চলে গেল। রূপার অস্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর চোখ এড়াল না। অবশ্যি সে এটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। এই বয়েসী মেয়েদের

আচার-আচরণ কোন ধরাবাঁধা পথে চলে না। তাদের আগ্রহ ও অনাগ্রহ কোনটারই সাধারণত কোন ব্যাখ্যা থাকে না। এরা চলে সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে।

মবিন সাহেবের হাতে দু'দিনের পুরানো একটা খবরের কাগজ। তিনি গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছেন। যে অংশটি পড়ছেন সে অংশ কেউ মন দিয়ে পড়বে না। সংবাদ শিরোনাম সিরাজগঞ্জের ধানচাষীদের কীটনাশকের জন্যে আবেদন। ধানে পামরি পোকা ধরেছে। সেই পোকা বিনষ্ট করা আশু প্রয়োজন,...ইত্যাদি, ইত্যাদি। খবরটা দু'বার পড়বার পর তিনি এখন তৃতীয় বারের মত পড়ছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি অপেক্ষা করছেন চায়ের জন্য। অপরিচিত একজন মহিলা তাকে বলে গেছেন, বসুন চা খেয়ে যান। তিনি বসে আছেন। চা এখনো আসছে না। রূপার মাথাব্যথা। সে আজ পড়বে না শুনে তিনি খানিকটা স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ তাঁর মন ভাল না, পড়াতে ইচ্ছা করছে না। শুধু মন না—শরীরটাও খারাপ। পর পর তিন রাত ঘুম হয়নি। দিনের বেলা ঘুমুতে চেষ্টা করেন, লাভ হয় না। খানিকটা ঝিমুনির মত আসে — খুটখাট শব্দে ঝিমুনি কেটে যায়। বাজারে এসেছিলেন ঘুমের ওষুধ কিনতে, ফেরার পথে ভাবলেন রূপার পড়াশোনার খোঁজ নিয়ে যাবেন। একজন শিক্ষক সব সময় যে পড়া দেখিয়ে দেবেন তা তো না। মাঝে মাঝে তার উপস্থিতিই যথেষ্ট।

মবিন সাহেব খবরের এই অংশ তৃতীয়বার পড়া শেষ করে দরজার দিকে তাকালেন। দশ-এগারো বছরের একটি বালিকা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চেষ্টা করছে যেন তাকে দেখা না যায়। দেখা যাচ্ছেও না, তবে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার উজ্জ্বল চোখ দেখা যাচ্ছে।

মবিন সাহেব বললেন, তুমি কে ? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কেউ না।

এ উত্তর মবিন সাহেবের পছন্দ হল। মেয়েটা ভালই বলেছে সে কেউ না। হু আর ইউ ? আই অ্যাম নোবডি। বাহ্ ভাল তো।

'তোমার নাম কি ?'

'জেবা।'

'জবা ? বাহ্ সুন্দর নাম !'

'জবা না জেবা।'

'ও আচ্ছা, জেবা। পর্দার আড়ালে কেন ? কাছে আস গল্প করি।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

মবিন সাহেব খুশিই হলেন। মেয়েটি গল্প করার জন্যে এগিয়ে এলে সমস্যা হত। তিনি একেবারেই গল্প করতে পারেন না। তাছাড়া এই বয়েসী মেয়েরা কোন ধরনের গল্প শুনতে চায় তাও জানেন না। তিনি চতুর্থ বারের মত ধান গাছের পোকা বিষয়ে খবর পড়তে শুরু করলেন। কিছুতেই এটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না।

চা নিয়ে রূপা ঢুকল। শুধু চা না—এক বাটি মুড়ি। মুড়ির উপর তিনটা ভাজা শুকনা মরিচ।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'এতদিন আসেননি কেন?'

মবিন সাহেব জবাব দিলেন না। এতদিন কেন আসেননি এটা বলতে হলে এক গাদা কথা বলতে হবে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রূপা চেষ্টা করছে খুব স্বাভাবিক থাকতে। তার আচার-আচরণে কিছুতেই যেন ধরা না পড়ে যে সে এই মুহূর্তে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছে। বিশ্বাস পর্যন্ত হচ্ছে না যে স্যার তার সামনে বসে আছেন। মানুষটার চেহারা এত সাধারণ কিন্তু এই সাধারণ চেহারা তার কাছে এত অসাধারণ লাগছে। মনে হচ্ছে তার একটা জীবন সে এই লোকটির দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে। এক পলকের জন্যেও সে চোখের পাতা ফেলবে না।

'স্যার, আজ কিন্তু আমি পড়ব না।'

'আচ্ছা।'

'কাল থেকে সিরিয়াসলি পড়া শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

'কাল আসবেন তো?'

'হুঁ।'

'চা খান স্যার। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

তিনি চায়ে চুমুক দিলেন। রূপা বলল, খুলনা থেকে আমার বড় ভাই এসেছেন। উনার দুই মেয়ে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা খুব অদ্ভুত নাম না স্যার?

'হুঁ।'

'এই নাম আগে শুনেছেন?'

'না।'

'আমার মেজো ভাই থাকেন চিটাগাং। উনিও বোধহয় আসবেন। তাঁকেও খবর দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে একটা হৈচৈ-এর ব্যবস্থা হচ্ছে।'

মবিন সাহেব ডান হাতে মাথার চুল আঁচড়াবার মত ভঙ্গি করছেন। এই ভঙ্গি রূপার চেনা। এর অর্থ তিনি এখন অন্যমনস্ক। অন্য কিছু ভাবছেন।

'স্যার। স্যার !'

'হুঁ।'

'কি ভাবছেন স্যার ?'

'না মানে তেমন কিছু না—খবরের কাগজে একটা খবর পড়ার পর থেকে খারাপ লাগছে। মন থেকে বিষয়টা তাড়াতে পারছি না। ধান ক্ষেতে পোকা লেগেছে। চাষীরা পোকা মারার জন্য কীটনাশক চাচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, খারাপ লাগার কি আছে ?

মবিনুর রহমান চেয়ারে পা তুলে বসলেন। এই ভঙ্গিটাও রূপার চেনা। এখন তিনি কঠিন গলায় কিছু কথা বলবেন। তিনি কথা বলা শুরু করলেন।

'শোন রূপা, এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির জন্ম হয়েছে। মানুষ যেমন একটি প্রজাতি, কীট-পতঙ্গও প্রজাতি। এদের সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এদের সঙ্গে সহাবস্থানের পদ্ধতি বের করা যেতে পারে, এদের হত্যা করা যাবে না। এদের হত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই। আমরা সীমা লংঘন করছি।'

রূপার খুব ইচ্ছে করল বলে—ওদের হত্যা না করলে তো এরা ধান খেয়ে ফেলবে। তখন আমরা মারা পড়ব। কিন্তু সে কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কথা শুনতে ইচ্ছা করছে। তার চেয়েও যা ভয়ংকর তার ইচ্ছা করছে এই মানুষটাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে।

'যাই রূপা !'

'স্যার একটু বসুন। একটু।'

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

'আরেক কাপ চা খান, আমি বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'চা তো একবার খেলাম।'

'ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাল করে এক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'না।'

তিনি উঠে পড়লেন। রূপার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে হাত ধরে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে আপনাকে বসতেই হবে। আপনি যেতে পারবেন না। আপনি সারারাত এই চেয়ারে বসে থাকবেন। সারারাত আমার সঙ্গে গল্প করবেন।

তা বলা হল না। কল্পনা এক জিনিস। বাস্তব অন্য। বাস্তবে রূপা তার স্যারকে এগিয়ে দিল গেট পর্যন্ত। স্যার চলে যাবার পরেও গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ পরিষ্কার, চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এতো সুন্দর ! পৃথিবী এতো সুন্দর !

রাতের খাবার শেষ হবার পর রফিক বলল, রূপা আয়, ছাদে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। ছাদ পরিষ্কার ?

'হুঁ। পাটি দিতে বলব ? না চেয়ার ?'

'পাটি দিতে বল। আর কয়েকটা বালিশ। তোর ভাবিকেও আসতে বল। ছাদে বসে চা খেতে খেতে জোছনা দেখি। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। অনেকদিন এমন জোছনা দেখিনি।'

'তোমাদের খুলনায় জ্যোৎস্না হয় না ?'

'হয়। দেখা হয় না। পানের বাটা সঙ্গে নিয়ে আসিস, পান খাব। কাঁচা সুপারি দিয়ে পান।'

ভাইয়া তাকে কি বলবে তা রূপা আঁচ করতে পারছে। বিয়ের কথা বলবে। এটা বলার জন্যে এত ভণিতা কেন কে জানে। বলে ফেললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরেই তারা ছাদে বসে আছে। রফিক নানান কথা বলছে। মূল প্রসঙ্গে আসছে না। এক সময় রূপার ধারণা হল হয়ত মূল প্রসঙ্গ নেই। হালকা গল্পগুজব করার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। মিনু বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

রফিক বলল, মিনু ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি ?

মিনু সাড়া-শব্দ করল না। রফিক হালকা গলায় বলল, রূপা তোর ভাবির কাণ্ড দেখেছিস ? ঘুম দিচ্ছে। এমন চমৎকার জোছনায় ঘুমিয়ে যাওয়া তো রীতিমত ক্রাইম। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রূপা বলল, আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে ভাইয়া। কয়েকবার হাই তুলেছি। রফিক বলল, সবাই যদি ঘুমে কাতর হয়ে থাকে তাহলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। চল যাই, ফেরাওয়েল টু দা মুন।

'তুমি কি যেন বলবে বলছিলে।'

'তেমন জরুরি কিছু না। ইট কেন ওয়েট। তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলব বলে ভাবছিলাম।'

'ও।'

'খুব ভাল ছেলে পাওয়া গেছে। সবদিক মিলিয়ে ছেলে জোগাড় করা তো এখন ভয়াবহ সমস্যা। ছেলে দেখতে সুন্দর হলে স্বভাব-চরিত্র হয় মন্দ। টাকা-

পয়সা থাকলে বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে না। ভাল ছেলে হলে দেখা যায় বোকা ছেলে, মন্দ হবার মত বুদ্ধি নেই বলে ভাল ছেলে হয়ে দিন পার করছে। তাছাড়া ভাল ছেলের কনসেপ্টও পাল্টে গেছে।'

'যাকে পেয়েছ সে-কি সব দিকে পারফেক্ট ?'

'এখন পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে। তুই নিজে দেখ।'

'আমি নিজে কিভাবে দেখব ?'

'ছেলেটাকে এখানে আসতে বলেছি। জহির চিটাগাং থেকে আসার সময় তাকে নিয়ে আসবে।'

'ও।'

'মনে হচ্ছে খুব উৎসাহ বোধ করছিস না।'

রূপা কিছু বলল না। রফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কথা বলেছি। আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। চমৎকার ছেলে।

'চমৎকার একটা ছেলে আমার মত একটা গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করবে কেন ?'

'বিয়ে করবে কারণ তুইও চমৎকার একটা মেয়ে। ছেলেটা এখানে আসছে। তোর লজ্জায় লজ্জাবতী হয়ে থাকার কোন কারণ নেই। তোরা কথাবার্তা বলবি। গল্প করবি। ছেলেটাকে গ্রাম দেখাবি এতে দোষের কিছু নেই। বুঝতে পারছিস্ আমার কথা ?'

'পারছি।'

'কিছু বলবি ?'

'ভাইয়া, ধর আমার ছেলেটাকে পছন্দ হল। ছেলেটার আমাকে পছন্দ হল না। তখন ?'

'তখন বিয়ে হবে না।'

'তখন কি আমার খারাপ লাগবে না ?'

রফিক কিছু বলার আগেই মিনু বলল, মোটেই খারাপ লাগবে না। কারণ তোমাকে যেই দেখবে সেই পছন্দ করবে। তুমি যে কি সুন্দর হয়েছ তা তুমি নিজেও জান না।

রূপা বলল, তুমি জেগে ছিলে ?

'হ্যাঁ, জেগে ছিলাম। ঘুমের ভান করে দেখতে চাচ্ছিলাম তোমরা ভাইবোনরা কিভাবে কথা বল।'

'কিভাবে বলি ?'

'স্মার্টলি বল। সহজ স্বাভাবিক। লজ্জা-টজ্জার কোন বালাই নেই। শুনতে ভালই লাগল। কে বলবে তুমি জীবন কাটিয়েছ গ্রামে।'

রফিক বলল, চল উঠা যাক। আমারো ঘুম পাচ্ছে।

মিনু বলল, না তুমি আরো খানিকক্ষণ বস। রূপা চলে যাক। আমরা দু'জন খানিকক্ষন গল্প করি। আর রূপা শোন, জেবা বলছিল সে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। সে হয়ত তোমার বিছানায় গম্ভীর মুখে বসে আছে। ও তোমার সঙ্গে ঘুমুলে অসুবিধা হবে না তো ?

'অসুবিধা কি ?'

মিনু দুঃখিত গলায় বলল, মাঝে মাঝে জেবা দুঃস্বপ্ন দেখে বিকট চিৎকার করে। ওর এই ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি পরিচিত না। ভয় পেতে পার।

'আমি এত সহজে ভয় পাই না ভাবি।'

রফিক ইতস্তত করে বলল, জেবার মধ্যে কিছু কিছু পাগলামি ভাব আছে। রূপা, তুই ওর কোন কথায় বেশি গুরুত্ব দিবি না। যা বলে মেনে নিবি। ওকে নিয়ে আমরা একটু সমস্যায় আছি। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

রূপা বলল, তোমরা শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ। জেবা চমৎকার মেয়ে। দেখো অল্পদিনেই আমি ওকে ঠিকঠাক করে দেব।

জেবা এখনো ঘুমোয়নি।

একটা বালিশ কোলে নিয়ে পা তুলে বিছানায় বসে আছে। মানুষ না, যেন সুন্দর পাথরের একটা মূর্তি।। রূপা বলল, কি-রে এখনো জেগে আছিস ? শুয়ে পড়।

জেবা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। শীতল গলায় বলল, ফুপু আমাকে তুমি করে বলবেন। কেউ আমাকে তুই করে বললে ভাল লাগে না।

রূপা হাসতে হাসতে বলল, আদর করে তুই বলছিলাম। আর বলব না। জেবা, তুই ছাড়া আর কোন কোন জিনিস তোমার ভাল লাগে না বলে ফেল তো। জেনে রাখি।

'কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা। ভুলেও আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। খুব সাবধানে থাকব।'

'কেউ গায়ে হাত দিয়ে আদর করলেও আমার ভাল লাগে না।'

'কখনো তোমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করব না। তোমার কাছ থেকে সব সময় এক হাত দূরে থাকব। রাতে ঘুমুবার সময় যদি গায়ের সঙ্গে গা লেগে যায় তাতে অসুবিধা নেই তো ?'

'অসুবিধা আছে।'

শোবার সময় রূপা একটা কোল বালিশ এনে দু'জনের মাঝখানে রাখতে রাখতে বলল, এই কোল বালিশটা হচ্ছে আমাদের সীমানা। একপাশে থাকবে তুমি একপাশে আমি। এবার ঠিক আছে জেবা ?

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'এখন আরাম করে ঘুমোও।'

জেবা বলল, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে ফুপু।

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, তোমাকেও আমার পছন্দ হয়েছে। তুমি একটু অদ্ভুত ! তাতে কি ? অদ্ভুত মানুষই আমার ভাল লাগে। আমার একজন স্যার আছেন, তিনিও অদ্ভুত। আমি তাঁকেও খুব পছন্দ করি।

'আমি জানি।'

'কিভাবে জান ?'

জেবা অস্পষ্টভাবে হাসল, কিছু বলল না। রূপা বলল, তুমি তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।

'আমি সব প্রশ্নের জবাব দেই না।'

'প্রশ্নের জবাব না দেয়াটা তো অভদ্রতা।'

'প্রশ্ন করাও তো অভদ্রতা।'

'তা ঠিক। প্রশ্ন করার মধ্যেও এক ধরনের অভদ্রতা আছে।'

জেবা বলল, ফুপু আপনি ইচ্ছা করলে আমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে পারেন। আমি রাগ করব না।

'আচ্ছা, জানা রইল। এখন ঘুমাও।'

'আর আমি সব সময় আপনার দলে থাকব।'

'আমার দল মানে ?'

জেবা শান্ত গলায় বলল, এ বাড়িতে দুটো দল হবে। আপনার একার একটা দল। আর বাকি সবার একটা দল। অন্য দলটা চাইবে একটা ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে। আপনি চাইবেন না...।

'এই সব তুমি কি বলছ ? এমন সব অদ্ভুত কথা তোমার মাথায় ঢুকল কিভাবে ?'

'বলব না।'

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। রূপার ঘুম এল না। এগারো বছরের এই বাচ্চা মেয়ে কি বলছে, কোত্থেকে বলছে ? নিশ্চয়ই বড়দের কথা শুনে শুনে নিজের মনে একটা-কিছু দাঁড় করিয়েছে। শিশুদের

মনের জগৎ খুব সহজ নয়। নানান জটিল কর্মকাণ্ড সেই জগতে হয়। শিশুরা তার খবর কখনো বড়দের বলে না।

প্রতি মাসের তিন তারিখ নীলগঞ্জ হাইস্কুলের দপ্তরি কালিপদ বাড়ি ভাড়া বাবদ মবিনুর রহমানের কাছ থেকে একশ'টা টাকা পায়। টাকাটা নিতে কালিপদের খুবই লজ্জা লাগে। যে বাড়িতে তার মত দরিদ্র ব্যক্তি নিজে থাকতে পারে না সেই বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা নেয়া কি অন্যায় না ? বাড়িটি মানুষ বাসের যোগ্য না। একটা মাত্র ঘর কোন রকমে টিকে আছে। তারও কড়িবরগা ঝুলে আছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ঘটে সে কি জবাব দেবে ? লোকে তো তাকেই ধরবে ? হেড স্যার তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কালিপদ তুমি জেনেশুনে এই বাড়ি কি করে ভাড়া দিলে ? থানার বড় দারোগা সাহেবও তাকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।

ঘর যদি ভেঙে না-ও পড়ে, সাপের কামড়েও তো মানুষটা মরতে পারে। চারদিকে সাপ কিলবিল করছে। তার ছোট মেয়েটা মরল সাপের কামড়ে।

কালিপদ অবশ্যি সাপের কথা মবিন স্যারকে বলেছে। তিনি উদাস গলায় বলেছেন, সাপ আছে থাক না। অসুবিধা কি ? সাপদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। ওরাও একটা প্রজাতি।

স্যারের কথাবার্তার ঠিক নেই। সাপ আর মানুষ এক হল। সাপ কি স্কুলে পড়াশোনা করে ? বি.এ.এম.এ পাস করে ?

তা এই সব কথা স্যারকে কে বলবে ? কালিপদের বলার ইচ্ছা করে। সাহসে কুলায় না। স্যার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে সে মহামূর্খ দপ্তরি কি কথা বলবে ? তবে একটা ভাল ব্যাপার হচ্ছে মবিন স্যারের সঙ্গে সব কথা বলা যায়। তিনি চুপ করে শুনেন। এমনভাবে শুনেন যেন খুব জ্ঞানী একজন মানুষের কথা শুনছেন। হেড স্যারের মত কথার মাঝখানে ধমক দেন না। কথার মাঝখানে বলেন না—চুপ কর গাধা।

আজ মাসের সাত তারিখ। এ মাসের বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা কালিপদ এখনো পায়নি। মবিন স্যার স্কুলে আসছেন না। অথচ টাকাটা তার বিশেষ প্রয়োজন। সে ঠিক করল মবিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। টিফিন টাইমে হেড স্যারকে বলে ছুটি নেবে। তার ধারণা ছুটি চাইলে হেড স্যার না বলবেন না। কারণ তাঁর অনেক কাজ সে করে দেয়। গত মাসের হেড স্যার একটা দুধেল গাই কিনেছেন। সেই গাইয়ের জন্য ঘাস কেটে আনার সব দায়িত্ব তার। এই দায়িত্ব সে নিঃশব্দে পালন করে। এমনভাবে করে যে তাকে দেখলে

মনে হতে পারে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে সে বিমলানন্দ উপভোগ করছে। অবশ্যি কারো জন্যে কিছু করতে কালিপদের খারাপ লাগে না। ভালই লাগে। মবিনুর রহমান স্যারের জন্যেও তার সব সময় কিছু করতে ইচ্ছা করে। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু করার সুযোগ পায়নি।

টিফিন পিরিয়ডে কালিপদ হেড স্যারের ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন জ্ঞানী মানুষকে নিজ থেকে কিছু বলা মুশকিল। হেড স্যার বললেন, কি ব্যাপার কালিপদ ?

কালিপদ মাথা চুলকাতে লাগল।

'কিছু বলবে ?'

'একটা কাজ ছিল স্যার।'

'তোমার আবার কি কাজ ? তোমার কাজ তো একটাই। স্কুলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা।'

কালিপদের মন খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের শতেক কাজ সে করে, তারপরেও কেউ যদি বলে তার কাজ শুধু হাঁটাহাঁটি করা তাহলে মনে লাগারই কথা।

'ছুটি চাও না-কি ?'

'জ্বি। টিফিন টাইমে চলে যাব।'

'টিফিন টাইমে চলে যাব ? মামার বাড়ির আব্দার ? স্কুলটা কি তোমার মামার বাংলা ঘর ? যাও যাও বিরক্ত করবে না।'

কালিপদ হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এল। আজ সকালেও সে হেড স্যারের একগাদা কাজ করেছে। হেড স্যারের গাইয়ের জন্যে ঘাস কেটে দিয়ে এসেছে। পুঁই গাছের জন্যে মাচা বেঁধেছে।

কালিপদ লক্ষ করল তার অসম্ভব রাগ হচ্ছে। রাগ হলেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। এখনো তার হাত-পা কাঁপছে। সে রাগ কমানোর জন্য বড় একটা বালতি নিয়ে পানি আনতে রওনা হল। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে রাগ কমে যায়। হেড স্যার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ, স্কুলের প্রধান। তাঁর উপর রাগ করা উচিত না।

স্কুলের টিউবওয়েলটা নষ্ট। অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। টিউবওয়েলটা ঠিক করা উচিত। কেউ ঠিক করছে না। সামান্য একটা ওয়াসারের জন্য টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। কালিপদ ঠিক করে ফেলল ময়মনসিংহ যাওয়া হলে সে নিজেই একটা ওয়াসার কিনে আনবে। এতে একটা ভাল কাজ করা হবে। সে তার জীবনে ভাল কাজ কিছুই করেনি। কখন ডাক

এসে যাবে কে জানে। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বসে আছেন। ডাক এলেই হাজিরা দিতে হবে। যমরাজ বলবেন, ওহে কালিপদ, তুমি মর্ত্যধামে ভাল কর্ম কি কি করিয়াছ ? সে তখন বলতে পারবে, স্যার স্কুলের টিউওয়েলের জন্য একটা ওয়াসার কিনেছি।

'ইহা ছাড়া অন্য কোন সৎকর্ম কি আছে ?'

'জ্বি-না।'

'খারাপ কর্ম কি কি করিয়াছ ?'

'খারাপ কাজ কিছু করি নাই স্যার।'

এইটাই কালিপদের একমাত্র ভরসা।

সে খারাপ কাজ কিছু করেনি। করবেও না।

কালিপদ পানির ভারি বালতি স্কুলের বারান্দায় রাখতে রাখতে লক্ষ করল যে, তার রাগ কমে গেছে। সে স্বস্তি বোধ করল। রাগ বেশিক্ষণ পুষে রাখা ঠিক না। তা ছাড়া হেড স্যার অন্যায্য কিছু বলেননি। সত্যি তো স্কুল কি আর তার মামার বাড়ির বাংলা ঘর ?

কালিপদ পানির বালতি রেখে মুড়ি কিনতে গেল। স্যারদের জন্যে টিফিন তৈরি হবে। এক সের মুড়ি, তিন ছটাক বাদাম। মুড়ি, বাদাম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ দিয়ে মাখানো হবে। খুব ঝাল হতে হবে। শিক্ষকরা টিফিন টাইমে তা খাবেন। তেল মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখানো কোন জটিল কাজ না। বাদামের খোসা ছাড়ানোর কাজটা জটিল। কালিপদের আঙুলে তেমন জোর নেই। ভারি কাজ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বাদামের খোসা ছাড়ানোর মত ছোট কাজ করতে কষ্ট হয়।

কালিপদের মন এখন একটু বিষণ্ন, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একগাদা কঠিন কথা শুনতে হবে। স্যাররা যখন ঝালমুড়ি খান তখন কালিপদকে অনেক কথা শুনতে হয়।

যেমন—

'লবণ দিয়ে তো বিষ বানিয়ে ফেলেছ। এতদিনেও মুড়ি বানানো শিখলে না।'

'বালি কিচকিচ করছে, ব্যাপারটা কি ? এর মধ্যে খুব কম হলেও এক পোয়া বালি আছে।'

'ন্যাতাচ্যাতা মুড়ি কোত্থেকে কিনলে ? মুড়িও চেন না ?'

এই সব কথার কোন জবাব কালিপদ দেয় না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। শুধু দু'জন লোক কখনো তাকে

কিছু বলেন না। একজন মবিনুর রহমান, অন্যজন জালালুদ্দিন স্যার। মুড়ির বাটি জালাল স্যারের সামনে রাখা মাত্র তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক তোমার ভাল করুন কালিপদ।

আজও তাই বললেন।

কালিপদ বলল, স্যারের শরীর ভাল ?

'হ্যাঁ, শরীর ভাল। মনটা ভাল না। শোন কালিপদ, তোমরা জন্য একটা চিঠি আছে।'

কালিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, চিঠি ?

'হুঁ। চিঠি। গতকাল মবিনের কাছে গিয়েছিলাম। সে তোমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়তে পার ?'

'জ্বি স্যার, পারি। উনার শরীর কেমন ?'

'বেশি ভাল না।'

মুখ বন্ধ খাম নিয়ে কালিপদ আড়ালে সরে গেল। চিঠি পড়তে পারে কি-না এটা জিজ্ঞেস করায় সে মনে কষ্ট পেয়েছে। স্কুলে চাকরি করে আর সে একটা চিঠি পড়তে পারবে না ? ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। বাবা মরে যাওয়ায় আর পড়াশোনা হল না। জালাল স্যার পুরানো লোক। উনি কেমন করে এই ভুল করেন ?

কালিপদ টিউওয়েলের পাশে বসে পর পর চারবার চিঠিটা পড়ল।

কালিপদ,

আমি খুব লজ্জিত যে যথাসময়ে তোমাকে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা দিতে পারিনি। আমার মনে ছিল তবু দেয়া হয়নি। শরীর বিশেষ ভাল না বলে স্কুলে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না। তোমার অসুবিধা সৃষ্টি করায় আমি ক্ষমা প্রার্থী। এখন টাকাটা পাঠালাম।—ইতি মবিনুর রহমান।

কালিপদের চোখে পানি এসে গেল। মবিন স্যারের মত একজন জ্ঞানী লোক বলছেন ক্ষমা প্রার্থী। সে কে ? সে কেউ না। সে একজন অধম দণ্ডরি।

কালিপদ ঠিক করে ফেলল আজ সন্ধ্যায় স্যারকে দেখতে যাবে। খালি হাতে যাবে না। কিছু-একটা নিয়ে যাবে। পাকা পেঁপে, কলা। শরীর বেশি খারাপ দেখলে রাতে থেকে যাবে। যদিও ঐ বাড়িতে থাকতে তার ভয় লাগে। সাপের ভয়। যত ভয়ই লাগুক সে যাবে। হে স্যারের গাইকে ঘাস এনে দিয়েই রওনা হবে।

সন্ধ্যার পর পর কালিপদের যাওয়া হল না। কারণ হেড স্যার হঠাৎ সদরে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর স্যুটকেস স্টেশন পর্যন্ত দিয়ে আসতে হবে। স্টেশন এখান থেকে পাঁচ মাইলের মত দূরে।

কালিপদ বিনা বাক্যব্যয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হল।

'সদরে যাচ্ছি কেন জানিস না-কি কালিপদ ?'

'জ্বে না।'

'ডিইও সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। মবিন সাহেবের গম চুরির ব্যাপারে কথা বলতে চান। ঘটনা শুনে উনি খুবই ক্ষিপ্ত। আমাকে বললেন—শুধু চাকরি থেকে ডিসমিস করলে এতবড় অপরাধের শাস্তি হয় না। অপরাধীকে জেলে ঢুকাতে হবে। আমি অবশ্যি বলেছি মানী লোক একটা ভুল করেছে। বাদ দেন। ডিইও সাবে শুনতে চান না।'

কালিপদ কিছু বলল না। গম চুরির কথা সে শুনেছে। একশ বস্তা গম স্কুলে দেয়া হয়েছিল। মবিন স্যার দস্তখত করে এনেছেন। কিন্তু একশ বস্তা না, এনেছেন মাত্র দশ বস্তা। এই নিয়ে মালা-মোকদ্দমা হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে কালিপদকে বলেন—মবিনুর রহমান গম চুরি করেছে—কালিপদ বিশ্বাস করবে না। তবে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায় আসে ? সে হল মূর্খ দপ্তরি। স্কুলে ঘণ্টা দেয়া ছাড়া সে কিছুই জানে না।

'কালিপদ।'

'জ্বি স্যার।'

'মানুষের চেহারা দেখে বুঝা মুশকিল তার ভেতরটা কেমন। মবিনকে দেখে কে বলবে—ভেতরে ভেতরে সে এত বড় শয়তান।'

কালিপদ চুপ করে রইল। কথা বলার কোন অর্থ হয় না।

'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এইটাই নিয়ম। নিয়তি কঠিন জিনিস। নিয়তির হাত এড়ানো মুশকিল। লখিন্দরের নিয়তি ছিল সাপের হাতে মরা। মরল কি-না বল। লোহার ঘর বানিয়ে লাভ হয়েছিল ?'

ট্রেন এল রাত দশটায়। আটটায় আসার কথা—দু'ঘণ্টা লেট। এই দু'ঘণ্টা কালিপদ স্টেশনে বসে রইল। হেড স্যারকে রেখে চলে আসা যায় না। মালপত্র তুলে দিতে হবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। এত রাতে মবিন স্যারের কাছে যাওয়া ঠিক না। স্যার হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানুষ সকাল সকাল ঘুমুতে যাবার কথা। তবু কালিপদ ভাবল, একবার যখন ঠিক করেছে যাবে—যাওয়াই উচিত।

স্যার ঘুমিয়ে থাকলে চলে আসবে। অসুবিধা তো কিছু নেই।

মবিনুর রহমান ঘুমাননি। তিনি তাঁর দূরবীন ফিট করেছেন। দূরবীন তাক করা হয়েছে 'অনুরাধা' নক্ষত্রের দিকে। প্রাচীন ভারতে 'অনুরাধা' একটি বিশেষ নক্ষত্র। তখন নিয়ম ছিল বিয়ের পর স্ত্রীকে সন্ধ্যাবেলা অনুরাধা নক্ষত্র দেখিয়ে

বলতে হবে—'অনুরাধার' মত দৃঢ়চিত্র ও পূত চরিত্রের হও। তারপরই শুধু স্ত্রীকে ঘরে নেয়া যাবে। আগে নয়।

কালিপদ বলল, স্যার কি করেন ?

মবিন সাহেব দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, অনুরাধা নক্ষত্র দেখি। খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র। আলো স্থির হয়ে থাকে।

তিনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন কালিপদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাতদুপুরে তার উপস্থিতি হওয়ায় মোটেই বিস্মিত হননি।

'কালিপদ !'

'জ্বি স্যার।'

'দেখবে না-কি ?'

'কি দেখব স্যার ?'

'অনুরাধা নক্ষত্র। দেখ, এইখানে চোখ লাগাও। বাঁ চোখ বন্ধ কর।'

কালিপদ দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে ও কিছুই দেখতে পেল না। মবিন সাহেব যখন বললেন, দেখা যাচ্ছে ? কালিপদ শুধুমাত্র তাঁকে খুশি করার জন্য বলল, জ্বি স্যার। বড়ই সৌন্দর্য।

'হ্যাঁ, সুন্দর তো বটেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুরোটাই সুন্দর। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু তাঁর জগতে স্থান দেননি।'

কালিপদ প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে স্যার ?

'না। রান্না করিনি এখনো।'

'আপনি স্যার কাজ করেন, আমি রান্না করে ফেলি।'

'আচ্ছা।'

'ঘরে তেল মশলা আছে তো স্যার ?'

'সব আছে। গতকাল বাজার করেছি।'

'আপনার শরীর শুনেছিলাম খারাপ।'

'না শরীর ঠিক আছে। মাঝে মাঝে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখি, তখন সব উলট-পালট হয়ে যায়।'

'কি দেখেন ?'

'দেখি কয়েকটা বুড়ো মানুষ। এদের শরীর দেখা যায় না, শুধু মুখ দেখা যায়। এরা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।'

'দেখতে কেমন স্যার ?'

'লম্বা মুখ। সামান্য দাড়ি আছে...'

বলতে বলতে মবিনুর রহমান অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, কালিপদ।

'জ্বি স্যার।'

রূপাকে আজ পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারিনি। শরীরটা ভাল লাগছে না। কয়েকদিন যাব না। আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি, তুমি মেয়েটাকে দিয়ে এসো। কাল ভোর বেলা দিলেই হবে।

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

চিঠি খুব সাদামাটা—'রূপা, আমি কয়েকদিন আসতে পারব না। তুমি নিজে নিজে পড়। মন নানান কারণে অস্থির হয়ে আছে। একটু স্থির হলেই আসব।'

চিঠি সাদামাটা হলেও কিন্তু সাদামাটা নয়। চিঠির উল্টো পিঠে তিনি অসংখ্যাবার লিখেছেন—রূপা, রূপা। এর পেছনেও একটা লজিক আছে। বল পয়েন্টের কলমে কালি আটকে যাচ্ছিল, তিনি কলম ঠিক করার জন্যেই রূপা রূপা লিখেছেন। অন্য কিছুও লিখতে পারতেন। লিখেননি কারণ চিঠিটি যেহেতু রূপাকে লিখবেন সেহেতু তাঁর নামই মনে এসেছে। আবার এও সত্যি যে, এই নামটাই তিনি অসংখ্যাবার লিখতে চেয়েছেন। অজুহাত হিসেবে ভাবছেন কলমে কালি আটকে যাচ্ছে বলে—অসংখ্যবার রূপার নাম লিখতে হয়েছে। কোনটা সত্যি কে জানে, হয়ত সবটাই সত্যি।

এই বিশেষ চিঠিটি রূপার হাতে আসার আধঘণ্টা আগে মজার একটা ব্যাপার হল। জেবা এসে বলল, ফুপু কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি এমন একটা কিছু পাবে যে আনন্দে তোমার মরে যেতে ইচ্ছা করবে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হবে।

'কি পাব ?'

'কি পাবে তা জানি না, তবে কিছু-একটা পাবে।'

রূপা বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে অদ্ভুত কথা তুমি বল।

তার কিছুক্ষণ পর কালিপদ চিঠিটা দিল। রূপার আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছা করল। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছা করল পৃথিবীর সব মানুষকে ডেকে বলে—দেখ, তোমরা দেখ, স্যার কতবার আমার নাম লিখেছেন।

রূপার চোখে পানি এসে গেছে। জেবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন। তবে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব আজ একটু ব্যস্ত। ব্যস্ততার নানাবিধ কারণের একটি হচ্ছে নেত্রকোনা থেকে সিও রেভিন্যু এসেছেন গম চুরির

তদন্তে। ভদ্রলোকের বয়স অল্প। নিতান্তই চেংড়া ধরনের। অল্পবয়স্ক অফিসাররা ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবে না। দশজনের কথা শুনতেও চায় না। হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। গরম গরম কথা বলে। মানী লোকের মান রাখতে জানে না।

হাফিজুল কবির সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করছেন। সিও সাহেব স্কুলে পা দেয়ার পরপরই তাঁকে দৈ মিষ্টি দেয়া হয়েছে। চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কালিপদ স্কুলের বারান্দায় কেরোসিন কুকারে চা বসিয়ে দিয়েছে। হাফিজুল কবির সাহেব এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এনে সিও সাহেবের সামনে রেখেছেন। তিনি প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। এটা আশার কথা। যদি বলতেন—সিগারেট কেন ? তাহলে চিন্তার ব্যাপার হত।

সিও সাহেব বললেন, গম চুরির ব্যাপারে আপনারা নিজেরা কোন তদন্ত করেছেন ?

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, জ্বি না স্যার।

'করেননি কেন ?'

'তদন্ত কমিটি করা হয়েছে ; কিন্তু কমিটির বৈঠক বসেনি।'

'বৈঠক বসল না কেন ?'

'সেটা স্যার আমি বলতে পারি না। আমি কমিটিতে নেই।'

'মবিন সাহেবকে কি আপনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছেন ?'

'কি জিজ্ঞেস করব ? আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

'গম চুরির বিষয়ে তাঁর কি বলার আছে তা জানতে চেয়েছেন ?'

'জ্বি-না।'

'জিজ্ঞেস করেননি কেন ?'

'মানী লোক। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল।'

'ডাকুন, উনাকে ডাকুন। আমি জিজ্ঞেস করি...'

'উনি স্যার স্কুলে আসেননি। কয়েকদিন ধরেই আসছেন না।'

'আই সি।'

'লজ্জাতেই বোধ হয় আসতে পারছেন না।'

'চুরি করবার সময় মনে ছিল না, এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। শুনুন হেড মাস্টার সাহেব, এ্যাডমিনিস্ট্রেশান খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নিয়েছে। আপনি জানেন কি-না জানি না। জাতীয় দৈনিকে চিঠি ছাপা হয়েছে।'

'বলেন কি স্যার ?'

হেড মাস্টার সাহেব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন। চিঠি ছাপার ব্যাপারটা তিনি খুব ভালমত জানেন। চিঠি তাঁরই লেখা। নেত্রকোনা গিয়ে নিজের হাতে

পোস্ট করেছেন। সব ক'টা দৈনিকে চিঠি দিয়েছিলেন। শুধু একটাতে ছাপা হয়েছে। হেড মাস্টার সাহেব বললেন, চিঠিতে কি লেখা স্যার ?

সিও সাহেব ব্রিফ কেইস থেকে খবরের কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন। বিরস মুখে বললেন, কাগজটা আপনার কাছে রেখে দিন। হেড মাস্টার সাহেব অনেকবার পড়া চিঠি আবারো পড়লেন—

সরিষায় ভূত

নেত্রকোনা নীলগঞ্জ হাই স্কুলে সম্প্রতি গম চুরির এক কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত স্কুলের জনৈক প্রবীণ শিক্ষক স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০ বস্তা গমের মধ্যে ৯০ বস্তা গায়েব করিয়া দেন। এই ঘটনা অত্র অঞ্চলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাদের হাতে শিশু-কিশোরদের নীতি শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত তাহারা যদি চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হন তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি ? জনগণের মনে আজ এই প্রশ্নই আলোড়িত হইতেছে।

জনৈক অভিভাববক
নীলগঞ্জ হাই স্কুল।

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল ?

সিও সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল এটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি ? আমরা এ্যাকশন কি নিয়েছি সেটা হল কথা। ক্রিমিন্যাল কেইস করা হয়েছে ?

'জ্বি-না স্যার। শুধু জিডি এন্ট্রি করেছি।'

'কেইস করে দিন। মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব পাবলিক ফান্ড।'

'সেটা কি স্যার ঠিক হবে ?'

'অবশ্যই ঠিক হবে। এই সঙ্গে সাসপেনসন অর্ডার দিয়ে দিন।'

'সাসপেনসন ?'

'হ্যাঁ।'

'স্কুলে স্যার এ-রকম ব্যবস্থা নেই।'

'ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা করুন। স্কুলে গভর্নিং বডির মিটিং দিন। মিটিং-এ ডিসকাস করুন।'

'আপনি বললে অবশ্যই করব।'

'মনে রাখবেন, বর্তমান সরকার এ-জাতীয় কেলেংকারি সহ্য করবে না। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমাদেরই তৈরি করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় চিঠি ছাপা হয়ে গেছে। জনমত তৈরি হয়ে গেছে। আর অবহেলা করা যায় না।'

'তা তো বটেই স্যার।'
'গভর্নিং বডির মিটিং ডাকুন। আজই ডাকুন।'
'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

গভর্নিং বডির মিটিং-এ পত্রিকায় ছাপা চিঠি পড়া হল। হেড মাস্টার সাহেব সিও রেভিন্যু সাহেব যা যা বলে গিয়েছেন সব আবারো বললেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাইভেট স্কুল হলেও সরকারি চাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব না। আমরা গভর্নমেন্ট ডিএ নেই। ডিএ বন্ধ হয়ে গেলে স্কুল উঠিয়ে দিতে হবে।

গভর্নিং বডির একজন মেম্বার হলেন রূপার বাবা আজফাল সাহেব। তিনি বললেন, পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। মবিনুর রহমান এই কাজ করতে পারেন না। কোথাও ভুল হয়েছে। অবশ্যই ভুল হয়েছে।

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, ভুল হবার কোন ব্যাপার না। মবিন সাহেব সিগনেচার করে গম নিয়েছেন।

'আত্মভোলা মানুষ। তাঁকে প্যাঁচে ফেলে আটকানো হয়েছে। এটা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।'

'গমের দায়িত্ব তাহলে কে নিবে?'

ঘণ্টাখানিক আলাপ-আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। আফজাল সাহেব মন খারাপ করে ঘরে ফিরলেন। মবিনুর রহমানকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি বুঝতে পারছেন মবিনুর রহমান কোন-একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে এই চক্রান্তে হেড মাস্টার সাহেবের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু কি ভূমিকা তা ধরতে পারছেন না। মবিনুর রহমানের সঙ্গে হেড মাস্টার সাহেবের কোন শত্রুতা থাকার কথা নয়। একদল মানুষ আছে যাদের কখনো কোন শত্রু তৈরি হয় না। মবিনুর রহমান সেই দলের মানুষ। কিন্তু এখানে তিনি কি করে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলেন? এই ঝামেলা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি?

আফজাল সাহেবের মন-খারাপ ভাব বাসায় এসে কেটে গেল। কি কারণে মন খারাপ তাও পর্যন্ত মনে রইল না। তাঁর মেজো ছেলে জহির এসেছে চিটাগাং থেকে। সঙ্গে তার বন্ধু তানভির। রাজপুত্রের মত ছেলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। ছেলের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই তাঁর মনে হল যে ভাবেই হোক এই ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে। একে কিছুতেই হাতছাড়া করা

যাবে না। তিনি ঘাটে লোক পাঠালেন ভাল মাছের জন্যে। যাকে পাঠালেন তার উপর ঠিক ভরসা করতে পারলেন না। নিজেই খানিকক্ষণ পর রওনা হলেন। তানভির বলল, চাচা আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

'মাছের জন্যে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঘাটে খুব ভাল মাছ পাওয়া যায়।'

'চাচা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?'

'যেতে চাও ?'

'অবশ্যই যেতে চাই।'

'রাস্তায় কিন্তু খুব কাদা।'

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমি খালি পায়ে যাব।

ঘাট থেকে সবচে' বড় চিতল মাছটি কেনা হল। আফজাল সাহেব মাছের দাম দিতে পারলেন। না। তানভির দাম দিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাতে খাবার সময় তানভির বলল, আমি তো চিতল মাছ খাই না।

আফজাল সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, সে কি ! চিতল মাছ খাও না তাহলে কিনলে কেন ? ঘাটে আরো তো মাছ ছিল।

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার পরিকল্পনা ছিল সবচে' বড় মাছটি কিনব। তাই কিনেছি। কিনেছি বলেই যে খেতে হবে সে রকম তো কোন আইন নেই।

তানভির হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা আশেপাশের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পছন্দ করে। এবং অতি সহজেই তা পারে। রাত দশটায় সে ঘোষণা করল—ম্যাজিক দেখানো হবে। বাচ্চারা যারা এখনো ঘুমাওনি চলে এসো। বাচ্চা বলতে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেবা জেগে আছে। তবে সে কঠিন মুখে বলল, ম্যাজিক আমার ভাল লাগে না। আমি দেখব না। রূপাও বলল, তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, সে কিছু দেখবে না।

মিনু বলল, পাগলামি করো না তো রূপা। এসো। এমন চমৎকার একটা ছেলে আর তুমি মুখ শুকনো করে আছ ? কি কাণ্ড ! শাড়ি বদলে একটা ভাল শাড়ি পর।

রূপা বলল, বেনারসী পরব ?

'বেনারসী তো পরবেই। কয়েকটা দিন পর। আপাতত সুন্দর একটা শাড়ি পর। নীল সিল্কের শাড়িটা পর।'

'নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেখতে যাব ?'

'সাজা তো অপরাধ না।'

'আমার ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া ভাবি বিশ্বাস কর, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'এসো তো তুমি। আমাদের তরুণ ম্যাজিসিয়ান সাহেব তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেবেন। আর যদি সারাতে না পারেন তাহলে আমার কাছে এ্যাসপিরিন আছে।'

গ্রহরা যেমন নক্ষত্রকে ঘিরে রাখে তানভিরকে তেমনি সবাই ঘিরে আছে। আসরের মধ্যমণি হয়ে সে বসে আছে নক্ষত্রের মতই। তার সামনে একটা খবরের কাগজ। এই কাগজ দিয়েই ম্যাজিক দেখানো হবে। আপাতত গল্প-গুজব হচ্ছে। কথক তানভির একা। বাকি সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। রূপা শাড়ি বদলেছে। চুল বেঁধেছে। মিনু খুব হালকা করে রূপার চোখে কাজলও দিয়েছে। তার প্রয়োজন ছিল না। রূপাকে এম্নিতেই ইন্দ্রানীর মত দেখায়।

তানভিরের গল্প বলার কৌশল চমৎকার। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাচ্ছে এত সহজে যে মাঝে মাঝে মনে হয় সব গল্প বোধহয় সাজানো। নম্বর দেয়া আছে কোন গল্পের পর কোনটি বলা হবে। সে রূপার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের চেনা মানুষের মত বলল, রূপা তুমি কি মোনালিসার ছবি দেখেছ?

রূপা হকচকিয়ে গেল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষ পরিচিতের ভঙ্গিতে কথা বললে হকচকিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'দেখেছ মোনালিসার বিখ্যাত ছবি?'

'জ্বি।'

'অরিজিন্যাল নিশ্চয়ই দেখনি—রিপ্রডাকশান দেখেছ। দেখারই কথা। পৃথিবীর অন্য কোন ছবি এত খ্যাতি পায়নি। এত লক্ষ কোটি বার অন্য কোন ছবির রিপ্রডাকশানও হয়নি। বলা যেতে পারে মোনালিসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচে' খ্যাতনামা মহিলা। অফকোর্স ছবির মহিলা। এখন বল দেখি এই মহিলার বিশেষত্ব কি?'

'চোখ!'

'উহুঁ, চোখ না। যদিও সবাই চোখ চোখ বলে মাতামাতি করে তবু আমার মনে হয় অন্য কিছু। কি তা-কি জান?'

'না।'

'মোনালিসার ভুরু নেই। এই জগদ্বিখ্যাত মহিলার জগদ্বিখ্যাত চোখের ভুরু নেই। কি, ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

রূপা কিছু না বললেও মনে মনে স্বীকার করল ব্যাপারটা অদ্ভুত। তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার কথা বোধহয় ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি

হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমার মানিব্যাগে মোনালিসার পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি আছে।

তানভির মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করল। ছবি সবার হাতে হাতে ফিরছে। সবাই চোখ কপালে তুলে বলছে—তাই তো ! তাই তো ! রূপার একটু মন খারাপ লাগছে। কারণ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এই মানুষটির প্রতিটি গল্প সাজানো। সাজানো বলেই মানিব্যাগে মোনালিসার ছবি রেখে দেয়া।

'আচ্ছা, এখন শুরু হবে ম্যাজিকের খেলা। এখানে একটা খবরের কাগজ আছে। সবার সামনে কাগজ কেটে আমি দু'খণ্ড করব, তারপর জোড়া দেব।'

জহির বলল, আমি কাটতে পারি ? না-কি ম্যাজিসিয়ানকেই কাটতে হবে ?

'যে কেউ কাটতে পারবে।'

মিনু বলল, রূপা কাটুক, রূপা।

রূপা কাগজ কাটল। কাটা কাগজ রুমাল দিয়ে ঢাকা হল। রূপা ভেবেছিল রুমাল উঠাবার পর দেখা যাবে কাগজ জোড়া লেগেছে। রুমাল উঠাবার পর দেখা গেল কাগজের টুকরাগুলো নেই। সেখানে সুন্দর একটা কাগজের ফুল। সোবাহান সাহেবের মত মানুষও চেঁচিয়ে বললেন, অপূর্ব, অপূর্ব ! অপূর্ব !!

আসর ভাঙল রাত বারোটায়। রূপা ঘুমুতে গিয়ে দেখল জেবা এখনো জেগে। মশারি ফেলে মশারির ভেতর চুপচাপ বসে আছে। রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনো জেগে ?

'হুঁ।'

'কেন ? ঘুম আসছে না ?'

'না।'

রূপা হালকা গলায় বলল, আমরা সুন্দর ম্যাজিক দেখলাম। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমারও ভাল লাগত। এসো এখন ঘুমানো যাক। ঘুমানোর আগে কি পানি খাবে ? বাথরুমে যাবে ?

'না।'

বাতি নিভিয়ে রূপা মশারির ভেতর ঢুকতেই জেবা বলল, ফুপু ঐ লোকটা তোমাকে পছন্দ করেছে। খুব বেশি পছন্দ করেছে। এখন সবাই মিলি ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

রূপা হালকা গলায় বলল, দিলে দিবে। কি আর করা।

জেবা রূপার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, এখন থেকে এই বাড়িতে দু'টা দল হল। ঐ লোকটার একটা দল। সবাই সেই দলে। আর তোমার একার একটা দল। তোমার দলে শুধু আছি আমি একা।

রূপা বলল, কি সব অদ্ভুত কথা যে তুমি বল। এখন ঘুমাও তো।

জেবা বলল, আমি মোটেও অদ্ভুত কথা বলছি না। আমি যে অদ্ভুত কথা বলছি না তুমি তাও জান। খুব ভাল করে জান।

রূপা বলল, ঘুমাও তো জেবা। প্লীজ ঘুমানোর চেষ্টা কর।

'আচ্ছা।'

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। রূপা ঘুমুতে পারল না। রাতজাগা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। জেগে থাকতে খারাপও লাগছে না। তক্ষক ডাকছে। গভীর রাতে তক্ষকগুলি অন্য রকম করে ডাকে। দিনে তাদের ডাক এক রকম, রাতে অন্য রকম। স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। উনি নিশ্চয়ই চমৎকার কোন ব্যখ্যা দেবেন। স্যারকে একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে ধাঁধা জিজ্ঞেস করলে উনি খানিকটা হকচকিয়ে যান এবং এমন অস্থির বোধ করেন যে রূপারই খারাপ লাগে। একবার সে স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার বলুন তো এটা কি—আমবাগানে টুপ করে শব্দ হল। একটা পাকা আম গাছ থেকে পড়েছে।

যে দু'জন শুনল সে দু'জন গেল না।
অন্য দু'জন গেল ঢ়ঢ়
যে দু'জন গেল সে দু'জন দেখল না।
অন্য দু'জন দেখল ঢ়ঢ়
যে দু'জন দেখল সে দু'জন তুলল না।
অন্য দু'জন তুলল ঢ়ঢ়
যে দু'জন তুলল সে দু'জন খেল না।
অন্য একজন খেল ঢ়ঢ়

স্যার এখন বলুন ব্যাপারটা কি ?

তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। করুণ গলায় বললেন—ব্যাপারটা তো মনে হচ্ছে খুব জটিল।

'মোটেই জটিল না স্যার। অত্যন্ত সহজ।'

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, জটিল জিনিসের ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়। সহজ জিনিসের ব্যাখ্যাই জটিল।

রূপার মনে হল স্যারের কথাটা তো খুব সত্যি। ভালবাসা ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ কিন্তু ব্যাখ্যা কি অসম্ভব জটিল না ?

তক্ষক ডাকছে। জেগে আছে রূপা। আজ রাতটাও মনে হচ্ছে তাকে জেগেই কাটাতে হবে।

কিছু-একটা হয়েছে রূপাদের বাড়িতে।

সবার মুখ হাসি হাসি। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। বড় ধরনের আনন্দের কোন ঘটনা এ-বাড়িতে ঘটে গেছে কিংবা ঘটতে যাচ্ছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কেউ আলোচনা করতে চাচ্ছে না। আলোচনা করতে না চাইলেও রূপার ধারণা সে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

বিকেলে মিনু বলল, রূপা শুনে যাও তো। এসো আমার সঙ্গে।

'কোথায় ?'

'ছাদে।'

'কোন গোপন কথা ?'

'গোপন কথা কিছু না, প্রকাশ্য কথা—ছাদে তোমার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলব।'

রূপা ছাদে গেল। মিনু তার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, তানভির জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখতে চায়। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবে।

'এটাই তোমার প্রকাশ্য কথা ?'

'না এটা প্রকাশ্য কথা না। প্রকাশ্য কথা হল—তানভির কাল রাতে ম্যাজিকের আসর শেষ হবার পরে তোমার ভাইয়াকে বলেছে—সে তোমাকে পছন্দ করেছে। শুধু পছন্দ না, অসম্ভব পছন্দ করেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'ঘটনা এইখানেই শেষ না। আজ ভোরে সে বলেছে, সে এই আমাদের বাড়িতেই তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর বউ নিয়ে চলে যাবে।'

'এত তাড়া কেন ?'

'তাড়া না। কথা এমনই ছিল। সে খুব খেয়ালি ছেলে। আমাদের এখানে আসার আগে তার বাবা তোমার মেজো ভাইকে খবর দিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন—আমার ছেলে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে ওকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। এই ছেলে বড় যন্ত্রণা করছে। কিছুতেই তাকে বিয়ে করাতে রাজি করানো যাচ্ছে না।

রূপা বলল, বিয়েটা হচ্ছে কবে ? আজই না-কি ?

মিনু হাসতে হাসতে বলল, তোমার ভাইদের ইচ্ছা আজ সন্ধ্যাতেই মৌলানা ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়া। তা তো সম্ভব না। সবাইকে খবর দিতে হবে। ছেলের আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে হবে। দিন সাতেক তো লাগবেই।

'এই সাতদিন আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গ্রাম দেখাব, নদী দেখাব ?'

'হ্যাঁ, বন্ধুর মত পাশাপাশি থাকবে।' প্রেম প্রেম খেলবে।

রূপা সহজ গলায় বলল, আচ্ছা।

মিনু বলল, তোমার ভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে রূপা।

রূপা বলল, আমার নিজেরই ঈর্ষা হচ্ছে, তোমার তো হবেই। আমি বৃশ্চিক রাশির মেয়ে। বৃশ্চিক রাশির মেয়েদের ঈর্ষা না করে উপায় নেই। এরা হয় খুব উপরে উঠবে কিংবা ধুলার সঙ্গে মিশে যাবে। এদের কোন মধ্যম পন্থা নেই।

'কে বলেছে ?'

'রাশিচক্র বলে একটা বই পড়ে সব জেনে বসে আছি।'

রূপা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। এই হাসি মিনুর ভাল লাগল না। তবে সে সাজগোজ করতে মোটেই আপত্তি করল না। আকাশি রঙের একটা শাড়ি পরল। যা কখনো করে না তাই করল, মা'র কাছ থেকে চেয়ে গয়না পরল। দীর্ঘ সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। জেবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জেবাকে বলল, কেমন দেখাচ্ছে জেবা ?

জেবা হাসল। জবাব দিল না।

'বল তো আমাকে ইন্দ্রানীর মত লাগছে কি-না ?'

জেবা এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। আবারো হাসল। যেন সে রূপার ছেলেমানুষিতে খুব মজা পাচ্ছে।

রাস্তায় নেমেই রূপা বলল, আপনি কোন দিকে যেতে চান ?

'তানভির বলল, যে-দিকে ইচ্ছা সেদিকে যেতে পারি।'

'নদী দেখবেন ? নদী ?'

'অবশ্যই নদী দেখব ? বাঙালি ছেলে হয়ে নদী দেখব না, তা-কি হয়।'

'হাঁটতে হবে কিন্তু।'

'হাঁটতে হলে হাঁটব। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকা থেকে হেঁটে মানিকগঞ্জ গিয়েছিলাম। ননস্টপ হাঁটা। পথে একবার শুধু একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি। ভাল কথা রূপা, চা ভর্তি একটা ফ্লাস্ক সঙ্গে নিলে হত না ? নদীর তীরে বসে চা খাওয়া যেত।'

'আমি আপনাকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা করব।'

'কিভাবে করবে ?'

'আমি যেখানে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আমার এক স্যারের বাসা। স্যারের বাসা থেকে চা বানিয়ে আনব। ঘাটে স্যারের একটা নৌকা আছে। সব সময় নৌকা বাঁধা থাকে। ঐ নৌকায় বসে চা খাব।'

'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।'

'আপনি নৌকা বাইতে পারেন ?'

'পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। নৌকা চালানো খুব কঠিন হবার কথা না। নৌকা তো এরোপ্লেন না।'

'নৌকা চালানো যথেষ্টই কঠিন।এরোপ্লেন চালানোর জন্যে কত যন্ত্রপতি আছে। বোতাম টিপলেই হল। নৌকার তো কোন বোতাম নেই।'

তানভিরের কাছে মেয়েটিকে আজ অন্য রকম লাগছে। স্মার্ট একটি মেয়ে যে কথার পিঠে কথা বলতে পারে এবং গুছিয়ে বলতে পারে। মেয়েটি বড় হয়েছে গ্রামে অথচ কত সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে। গল্প করছে। বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই।

রূপা বলল, আমার স্যারকে দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

'কেন বল তো ?'

'খুব জ্ঞানী মানুষ। সন্ন্যাসীদের মত। চিরকুমার।'

তানভির সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কিছু কিছু মানুষ আছে টাকা-পয়সার অভাবে এবং সাহসের অভাবে বিয়ে করতে পারে না। তারা হয়ে যায় চিরকুমার। কিছু কিছু পাগলামি তাদের মধ্যে চলে আসে। এইসব দেখতে আমাদের ভাল লাগে। এর বেশি কিছু না।'

'স্যারের মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তাঁর একটা টেলিস্কোপ আছে। তিনি এই টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের পর রাত তারা দেখেন।'

'এটাই কি পাগলামি না ? তিনি নিশ্চয়ই এস্ট্রনমার না বা এসট্রো ফিজিসিস্ট না। হিসাব নিকাশ করছেন না, তারাদের গতিপথ বের করছেন না। শখের বসে আকাশ দেখছেন। সেটা তো একবার দেখলেই হয়। রাতের পর রাত হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন কি ?'

রূপা হেসে ফেলল।

তানভির বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছ কেন ?

'আপনি কেমন রাগ করছেন তাই দেখে হাসছি। যে মানুষটিকে আপনি এখনো দেখেননি তাঁর উপর রাগ করছেন কেন ?'

'তাঁর উপর রাগ করছি না। তোমার বিচার-বিবেচনা দেখে রাগ করছি। তোমাদের মত বয়েসী মেয়েদের এই সমস্যা। তারা অতি অল্পতেই অভিভূত। একজন হয়ত কবিতা লেখে। তার মাথা ভর্তি লম্বা চুল। ময়লা পাঞ্জাবি পরে উদাস মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার একটি কবিতা না পড়ে শুধুমাত্র তাকে দেখেই তোমরা অভিভূত হয়ে যাবে। চোখ বড় বড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলবে, কবি কবি।

রূপা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

তানভিরও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, লর্ড বায়রনের কথা তুমি জান কি-না জানি না। বড় কবি। ইংল্যান্ডের সব তরুণী কবিতা না পড়েই এই মানুষটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অথচ মানুষটা ছিলেন খোঁড়া, তিরিক্ষি মেজাজ। কেউ তাঁর দিকে তাকালেই রেগে যেতেন। তিনি বিয়ের দু'ঘণ্টা পর নববধূকে কাছে ডেকে বললেন, এ্যাই শোন, তোমাকে আমি কেন বিয়ে করেছি জান ? তোমাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি বলেই বিয়ে করেছি।

রূপা বলল, বায়রনের কোন কবিতা কি আপনার জানা আছে ?

'না। তুমি পড়তে চাইলে জোগাড় করে দেব। অনেক দূর এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। আর কতক্ষণ ?'

'ঐ যে ভাঙা বাড়িটা দেখছেন—ঐটা।'

তানভির বিস্মিত হয়ে বলল, ঐ বাড়ি তো যে কোন মুহূর্তে ভেঙে মাথার উপর পড়বে। কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এই বাড়িতে বাস করতে পারে না। অসম্ভব।

তানভিরের কথা ভুল প্রমাণ করে ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন এবং নিতান্তই সহজ গলায় বললেন, রূপা আস। যেন তিনি রূপার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

রূপা বলল, স্যার ইনি মেজো ভাইয়ের বন্ধু। আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন। গ্রাম দেখতে বের হয়েছেন।

মবিনুর রহমান বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

তানভির কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রূপা বলল, স্যার আপনার নৌকাটা কি ঘাটে আছে ?

'হ্যাঁ আছে।'

'আমরা আপনার নৌকায় বসে চা খাব। ঘরে চা পাতা আছে স্যার ?

'আছে, চা পাতা আছে। তবে চিনি নেই। গুড় দিয়ে চা খেতে হবে। তোমরা নৌকায় গিয়ে বস, আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'আপনাকে চা বানাতে হবে না স্যার। আমি বানাব। কোনটা কোথায় আছে আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন।'

রূপা চা বানাতে বসল। তানভির মবিনুর রহমানের পাশে একটা চৌকিতে বসল। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বাড়ির ছাদ ভেঙে মাথায় পড়বে। তবে তারো আগে যে চৌকিতে বসেছে সেই চৌকিও ভেঙে টুকরো টুকরো হবে। মটমট শব্দ করছে।

তানভির বলল, রূপা বলছিল আপনি না-কি টেলিস্কোপ দিয়ে সারারাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মবিনুর রহমান নিচু গলায় বললেন, এটা আমার একটা শখ। তবে সবদিন দূরবীন নিয়ে বসি না। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন বসি।

'কি দেখেন?'

'তারা দেখি।'

'একই তারা বার বার দেখতে ভাল লাগে?'

'জ্বি লাগে। তারা দেখি আর ভাবি।'

'কি ভাবেন?'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি করে তৈরি হল তাই ভাবি।'

'আপনার এই ভাবনা তো পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন। বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্সের সৃষ্টি।'

'এটা নিয়েই ভাবি। বিগ বেংগের আগে কি ছিল? অনন্ত শূন্য ছিল? যদি তাই থাকে তাহলে তো বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্স সৃষ্টি হতে পারে না।'

'অসুবিধা কোথায়?'

'তাহলে ধরে নিতে হবে থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র কাজ করছে না। তা তো হয় না। প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম কখনো ভঙ্গ করে না।'

'আপনি তা কি করে জানেন?'

'কেন জানব না? আমিও তো প্রকৃতিরই অংশ।'

'আপনার দূরবীনটা কি খুব ভাল দূরবীন?'

'জ্বি। শনি গ্রহের বলয় পরিষ্কার দেখা যায়। এক রাতে সময় করে আসুন। আপনাকে দেখাব।'

'এখানে আসতে খুব ভরসা পাচ্ছি না। বাড়ির যা অবস্থা। যে কোন মুহূর্তে ছাদ মাথার উপর ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে—তাছাড়া আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এ-বাড়িতে বিষাক্ত সাপ আছে। ভাঙা বাড়ি সাপদের খুব প্রিয়।'

মবিনুর রহমান সহজ গলায় বললেন, সাপ আছে ঠিকই। দুটো চন্দ্রবোড়া সাপ পাশের ঘরে থাকে।

'সাপ আপনি চেনেন ? চন্দ্রবোড়া বুঝলেন কি করে ?'

'অনুমানে বলছি। সব সাপ ডিম দেয়। এই সাপটা সরাসরি বাচ্চা দিয়েছে। একমাত্র চন্দ্রবোড়াই সরাসরি বাচ্চা দেয়। একত্রিশটা বাচ্চা দিয়েছে।'

'বসে বসে গুণেছেন ?'

'জ্বি না। একদিন বারান্দায় বসে ছিলাম। দেখলাম, সাপটা বাচ্চাগুলি নিয়ে বের হয়েছে। তখন গুণলাম।'

'একত্রিশটা সাপের বাচ্চা এবং দু'টা সাপ নিয়ে বাস করতে আপনার ভয় লাগে না ?'

'একটু লাগে। রাতে আমি ঘরে থাকি না। নৌকায় ঘুমাই। তবে আমার মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আমরা সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছি। আমি ওদের কিছু বলি না। ওরাও আমাকে কিছু বলে না। ওরা আমার গায়ের গন্ধ চেনে। আমিও ওদের গায়ের গন্ধ চিনি। আগেভাগেই সাবধান হয়ে যাই।'

চা তৈরি হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান ফ্লাস্ক এনে দিলেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে তিনি নৌকায় রাত্রিযাপন করেন। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, খাবার-দাবার তো কিছু নেই রূপা। মুড়ি আছে। মুড়ি নিয়ে যাবে ?

'হ্যাঁ, নিয়ে যাব। আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

রূপা, তানভিরকে নিয়ে নৌকায় উঠে খুশি খুশি গলায় বলল, সুন্দর না ?

তানভির বলল, অবশ্যই সুন্দর। নৌকায় বসে চা খাওয়ার এই আইডিয়া অসাধারণ আইডিয়া। আমরা রোজ এখানে আসব। নৌকা চালানো শিখে নেব।

'নদীতে কিন্তু খুব স্রোত।'

'হোক স্রোত। স্রোত কোন সমস্যা না।'

'গুড়ের চা কেমন লাগছে ?'

'অসাধারণ লাগছে। এই পরিবেশে সবকিছুই অসাধারণ লাগে।'

'আমার স্যারকে আপনার কেমন লাগল ?'

'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। তবে এই জাতীয় ক্যারেক্টার আমি আগেও দেখেছি। এরা কিছুটা অদ্ভুত। তবে যতটা না অদ্ভুত মানুষের কাছে তারা নিজেদের তার চেয়েও অদ্ভুত করে তুলে ধরে।'

রূপা বলল, স্যার সম্পর্কে আমি আপনাকে খুব-একটা গোপন কথা বলতে পারি। বলব ?

'বল !'

'কাউকে কিন্তু বলতে পারবেন না। অসম্ভব গোপন কথা, পৃথিবীর কেউ জানে না। আমি কাউকে বলিনি। শুধু আপনাকে বলব, তবে কথা দিতে হবে আপনি কাউকে বলবেন না।'

'অবশ্যই আমি কাউকে বলব না।'

'কথাটা কি জানেন ? স্যারকে আমি পাগলের মত পছন্দ করি। সব সময় আমি উনার কথা ভাবি। রাতের পর রাত আমি ঘুমুতে পারি না। আমি ঠিক করেছি যে ভাবেই হোক তাঁকে বিয়ে করব। বাকি জীবন কাটিয়ে দেব তাঁর সেবা করে।'

তানভির অবাক হয়ে রূপার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ হয়েছে মাছের চোখের মত। চোখে পলক পড়ছে না।

রাতের খাবার দেয়া হয়েছে।

রূপা বলল, আমি আগে আগে খেয়ে নেব। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। মিনু বলল, তুমি আমার সঙ্গে খাবে রূপা। সেকেন্ড ব্যাচে।

'ভাবি তুমি তো খাও থার্ড ব্যাচে। রাত এগারোটা বাজে খেতে খেতে।'

'আজ তুমিও রাত এগারোটায় খাবে। এসো আমার ঘরে। তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে।'

'ক্ষিধেয় তো মরে যাচ্ছি ভাবি।'

মিনু গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ এত সহজে মরে না রূপা।

রূপা মিনুর ঘরে ঢুকলো। ভাবি কি বলবেন তা সে আঁচ করতে পারছে। তানভির সব কিছুই প্রকাশ করেছে। সে নিশ্চয় জনে জনে বলেনি। প্রথমে বলেছে ভাইয়াকে, সেখান থেকে শুনেছে ভাবি, ভাবির কাছ থেকে শুনেছে মা। মা'র কাছ থেকে বাবা। সবাই অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকে দেখছে। বাবা তখন থেকে বারান্দায় বসে আছেন। বাবার এমন গম্ভীর মুখ সে এর আগে কখনো দেখেনি।

মিনু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। রূপা বলল, দরজা বন্ধ করছ কেন ভাবি ?

'তোমার সঙ্গে যে-বিষয় নিয়ে কথা বলব আমি চাই না তা কেউ শুনুক, এই জন্যেই দরজা বন্ধ করছি। তুমি পা তুলে আরাম করে বিছানায় বস।'

রূপা তাই করল। মিনু বলল, তুমি তানভির সাহবকে কি বলেছ ?

'অনেক কিছুই তো বলেছি। তুমি কোনটা জানতে চাচ্ছ ?'

'অনেক কিছু মানে কি ?'

'অনেক কিছু মানে অনেক কিছু। আমি প্রচুর বকবক করেছি।'

'তুমি যে প্রচুর বকবক করেছ তা বুঝতে পারছি। বকবক করতে গিয়ে ভয়ংকর সব কথা বলেছ।'

'আমি কোন ভয়ংকর কথা বলিনি।'

'অবশ্যই বলেছ—তুমি কি বলনি যে ঘাটের মরা ঐ বুড়ো মাস্টার সাহেবের প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ?'

'বলেছি।'

মিনু ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি তুমি ঠাট্টা করে বলেছ। আমিও তানভির সাহেবকে তাই বললাম। কিন্তু রূপা এই জাতীয় ঠাট্টা করা কি উচিত? তানভির সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ। তাকে যখন বলেছি—রূপা ঠাট্টা করেছে, তিনি একসেপ্ট করেছেন। অন্য কেউ তো তা করবে না।

রূপা বলল, তোমাদের তানভির সাহেব মোটেই বুদ্ধিমান নন। বুদ্ধিমান হলে তিনি বুঝতে পারতেন আমি তাঁর সঙ্গে মোটেই ঠাট্টা করিনি।

'কি বলছ তুমি রূপা?'

'সত্যি কথা বলছি ভাবি।'

'সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলছি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ ভাবি মাথা খারাপই হয়েছে। আর কিছু বলবে?'

মিনু বলার মতো কিছু পেলো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রূপা বলল, তুমি কি আরো কিছু বলবে?

'বলব।'

'বল, আমি শুনছি...।'

মিনু কিছু বলতে পারল না কারণ তার মাথা পুরোপুরি ঘুলিয়ে গেছে। মাথায় কোন কিছুই আসছে না। রূপাকে দেখে এখন তার মনে হচ্ছে কিছু বলে লাভ নেই। এই মেয়েটি এখন আর কিছুই শুনবে না। সে বাস করছে অন্য জগতে।

রূপা বলল, ভাবি, আমি এখন যাই। তুমি আমাকে কি বলবে ভেবে ঠিকঠাক করে রাখ। পরে শুনব।

বাইরের ঘরের বারান্দায় তানভির হাঁটাহাঁটি করছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বারান্দা অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জ্বলন্ত সিগারেটের উঠানামা থেকে বোঝা যায় এখানে একজন মানুষ আছে যে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে।

রূপা বারান্দায় এসে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, একটু শুনে যান তো। তানভির এগিয়ে এল। রূপা বলল, আপনাকে বলেছিলাম কাউকে কিছু না বলতে। আপনি সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন, তাই না ?

তানভির বলল, বলা প্রয়োজন বোধ করেছি বলেই বলেছি।

'প্রয়োজন বোধ করলেন কেন ?'

'ভয়ংকর কোন ভুল কেউ করতে গেলে তাকে ভুল দেখি দিতে হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তাই। তোমার বয়স কম। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি বলছ কিংবা কি করছ।'

'আপনার ধারণা আমি ভয়ংকর একটা ভুল করেছি ?'

'অবশ্যই।'

'কেউ যদি ইচ্ছা করে ভুল করতে চায় তাকে কি ভুল করতে দেয়া হবে না ?'

'না।'

'কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ তা আপনি নিজে জানেন ?'

'সব জানি না। তবে তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

'আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, তাই বেশি জানেন ?'

'বয়স একটা ফ্যাক্টর তো বটেই।'

'যে গাধা সে আশি বছরেও গাধা থাকে, বয়স কোন ফ্যাক্টর না।'

'রূপা, আমি গাধা নই।'

'তা নন। তবে আপনি খুব বুদ্ধিমানও নন।'

'খুব বুদ্ধিমান নই তা কেন বলছ ?'

'খুব যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের বুদ্ধির ধার অন্যকে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত থাকে না। অল্পবুদ্ধির মানুষরাই অন্যদের বুদ্ধির খেলা দেখাতে চায়। অন্যদের চমৎকৃত করতে চায়। বুদ্ধিমানরা তা চায় না। কারণ তারা জানে তার প্রয়োজন নেই।'

'আমি কি বুদ্ধির খেলা দেখাতে গিয়েছি ?'

'অবশ্যই গেছেন। আপনার কিছু তৈরি গল্প আছে। যে সব গল্প বলে আপনি চমক লাগাবার চেষ্টা করেন। যেমন—মোনালিসার গল্প। গল্প বলার সাজ-সরঞ্জামও আপনার সঙ্গে থাকে। মানিব্যাগে থাকে ছোট্ট মোনালিসার ছবি। এই গল্প আমাদের বলার আগে আপনি শ' খানেক লোককে আগে বলেছেন। সবাই চমৎকৃত হয়েছে।'

'তুমি হওনি ?'

'আমিও হয়েছিলাম। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করলেন সেই মুহূর্তেই বুঝলাম মানুষ হিসেবে আপনি খুবই সাধারণ।'

'তোমার ঐ স্যার বুঝি মানুষ হিসেবে অসাধারণ ?'

'হ্যাঁ। আমার কাছে অসাধারণ।'

'তোমার কাছে অসাধারণ হলেই সে মানুষ হিসেবে অসাধারণ হবে ? আমার তো ধারণা সে এভারেজ ইন্টেলিজেন্সের একজন মানুষ। দূরবীন নিয়ে কিছু কায়দা-কানুন করছে যা দেখে তোমরা চমৎকৃত হচ্ছ।'

রূপা চুপ করে রইল। যদিও তার ইচ্ছা করছে কঠিন কিছু কথা বলে লোকটিকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। কিছু মনে পড়ছে না। তানভির হাতের সিগরেট ফেলে দিয়ে আরেকটি ধরাল। তার ভাবভঙ্গিতে আগের অস্থিরতা নেই। তবে রূপা মেয়েটিকে এখন সে আগের মত তুচ্ছ বালিকা হিসেবে অগ্রাহ্য করছে না। সে বুঝতে পারছে এই মেয়েটির সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে।

'রূপা।'

'জ্বি।'

'পাড়াগাঁয় যারা থাকে তাদের জীবন মোটামুটি নিস্তরঙ্গ। বড় ধরনের কিছু চারপাশে ঘটে না। দূরবীন নিয়ে কেউ উপস্থিত হলে তাকেই মনে হয় গ্যালিলিও। আসলে তার প্রতিভা হয়ত ঐকিক নিয়মে ভাল অংক কষায় সীমাবদ্ধ। কাউকে স্পেসিফিক্যালি মিন করে আমি বলছি না। তুমি রাগ করো না।'

'আমি রাগ করছি না। ব্যাপারটা সত্যি হলে রাগ হত। সত্যি না বলেই রাগের বদলে হাসি পাচ্ছে।'

'তোমার স্যার সম্পর্কে আমি এমন একটা কথা জানি যা শুনলে তুমি হয়ত রাগ করবে।'

'বলুন।'

'শুনেছি তিনি গম চুরি করেছেন। স্কুলের বরাদ্দ একশ মণ গম লোপাট করে দিয়েছেন। তার নামে কেইস হয়েছে।'

'কে বলেছে আপনাকে ?'

'এটা কোন গোপন ব্যাপার না। আমি তোমার বাবার কাছে থেকেই শুনেছি।'

'তিনি আপনাকে কখন বললেন, আজ ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা খুব ভাল করেই জানেন এটা মিথ্যা। তার পরেও তিনি এটা আপনাকে কেন বলেছেন তা কি আপনি বুঝতে পারছেন?'

'না।'

'জানি বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনার এত বুদ্ধি নেই। যদি আপনার খানিকটা বুদ্ধি থাকতো তাহলে আপনি বুঝে ফেলতেন যে বাবা এটা আপনাকে বলেছেন যাতে আপনার সব রাগ গিয়ে ঐ মানুষটার উপর পড়ে। যাতে আপনি ভাবতে শুরু করেন যে সব দোষ ঐ চোর মানুষটার। রূপা নামের মেয়েটার কোন দোষ নেই।'

তানভিরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রূপা মেয়েটি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। গ্রামে বড় হওয়া বাচ্চা একটা মেয়ে এমন গুছিয়ে কথা বলছে—আশ্চর্য!

তানভির বলল, এই চেয়ারটায় বস রূপা। মেজাজ ঠাণ্ডা কর, তারপর কথা বলি।

রূপা বলল, আমার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা আছে। কেন আমার মেজাজ এত ঠাণ্ডা তা জানেন?

'না।'

'একদিন না একদিন এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটবে তা আমি জানতাম। একদিন সবাই জানবে। তুমুল হৈচৈ শুরু হবে। মা ক্রমাগত কাঁদতে থাকবেন। বাবা স্তম্ভিত হয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকবেন। এটা আমি জানতাম। এই ঘটনার জন্যে আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই আমি এত সহজভাবে সব কিছু নিতে পারছি।'

তানভির বলল, আমি তাই দেখছি। এবং খানিকটা বিস্মিতও হচ্ছি। তোমার স্যার অসাধারণ কি না জানি না, তবে তুমি অসাধারণ।'

রূপা বারান্দা থেকে চলে এল। আসলেই তার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। মনে হচ্ছে এখনো কেউ খায়নি। আজ রাতে কি এ-বাড়িতে খাওয়া হবে না? রূপা রান্নাঘরে ঢুকল। রূপার মা রান্নাঘরে মোড়ায় একা একা বসে আছেন। রূপা বলল, প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা। আমাকে ভাত দিয়ে দাও। আজ কি রান্না?

রূপার মা দীর্ঘ সময় মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বৌমা যা বলল তা-কি সত্যি মা?

'হ্যাঁ, সত্যি। এখন তোমরা কি করবে? বটি দিয়ে কুপিয়ে আমাকে কুচি কুচি করে নদীতে ফেলে দেবে?'

রূপার মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই ঠিক করে বল্‌তো মা ঐ হারামজাদা মাস্টার কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে ?

রূপা শান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে ছোট করতে চাও, কর। কিন্তু মা উনাকে ছোট করবে না। উনি এসব কিছুই জানেন না।

রূপার মা কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, হারামজাদা জানে না মানে ? হারামজাদা ঠিকই জানে। জেনেশুনে সে তোকে জাদু করেছে। তুই হচ্ছিস গাধার গাধা। মহা গাধা। তুই কিছুই বুঝতে পারিসনি। তোর বাবা ভয়ংকর রাগ করেছে। সে ঐ ছোটলোকটাকে এমন শাস্তি দেবে যে সে তার বাপ-মার নাম ভুলে যাবে।

'কি শাস্তি দেবে ? খুন করবে ?'

'কথা বলিস না তো। তোর কথা শুনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তুই যা আমার সামনে থেকে।'

তিনি শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। রূপা নিজের ঘরে চলে এল। তার অসম্ভব ভয় লাগছে। বাবা মাস্টার সাহেবকে শাস্তি দেবেন এটা নিশ্চিত। তার অপরাধে শাস্তি পাবে অন্য একজন। কি শাস্তি কে জানে ? মেরে ফেলবেন না নিশ্চয়ই। মানুষ এত নিচে নামতে পারে না। চেষ্টা করেও পারে না। স্কুলের চাকরি চলে যাবে। তাঁকে নীলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা হলে শাপে বর হয়। সেও স্যারের সঙ্গে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে কোথাও। যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। কেউ না।

মিনু এসে ডাকল, খেতে আস রূপা।

রূপা বলল, ক্ষিধা মরে গেছে ভাবি। তোমরা খাও। আমি কিছু খাব না।

'তোমার ভাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে, খেয়ে আমাদের ঘরে আস।'

'আমি এখন কারো সঙ্গেই কথা বলব না ভাবি। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকব।'

'তোমার ভাই কিন্তু রাগ করবে।'

'রাগ যা করার করেছে। এখন দেখা করতে গেলেও সেই রাগের উনিশ-বিশ হবে না। আমি সকালে কথা বলব।'

আফজাল সাহেব রাত এগারোটায় ভাত না খেয়েই জুতা জামা পরে ঘর থেকে বেরুলেন। রফিক জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি জবাব দেন

নি। কথা বলার মত মানসিক অবস্থা এখন তাঁর নেই। রফিক বলল, আমি কি সঙ্গে আসব বাবা ?

তিনি হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

রফিক সঙ্গে চলল। বাবা প্রচণ্ড রেগে আছেন। তাঁর হাই ব্লাড প্রেসার। এরকম অবস্থায় তাঁকে একা ছাড়া উচিত না। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভাল না। যেভাবে মেঘ ডাকছে তাতে মনে হয় ঝড়-টর হবে।

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, যাচ্ছেন কোথায় বাবা ?

'থানায় যাচ্ছি।'

'থানায় ?'

'হুঁ। ওসি সাহেবকে বলল, ঐ শুওরের বাচ্চাকে কাল যেন কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে ঢোকায়। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ যেন তা দেখে।'

'ওসি সাহেব কি এটা করবেন ?'

'অবশ্যই করবে। থানার বড় সাহেবরা যে কোন অন্যায় আগ্রহ নিয়ে করে। আর এটা কোন অন্যায় না। ব্যাটার বিরুদ্ধে কেইস আছে। গম চুরির কেইস।'

'রফিক বলল, হাজতে নিয়ে ঢুকানোর আইডিয়াটা মন্দ না বাবা। রূপা যদি শুনে চুরির অপরাধে ব্যাটাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে তার মোহভঙ্গ হতে পারে।'

'মোহভঙ্গ হোক আর না হোক, হারামজাদার বিষদাঁত আমি ভেঙে দেব। ন্যাংটা করে সারা নীলগঞ্জ আমি তাকে ঘুরাব। কুত্তা লেলিয়ে দেব। আমি খেজুরের কাঁটা দিয়ে ঐ কুত্তার চোখ গেলে দেব।'

'এত উত্তেজিত হবেন না বাবা। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ট্যাকল করব। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।'

রূপা ঘুমুতে গেল বৃষ্টি নামার পর। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী ধুয়ে-মুছে যাবে। রূপেশ্বর নদীতে এবার বান ডাকবে। নিশ্চয়ই ডাকবে। ভাবতেই রূপার ভাল লাগছে। ডাকুক, ভয়াবহ বান ডাকুক। নীলগঞ্জ ধুয়ে-মুছে যাক রূপেশ্বরের জলে।

বাতি নেভাতেই জেবা ডাকল, ফুপু।

রূপা বলল, হুঁ।

'বাড়িতে এখন দু'টা দল হয়ে গেছে।'

'হুঁ, হয়েছে।'

'তোমার এক দল আর বাকি সবার দল।'

রূপা কিছু বলল না। আসলে কোন কিছুই সে শুনছে না। প্রচণ্ড জ্বরের সময় যেমন হয় এখন তার তাই হচ্ছে। কোন কথা পরিষ্কার তার মাথায় ঢুকছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।

জেবা বলল, ওদের দলে এত মানুষ আর তোমার দলে আছি শুধু আমি। দু'জনের দল—তাই না ফুপু ?

'হুঁ।'

নদীর দিক থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে। রাত যত বাড়ছে শব্দ ততই স্পষ্ট হচ্ছে।

রূপা বিছানায় উঠতে উঠতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, এ বছর রূপেশ্বর নদীতে বান ডাকবে।

'বান ডাকলে কি তুমি খুশি হও ফুপু ?'

'হ্যাঁ হই। সব জলের তোড়ে ভেসে গেলে খুশি হই।'

জেবা হাসল। খিলখিল হাসি। অন্ধকারে তার হাসি অদ্ভুত শোনাল। মনে হচ্ছে সে হাসি যেন কলকল শব্দে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

'ফুপু !'

'ফুপু ফুপু করবি না তো। ঘুমো।'

'একটা কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়ব। কথাটা হচ্ছে—কাল সকালটা তোমার জন্যে খুব কষ্টের হবে। খুব কষ্টের। তবে আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবে।'

'তোমার কথার আগা-মাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জেবা। তুমি কি সব সময় এ-রকম পাগলের মত কথা বল ?'

'আমি কোনদিনই পাগলের মত কথা বলি না। কিন্তু সবাই মনে করে আমি পাগলের মত কথা বলি।'

'ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।'

'ফুপু !'

'আর একটা কথাও না। ঘুমাও তো।'

'আমি কি আমার একটা হাত তোমার গায়ে রাখতে পারি ?'

'না।'

'আচ্ছা আমি ঘুমুচ্ছি। তুমি ঘুমাও।'

'আমার ঘুম আসবে না।'

'আসবে। এক্ষুণি আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

রূপা শুয়েছে। বৃষ্টির জন্যেই একটু শীত শীত লাগছে। গায়ে পাতলা চাদর দিতে পারলে ভাল হত। আলসি লাগছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যেই রূপা শুনতে পাচ্ছে, জেবা বলছে—দেখলে ফুপু, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। ঘুম ! ঘুম !!

নীলগঞ্জ এমনই এক জায়গা যেখানে কখনো নাটকীয় কিছু ঘটে না। কারো বড়শিতে বড় মাছ ধরা পড়লে অনেক দিন সেই মাছ ধরার গল্প হয়। আসরে গল্প হিসেবে মাছের প্রসঙ্গ আসে—ধরেছিল একটা মাছ, পুব পাড়ার নীল মাধব। একটা জিনিসের মত জিনিস...

সেই নীলগঞ্জে আজ বোরবেলা ভয়াবহ এক নাটক হচ্ছে। অচিন্ত্যনীয় একটা ঘটনা ঘটছে। নীলগঞ্জের মানুষ এতই হকচকিয়ে গেছে যে কিছু বলতে পারছে না। পাশের জনকে ফিসফিসিয়েও কিছু বলছে না। দৃশ্যটা হজম করতে সবারই সময় লাগছে। তারা অবাক হয়ে দেখছে নীলগঞ্জ স্কুলের স্যার মবিনুর রহমানকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। সবার আগে যাচ্ছেন ওসি সাহেব। তাঁর চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস থাকার কারণে তাঁর মুখের ভাব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোমরের দড়ি ধরে যে পুলিশটি যাচ্ছে তাকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছে। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। মবিনুর রহমানের পেছনেও দু'জন পুলিশ। তারাও মাথা নিচু করে হাঁটছে।

মবিনুর রহমানকে অত্যন্ত বিস্মিত মনে হচ্ছে। এই গরমেও তিনি একটা কোট গায়ে দিয়েছেন। তাঁর হাতে টেলিস্কোপের বাক্সটা আছে। বাক্সটা কিছুক্ষণ পর পর এ-হাত থেকে ও-হাতে নিচ্ছেন।

ওসি হাসেব মবিনুর রহমানকে বললেন, সিগারেট খাবেন ?

মবিনুর রহমান বললেন, জ্বি না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার ঐ টেলিস্কোপটা কনস্টেবলের হাতে দিয়ে দিন। হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

'কষ্ট হচ্ছে না। এর ওজন বেশি না। থ্রি পয়েন্ট টু কেজি।'

'সাবধানে পা ফেলুন, ভীষণ কাদা।'

ওসি সাহেবরা আসামিদের সঙ্গে এই ভঙ্গিতে কথা বলেন না, বিশেষত যে আসামি কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হয়। এই আসামির বেলায় তিনি কিছু ব্যতিক্রম করেছেন। শুরুতেই 'আপনি' বলে ফেলেছেন। শুরুতে 'আপনি' না বললে এই যন্ত্রণা হত না।

এই লোকটা গম চুরির সঙ্গে জড়িত না তা তিনি বুঝতে পারছেন। এটা বোঝার জন্যে এগারো বছর ধরে ওসিগিরি করতে হয় না। লোকটাকে কায়দা করে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আগে মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটার পেছনে আছে হেড মাস্টার হাফিজুল কবির। এখন মনে হচ্ছে আরো অনেকেই আছে। বিশেষ করে আফজাল সাহেব আছেন।

একটা নিরপরাধ লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আফজাল সাহেবের কারণে। তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যেন কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বাড়ির সামনে দিয়ে নেয়া হয়।

আফজাল সাহেব এই অঞ্চলের অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এদের কথা শুনতে হয়। না শুনলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো যায় না। বড়দারোগাগিরি সহজ জিনিস নয়। অনেকের মন রেখে চলতে হয়। এমন সব কাজ করতে হয় যার জন্যে মন ছোট হয়ে যায়।

ওসি সাহেব নিজের অস্বস্তি দূর করবার জন্যেই বললেন—আপনার এই যন্ত্র দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র সব দেখা যায়?

মবিনুর রহমান আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, সব দেখা না গেলেও অনেক দেখা যায়। যেমন ধরুন শনি গ্রহের বলয় দেখা যায়।

'দেখতে কেমন?'

'অপূর্ব।'

ওসি সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, জিনিসটা একবার দেখলে হয়।

মবিনুর রহমান বললেন, টেরিস্কোপ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে আপনাকে দেখাব।

ওসি সাহেব লজ্জিত বোধ করছেন। মানুষটা তো অদ্ভুত। তার কোমরে ধরি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর সে কি-না বলছে তাকে টেলিস্কোপে শনি গ্রহের বলয় দেখাবে। মানুষটাকে এ্যারেস্ট করতে গিয়েও বিপত্তি। কাউকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসা এমন কোন মজাদার বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন জানা থাকে লোকটা নিরপরাধ। হম্বিতম্বি তখনি বেশি করতে হয়। নিরপরাধ লোকের মনেও এই বিশ্বাস ধরিয়ে দিতে হয় যে সে আসলে নিরপরাধ না। কোন একটা অপরাধ তার আছে যা সে নিজে তেমন ভাল জানে না। ওসি সাহেবও তাই করলেন। ভয়ংকর মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। খসখসে গলায় বললেন, ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।

ভদ্রলোক চায়ের পানি গরম করছিলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, কেন বলুন তো?

'গম চুরির মামলা—মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব পাবলিক ফান্ড। নব্বই বস্তা গম আপনি চুরি করেছেন।'

'নব্বই বস্তা গম দিয়ে আমি কি করব?'

'আমার সঙ্গে কি রসিকতা করার চেষ্টা করছেন? নব্বই বস্তা গম দিয়ে আপনি কি করবেন তা জানেন না? স্ট্রেইট কথা বলুন। বাঁকা কথা বলবেন না।'

'বাঁকা কথা কি বললাম বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলে কথা বলবেন না। শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেবেন। নট বিফোর দ্যাট।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনার ঘরও সার্চ হবে। সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। পাশের ঘরে কি আছে?'

'দু'টা চন্দ্রবোড়া সাপ আছে আর তাদের একত্রিশটা ছানা আছে। সাবধানে যাবেন।'

ওসি সাহেবের রাগে গা জ্বলে গেল। লোকটিকে সাদাসিধা ভালমানুষ মনে হয়েছিল, আসলে সে তা না। খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায়। যারা খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায় তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হয়। বুঝিয়ে দিতে হয় যে খাকি পোশাক রসিকতা পছন্দ করে না।

'কি বললেন? চন্দ্রবোড়া সাপ?'

'জ্বি।'

'ভেরি গুড। আমার কিছু চন্দ্রবোড়া সাপই দরকার।'

ওসি সাহেব নিজেই দরজা খুললেন এবং ছিটকে বের হয়ে এলেন। দু'টি চন্দ্রবোড়ার একটি তিনি দেখতে পেয়েছেন। সেই দৃশ্য খুব সুখকর নয়। তখনই তিনি ঠিক করেছেন এই আসামির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। মবিনুর রহমান যখন বললেন, আমি কি আমার দূরবীনটা সঙ্গে নিতে পারি?

ওসি সাহেব তৎক্ষণা বললেন, অবশ্যই পারেন। অবশ্যই। সঙ্গে আরো কিছু নিতে চাইলে তাও নিতে পারেন।

'না, আর কিছু না। হাজতে কি আমাকে দীর্ঘদিন থাকতে হবে?'

'এখন বলা যাচ্ছে না। নির্ভর করে...'

'কিসের উপর নির্ভর করে?'

ওসি সাহেব তার জবাব দিলেন না। তাঁর মন বলছে এই লোকটির সঙ্গে বেশি কথাবার্তায় যাওয়া ঠিক হবে না।

রাস্তায় লোক জমছে। তারা অবাক হয়ে মবিনুর রহমানকে দেখছে। মবিনুর রহমান তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই তাকানোয় লজ্জা-সংকোচ কিছুই নেই। বিব্রত একটা ভঙ্গি আছে, এর বেশি কিছু না।

কালিপদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বালতি ভর্তি পানি নিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের দল দেখে থমকে দাঁড়াল। উঁচু গলায় বলল, কি হইছে ? মবিনুর রহমান বললেন, কেমন আছ কালিপদ ?

'আপনেরে কই নিয়া যায় ?'

'থানায় নিয়ে যাচ্ছে।'

'কেন ?'

'আমার বিরুদ্ধে গম চুরির কেইস আছে।'

কালিপদ বালতি নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। পরবর্তী এক ঘণ্টা সে তার জায়গায় বসেই রইল, নড়ল না।

পুলিশের দলটা থামল আফজাল সাহেবের বাড়ির সামনে। ওসি সাহেব বাড়ির গেট খুলে বাইরের বারান্দায় ঢুকলেন এবং গম্ভীর গলায় ডাকলেন, আফজাল সাহেব আছেন ?

আফজাল সাহেব বের হয়ে এলেন।

ওসি সাহেব বললেন, এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন ?

'এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?'

'আসামি নিয়ে থানায় যাচ্ছি।'

'বসুন চা খেয়ে যান।'

'চা অবশ্যি এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।'

ওসি সাহেব পুলিশের দলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাই, তোমরা একটু দাঁড়াও। পুলিশের দল মবিনুর রহমানকে নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

এ-রকমই কথা ছিল। আফজাল সাহেব বলে দিয়েছিলেন কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মবিনুর রহমানকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে ওসি সাহেব তাঁর বাড়িতে চা নাশতা খাবেন।

ওসি সাহেব এই কাজটিই এখন করছেন। তবে কাজটি করতে তাঁর খুব ভাল লাগছে না। লোক জমছে। অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেছে। মানুষ বেশি জমলেই তারা এক সঙ্গে এক জাতীয় চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। যার নাম 'মব সাইকোলজি'। এই চিন্তা হঠাৎ কোন দিকে যাবে বলা মুশকিল। জড়ো হওয়া মানুষগুলি যদি মনে করে কাজটা অন্যায় হয়েছে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে যাবে। ক্ষেপা জনতা—ভয়ংকর।

রূপা বারান্দায় এসে শান্ত চোখে দৃশ্যটা দেখল। একবার মবিনুর রহমানের দিকে তাকিয়ে সে তাকাল তার বাবার দিকে। তারপর তাকাল ওসি সাহেবের দিকে।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার মেয়ে ?

আফজাল সাহেব বললেন, জ্বি। এর নাম রূপা।

ওসি সাহেব বললেন, কেমন আছ মা ?

রূপা বলল, ভাল আছি। আপনি স্যারকে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন ?

'আসামিকে থানায় নিয়ে যাওয়ার এইটাই পদ্ধতি। আসামি যে-ই হোক না কেন তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হবে।'

'স্যারের বাড়ি থেকে থানায় যাবার রাস্তা তো এটা না। আপনি অনেকখানি ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনের এসেছেন। কেউ নিশ্চয়ই এই কাজটা করার জন্যে আপনাকে বলেছে। তাই না ?'

ওসি সাহেব আফজাল সাহেবের দিকে তাকালেন।

আফজাল সাহেব কড়া গলায় বললেন, ভেতরে যাও রূপা।

রূপা কয়েক মুহূর্ত বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বাড়ির সামনে লোক বাড়ছে।

ওসি সাহেব চা শেষ না করেই উঠে পড়লেন। ব্যাপারটা আর ভাল লাগছে না। এত লোক জমছে কেন ?

মবিনুর রহমানকে হাজতে ঢোকানোর তিন ঘণ্টার ভেতর থানার চারপাশে দু'তিন হাজার মানুষ জমে গেল। তারা হৈচৈ, চিৎকার কিছুই করছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই শান্ত। এই লক্ষণ ভাল না। খুব খারাপ লক্ষণ। এরা থানা আক্রমণ করে বসতে পারে। থানায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। থানায় টেলিফোন আছে—অতিরিক্ত ফোর্স চেয়ে টেলিফোন করা যায়। কিন্তু টেলিফোন গত এক সপ্তাহ থেকে নষ্ট।

ওসি সাহেব থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা সরকারি কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। এর ফলাফল ভাল হবে না। আমরা আসামি ধরে এনেছি। আসামিকে কোর্টে চালান করে দেব। সেখান থেকে জামিন হবে। যান, আপনারা বাড়ি চলে যান। ভিড় বাড়াবেন না।

কেউ নড়ল না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। মানুষ বাড়তেই থাকল।

ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারকে বললেন হেড অফিসে খবর দিতে। আসামীকে ছেড়ে দিলে এখন কোন লাভ হবে না। হিতে বিপরীত হবে। লোকজন থানায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এই রিস্ক নেয়া যায় না।

সেকেন্ড অফিসার সাহেব থানা ছেড়ে বেরুতে গেলেন, লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলল। নিরীহ গলায় বলল, স্যার কোথায় যান ?

'তা দিয়ে আপনি কি করবেন ?'

'যেতে পারবেন না স্যার।'

'যেতে পারব না মানে ? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি ?'

সেকেন্ড অফিসার ভয়াবহ পুলিশি গর্জন দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। লোকজন কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই দৃষ্টির নাম—উন্মাদ দৃষ্টি।

জেবা চা খাচ্ছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে।

পিরিচ ভর্তি চা নিয়ে চুকচুক করে চুমুক দিচ্ছে। তাকে কেন জানি খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। রূপা ঘরে ঢুকে জেবাকে দেখল। জেবা বলল, ফুপু আমি চা খাচ্ছি। বলেই খিলখিল করে হাসল। চা খাওয়ার মধ্যে হাসির কি আছে রূপা বুঝতে পারছে না। আসলে এখন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার কাছে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে।

'ফুপু।'

'কি ?'

'তুমি চিন্তা করবে না ফুপু, আমি তোমার দলে।'

'আমি কোন চিন্তা করছি না। আর শোন, আমি কোন দল করছি না।'

'তোমার স্যারকে নিয়েও তুমি চিন্তা করবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

'তুমি ব্যবস্থা করছ মানে ?'

'সব মানুষ ক্ষেপে যাবে। ওরা থানা আক্রমণ করবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। সাংঘাতিক মজার ব্যাপার হবে।'

'কি বলছ তুমি ?'

'আমি কোন মিথ্যা কথা বলি না ফুপু। সন্ধ্যার মধ্যে ভয়ংকর কাণ্ড শুরু হবে।'

জেবা হাসল খিলখিল করে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব আনন্দিত।

নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব অস্থির বোধ করছেন। দুপুরে তিনি বাসায় ভাত খেতে যাননি। শুধু তিনি কেন, থানার কেউই দুপুরে খায়নি। সেপাইদের সবাইকে রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ওসি সাহেব বিপদের ঘ্রাণ

পাচ্ছেন। মানুষ ক্রমেই বাড়ছে। এমন মনে হচ্ছে দূর দূর থেকে মানুষ আসছে। অনেকের হাতেই বর্শা। বর্শা হল এ-অঞ্চলের যুদ্ধাস্ত্র যার স্থানীয় নাম অলংগা। কারো কারো হাতে লম্বা বাঁশের লাঠিও আছে। এখনো সন্ধ্যা হয়নি কিন্তু অনেকেই হারিকেন নিয়ে এসেছে। মনে হয় তাদের সারারাত জেগে থাকার পরিকল্পনা। ওসি সাহেব মবিনুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হাজতের দরজা খুলতেই মবিনুর রহমান বিস্মিত গলায় বললেন, এত লোক কেন চারদিকে?

ওসি সাহেবের প্রথমেই মনে হল, ব্যাটা সব জেনেশুনে ঠাট্টা করছে। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল এই লোক মিথ্যা বলে না। ঠাট্টাও করে না। চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে সত্যি কথাই বলেছিল।

মবিনুর রহমান আবার বললেন, এত লোক কেন?

ওসি হাসেব ভুরু কুঁচকে বললেন, জানি না। আপনি কি চা খাবেন?

'জ্বি-না।'

'সিগারেট? সিগারেট লাগবে? আনিয়ে দেব?'

'জ্বি-না।'

ওসি সাহেব কথা বলার আর কিছু পেলেন না। নিজের অফিস ঘরের দিকে ফিরে চললেন। লোক আরো বাড়ছে। দ্রুত কোন-একটা বুদ্ধি বের করে এদের দূর করতে হবে। ভয় দেখিয়ে দূর করা যাবে না। একা মানুষ ভয় পায়। জনতা ভয় পায় না। মবিনুর রহমানকে ছেড়ে দিলেও কোন লাভ হবে না। এরা তাহলে নিজেদের বিজয়ী ভাববে। বিজয়ী মানুষদের জয় উল্লাসও ভয়াবহ হয়ে থাকে। আনন্দেই এরা হয়ত থানা জ্বালিয়ে দেবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মবিনুর রহমানের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিভাবে তা সম্ভব? অতি দ্রুত কিছু ভেবে বের করতে হবে। অতি দ্রুত। এমন কিছু বলতে হবে যাতে সবাই বলে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনার প্রয়োজন ছিল।

ওসি সাহেব তাঁর অফিসে ঢুকেই দেখলেন, নীলগঞ্জ হাই স্কুলের ধর্ম শিক্ষক জালালুদ্দিন বসে আছেন। জালালুদ্দিন সাহেবের মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর।

'কেমন আছেন জালালুদ্দিন সাহেব?'

'জ্বি-জনাব ভাল। আপনার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে এসেছি।'

'অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এর মধ্যে কি জানতে চান?'

'অবস্থা সম্পর্কেই একটা প্রশ্ন। মবিনুর রহমান সাহেবকে আপনারা কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে এনেছেন। কি জন্যে এনেছেন? গম চুরির একটা মিথ্যা মামলার কারণে না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু।'

'বলুন শুনি।'

ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—অন্য ব্যাপার। সামান্য কারণে তাঁর মত লোককে তো এভাবে থানায় আনা যায় না। পুলিশ হয়েছি বলে তো আর আমরা অমানুষ না। মানী লোকের মান আপনারা যেমন বুঝেন আমরাও বুঝি। উনার বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপের গুরুত্বর অভিযোগ আছে।

'কি বললেন?'

ওসি সাহেব নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে কিছুটা সময় নিলেন। সিগারেট ধরালেন। সুন্দর একটা গল্প ফাঁদতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য গল্প। সিগারেট টানতে টানতে কঠিন মুখে বললেন—একটা রেপ কেইস হয়েছে। ভিকটিমের জবানবন্দি অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

'রেপ কেইস?'

'জ্বি, রেপ কেইস। এই কারণেই কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় এনেছি।'

জালালুদ্দিন হতভম্ব মুখে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেব এই হতভম্ব দৃষ্টি দেখে খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। মনে হচ্ছে কাজ হবে। জালালুদ্দিন যখন তাঁর কথায় হকচকিয়ে গেছে তখন অন্যরাও যাবে। এই ঘটনায় লোকজন বুঝবে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনা উচিত ছিল। বাতাস ঘুরে যাবে। মবের চিন্তা-ভাবনা একদিক থেকে অন্যদিকে অতি দ্রুত ঘুরতে পারে। এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে মামলা সাজানো। একটা মেয়ে জোগাড় করতে হবে, যে হবে ফরিয়াদি। তেমন মেয়ে যোগাড় করা কঠিন হবে না। পুলিশের কাছে কোন কাজই কঠিন নয়।

তানভির বাগানে একা একা বসে ছিল।

রূপা বারান্দায় আসতেই সে ডাকল, রূপা শুনে যাও তো।

রূপা শান্তমুখে বাগানে নামল। তানভির বলল, তোমার স্যারের কাণ্ড শুনেছ? রফিক ভাই এইমাত্র বলে গেলেন। তিনি বাজার থেকে শুনে এসেছেন। তুমি শুনতে চাও?

'না।'

'না কেন? একটা মানুষকে ঠিকমত জানতে হলে তার ভাল-মন্দ সবই জানতে হয়।'

'আপনার বলার ইচ্ছা খুব বেশি হলে বলুন, শুনব।'

'জোর করে শুনাতে চাচ্ছি না। তবুও আমি মনে করি তোমার শোনা উচিত। তোমার স্যার একটা মেয়েকে নির্জন বাড়িতে রেপ করেছেন, যে কারণে পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে।'

'আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস না করার তো কিছু দেখছি না। নারীসঙ্গবর্জিত একজন মানুষ নির্জন জায়গায় একা একা থাকে...।'

'নারীসঙ্গবর্জিত অনেক সাধক মানুষও নির্জন জায়গায় একা একা থাকে।'

'তোমার ধারণা উনি সাধক মহাপুরুষ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।'

'না। আর কিছু বলার নেই।'

রূপা বাগান থেকে উঠে এল। তানভির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল, এই বুদ্ধিমতী শক্ত ধাঁচের মেয়েটিকেই তার বিয়ে করতে হবে। জোর করে হলেও করতে হবে। মেয়েটির মনে সাময়িক যে মোহ আছে তা বিয়ের পর কেটে যাবে। অল্পবয়সের মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই মোহ অনেকটা শিশুদের হামের মত, সবারই হবে। আবার সেরে যাবে।

ওসি সাহেবের পরিকল্পনা কাজ করেছে। লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। মবিনুর রহমানের মেয়েঘটিত ব্যাপার তারা বিশ্বাস করেছে। এর নাম 'মব সাইকোলজি'—এই উত্তর এই দক্ষিণ। মাঝামাঝি কোন ব্যাপার নেই।

ওসি সাহেব ডাকলেন, কবির মিয়া।

ডিউটির সেন্ট্রিবলল, জ্বি স্যার।

'দেখে আস তো মবিনুর রহমান কি করছে?'

'দেখে এসেছি স্যার। উনি ঘুমুচ্ছেন।'

'হারামজাদা।'

হারামজাদা কাকে বলা হল, কেন বলা হল কবির মিয়া ঠিক বুঝতে পারল না। ওসি সাহেব বললেন, লোকজন এখনো আছে?

'কিছু আছে স্যার।'

'হারামজাদা।'

'কিছু বললেন স্যার?'

'না কিছু বলি নাই। তুমি যাও ডিউটি দাও। আর শোন আমি এখন বেরুব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন থানা ছেড়ে কেউ না যায়।'

ওসি সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। ভয়ংকর একটা দিন গিয়েছে। বিশ্রামের উপায় নেই। এখন যেতে হবে একটা মেয়ের সন্ধানে, যাকে ফরিয়াদি করে মামলা দাঁড় করানো যায়। নীলগঞ্জ বাজারে কয়েকঘর পতিতা থাকে। ওদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। অল্পবয়েসী হলে ভাল হয়। বয়স যত কম হবে ততই ভাল। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পাওয়া গেল। সাবিহা বেগম নামের পনেরো বছরের এক বালিকা দু'দিন আগের তারিখে থানায় জি.ডি এন্ট্রি করাল। তার গল্পটি এ-রকম—সে সকালে বাড়ি যাচ্ছিল। মবিনুর রহমানের বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় মবিনুর রহমান তাকে বলল, তুমি কি বাজারে যাও? সে বলল, হ্যাঁ।

'তুমি আমার জন্যে কিছু লবণ কিনে আনবে? লবণের অভাবে কিছু রাঁধতে পারিছ না। আধা কেজি লবণ আনতে পারবে?'

সে বলল, পারব।

পারব বলল কারণ সে জানে এই পাগল লোকটা একা একা থাকে। স্কুলের শিক্ষক। খুব ভাল মানুষ। আগেও কয়েকবার সে এই মানুষটাকে এটা-ওটা এনে দিয়েছে।

মবিনুর রহমান বলল, আস টাকা নিয়ে যাও। সে টাকা নেবার জন্যে ঘরে ঢুকতেই মবিনুর রহমান দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় খিল দিয়েছিল। সাবিহা কিছু বুঝবার আগেই সে তার হাত ধরল। সাবিহা তখন অনেক চিৎকার করল। কিন্তু তার চিৎকার কেউ শুনল না। তাছাড়া খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য গল্প।

মিথ্যা গল্প অতি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য করা যায় । সমস্যা হয় সত্য গল্প নিয়ে।

জেবার জ্বর এসেছে।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সমস্ত হাত-পা অবশ করে জ্বর এলো। সে দু'বার বমি করে নেতিয়ে পড়ল। তার চোখ রক্তবর্ণ। রফিক ডাক্তার ডাকতে চাইল। সে কঠিন গলায় বলল, না।

রফিক বলল, আচ্ছা থাক, ডাকব না।

রফিকের মা বললেন, এসব কেমন কথা? মেয়ে 'না' বললেই না? জ্বরে হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। তুই ডাক্তারের ব্যবস্থা কর। মেয়ের কথা শুনতে হবে?

রফিক ক্লান্ত গলায় বলল, ওর কথা না শুনে উপায় নেই মা। তুমি বুঝবে না। ওর অমতে কিছু করা যাবে না। ও যা বলবে আমাদের তাই করতে হবে।

'এটা কোন কথা হল ?'

'এটা কোন কথা না কিন্তু এটাই সত্যি।'

জেবা বলল, কেউ যেন আমার ঘরে না আসে। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও। দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হল। জেবা ভেতর থেকে সিটকিনি দিয়ে দিল। তার জ্বর আরো বাড়ছে। ঠিকমত পা ফেলে বিছানা পর্যন্ত যেতে পারছে না। ঘরের ভেতরটা গরম। তার শীত লাগছে। প্রচণ্ড শীত। শীতে তার সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। জেবা বিড়বিড় করে বলল, আমি পারছি না। আমার শক্তি কম। আমি পারছি না। জেবা বিছানায় শুয়ে আছে কুণ্ডলি পাকিয়ে। তার ঘুম আসছে। প্রচণ্ড ঘুম। ঘুম প্রয়োজন। এই ঘুমের মধ্যেই সে 'নি'দের দেখা পাবে। 'নি'রা তাকে বলে দেবে কি করতে হবে। কারণ সেও একজন 'নি'। রূপা ফুপুর স্যারও 'নি।'। তাঁর ক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, অথচ তিনি তা জানেন না। 'নি'রা তাঁকে কিছু বলছে না কেন ? সে কি তাঁকে বলে দেবে ?

ঘুমুচ্ছেন মবিনুর রহমান। ঠিক ঘুম না—তন্দ্রাভাব হয়েছে। হাজতের ছোট্ট ঘরটায় তাঁকে বসার জন্য ইজিচেয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। কেন জানি তাঁর বেশ ভাল লাগছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। হাজত ঘরের ভেতরে কোন বাতি নেই। বারান্দায় বাতি আছে। একশ' পাওয়ারের বাতি। ইলেকট্রিসিটি খুব দুর্বল। রাত এগারোটার আগে সবল হবে না। বারান্দার বাতি প্রদীপের আলোর মত আলো দিচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে। নদীর দিক থেকে শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। বোধহয় রূপেশ্বরে আবারো বান ডাকবে। এই নদী প্রতি সাত বছর পর পর যৌবনবতী হয়। দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মবিনুর রহমান আধো-ঘুম আধো-তন্দ্রায় রূপেশ্বরের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। এক সময় সেই গর্জনে কিছু কথা মিশে গেল। নদীর গর্জন কোলাহলের মত শুনাতে লাগল। এক সঙ্গে অনেকেই যেন কথা বলছে। মবিনুর রহমান ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করছেন। চেষ্টা করছেন, জেগে উঠতে পারছেন না। ঘুম আরো গাঢ় হচ্ছে। যে কোলাহল এতক্ষণ শুনছিলেন তা একটি নির্দিষ্ট স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

'মবিনুর রহমান।'

'জ্বি।'

'মবিনুর রহমান।'

'জ্বি।'

'মবিনুর রহমান।'

'আমি তো জবাব দিচ্ছি। বারবার ডাকছেন কেন?'

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'আমরা কে মনে আছে?'

'আপনারা 'নি'।'

'হ্যাঁ, তোমার মনে আছে। তুমিও একজন 'নি'।'

'বুঝিয়ে বলুন।'

'সবকিছু বুঝিয়ে বলা যায় না।'

'চেষ্টা করুন।'

'তুমি স্বপ্ন দেখতে পার।'

'স্বপ্ন সবাই দেখে।'

'তোমার স্বপ্ন আর অন্যদের স্বপ্ন এক নয়। অন্যদের স্বপ্ন স্বপ্নই। তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নয়। তুমি যা স্বপ্ন দেখবে তাই হবে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'মানুষ পৃথিবীতে এসেছে ছয়চল্লিশটি ক্রমোজম নিয়ে। তোমার ক্রমোজম সংখ্যা সাতচল্লিশ। যারা 'নি' শুধু তারাই এই বাড়তি ক্রমোজম নিয়ে আসে।'

'বাড়তি ক্রমোজমটির কাজ কি?'

'বাড়তি ক্রমোজমটির জন্যেই তুমি স্বপ্নকে মুক্ত করতে পার। কি অসীম তোমার ক্ষমতা তা তুমি জান না, ক্ষুদ্র অর্থে তুমি স্রষ্টা।'

'সব মানুষই স্রষ্টা। সৃষ্টি করাই মানুষের কাজ।'

'তোমার সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ।'

'অসাধারণ?'

'হ্যাঁ অসাধারণ। 'নি'দের জন্ম হয়েছে স্বপ্ন দেখার জন্যে। তারা স্বপ্ন দেখে—নতুন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি তাই চায়।'

'একদিকে সৃষ্টি মানেই অন্যদিকে ধ্বংস।'

'হ্যাঁ তাই ঠিক। প্রকৃতি তাই চায়। প্রকৃতি চায় তার জগতে ক্রমাগত ভাঙাগড়ার খেলা চলুক।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কি মনে আছে তুমি একবার চিরজ্যোৎস্নার একটি জগতের কথা চিন্তা করেছিলে, মনে আছে?'

'আছে।'

'সেই জগৎ তৈরি হয়েছে। অপূর্ব সেই জগৎ।'

'আমি কি সেই জগৎ দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পার। তবে কল্পনায়। তোমার পৃথিবী যে মাত্রায় আছে, তোমার জগৎ সেই মাত্রায় নয়।'

'আমি কি আমার পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে পারি?'

'পার। তবে 'নি'-দের সাবধান করে দেয়া হয় যেন এই কাজটি তারা না করে।'

'অসুবিধা কি?'

'এতে প্রাকৃতিক নিয়মে অসুবিধা দেখা দেয়। প্রকৃতি তার আইনের ব্যতিক্রম সহ্য করে না। আইন অমান্যকারীকে প্রকৃতি কঠিন শাস্তি দেয়।'

'আমি এই পৃথিবীতেই কিছু-একটা সৃষ্টি করে দেখতে চাই প্রকৃতি আমাকে কিভাবে শাস্তি দেয়।'

'প্রকৃতির শাস্তি ভয়াবহ। আমরা তোমাকে সাবধান করবার জন্যেই আজ এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার ইচ্ছা হবে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে। সেটি যেন না হয় তাই করতেই আমাদের আসা। তুমি তোমার কাজ কর। তোমার অসীম ক্ষমতা ব্যবহার কর।'

'আপনারা চলে যান। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'আমরা চলে যাব। তোমাকে সাবধান করেই চলে যাব।'

'আমার প্রয়োজনে আর কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

'ধন্যবাদ। এখন যান।'

'তুমি যে এখন এক সাময়িক অসুবিধার মধ্যে আছ তা নিয়ে কি তুমি আলাপ করতে চাও?'

'হাজতবাসের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'না। এটা কোন সমস্যা নয়।'

'নি'-দের যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে রাখার সব ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রাখে। তোমার বেলাতেও তা করে রেখেছে। তুমি যখন যেখানে ছিলে সেখানেই তোমার পাশে রাখা হয়েছে দু'জন করে অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, যারা মানসিকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। 'নি'রা প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

'বুঝতে পারছি না।'

নীলগঞ্জে তোমার দু'জন সাহায্যকারী আছে। একজন কালিপদ, অন্যজন জালালুদ্দিন। এদের মানসিক ক্ষমতা অসাধারণ। তারা সব রকম বিপদে তোমাকে সাহায্য করবে। যদিও তারা তা জানে না। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আরো একজন সাহায্যকারীকে আনা হয়েছে। তার নাম জেবা। জেবাও তোমাকে সাহায্য করছে। 'নি' প্রকৃতির বিশেষ সৃষ্টি। এদের রক্ষা করার সব রকম দায়িত্ব প্রকৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

'এইসব শুনতে আমার ভাল লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে, আমাকে ঘুমুতে দিন।'

স্বপ্ন ঝাপসা হয়ে গেল। মবিনুর রহমান গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন। আরেকটি স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন অপূর্ব ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে আকাশে। তাদের কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত। তারা এক আনন্দময় সংগীত সৃষ্টি করছে। আলো আঁধারী এক জগতে তাদের সংগীত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

হেড মাস্টার সাহেবের গরুর জন্যে জাবনা তৈরি করা হচ্ছে। কালিপদ মাথা নিচু করে কাজটা করছে। হেড মাস্টার সাহেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে চিন্তিত ভাব। মবিনুর রহমানের গমের ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে তা তিনি ভাবেননি। এ তো বড়ই যন্ত্রণা হল !

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কি কালিপদ ?

কালিপদ চোখ তুলে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিল না। তাকিয়েই রইল। এ-রকম সে কখনো করে না। হেড মাস্টার সাহেব অকারণেই খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। প্রথম প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন,—গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কি কালিপদ ?

কালিপদ বলল, সেইটা গরুরে জিজ্ঞেস করেন।

হেড মাস্টার সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। হারামজাদার এত বড় সাহস ! কি কথা বলছে ? তারপরেও তাকিয়ে আছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। জুতিয়ে হারামজাদার গাল ভেঙে দেয়া দরকার।

'কি বললা কালিপদ ?'

'বললাম, গরু কেন খায় না সেইটা গরুরে জিজ্ঞাসা করেন। আমি গরুর ডাক্তার না।'

'তোমার সাহস অনেক বেশি হয়ে গেছে। তুমি কি বলছ তুমি নিজেও জান না।'

কালিপদ এইবার চোখ নামিয়ে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আমার মাথার ঠিক নাই। নিরপরাধ একটা মানুষরে কোমরে দড়ি বাইন্দা নিয়া গেছে। আমার মাথার ঠিক নাই। কি বলতে কি বলছি, মনে কিছু নিয়েন না।

'নিরপরাধ বলছ কেন? তুমি কি জান না সে একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে? মেয়ের নাম সাবিহা।'

'এইগুলা দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা।'

'তোমারে কে বলল মিথ্যা রটনা?'

'আমি জানি মিথ্যা রটনা। আফনেও জানেন, আফনে জানেন না এমন না। অখনও সময় আছে স্যার।'

'কি বললা?'

'বললাম অখনো সময় আছে। সময় শেষ হইলে আফসোস করবেন।'

'কি বলছ তুমি?'

'অতি সত্য কথা বলতেছি। অতি সত্য কথা।'

কালিপদ হাঁটা ধরল। বিস্মিত হেড মাস্টার বললেন, যাও কোথায় তুমি?'

'সাবিহা বেগমের কাছে যাই।'

কালিপদ চলে গেছে। হেড মাস্টার সাহেবের পা কাঁপছে। ঠকঠক করে কাঁপছে। অকারণ ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। এরকম কেন হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তিনি আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লেন। হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। বমিতে লাল লাল কি দেখা যাচ্ছে। রক্ত না-কি? হেড মাস্টার সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন—ইয়া মাবুদ। ইয়া মাবুদ।

বাজারের একটা ঘরের সামনে কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে এক সময় বাইরে এসে বলল, কারে চান গো?

'তোমারে চাই। তোমার নাম সাবিহা না?'

'হ।'

'তুমি মিথ্যা মামলা কেন করছ?'

কালিপদ তাকিয়ে আছে তীব্র দৃষ্টিতে। সাবিহা সেই দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। কালিপদ আবার বলল, কেন তুমি মিথ্যা মামলা করলা?

'ওসি সাহেব বলছেন।'

'এখন ওসি সাহেবের কাছে আবার যাও। ওসি সাহেবরে বল—তুমি এইসবের মধ্যে নাই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কখন যাইবা?'

'এখনই যাব।'

'যাও দিরং করবা না।'

'জ্বে-না। আমি দিরং করব না।'

সাবিহারও ঠিক হেড মাস্টার সাহেবের মত হল। গা হাত পা কাঁপছে। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে। বুক ধড়ফড় করছে।

জালালুদ্দিন ওসি সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়েছেন। সমস্ত দিনের ভয়াবহ ক্লান্তির পর ওসি সাহেব সবে ঘুমুতে গিয়েছেন। রাত বাজে ন'টা। এত সকাল সকাল তিনি ঘুমুতে যান না। আজ শরীরে কুলুচ্ছে না। এই সময় যন্ত্রণা। ওসি সাহেব বলে পাঠালেন, এখন দেখা হবে না।

জালালুদ্দিন বললেন, এখনই দেখা হওয়া দরকার। ওসি সাহেবের নিজের স্বার্থেই দেখা হওয়া দরকার।

ওসি সাহেব বের হয়ে এলেন। কঠিন গলায় বলরেন, কি ব্যাপার?

'গম চুরি মামলাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে কি কথা?'

'হেড মাস্টার সাহেব স্বীকার করেছেন যে গম চুরির মামলাটা মিথ্যা মামলা।'

'কি বললেন?'

'যা সত্য তাই বললাম। গম চুরি বিষয়ক সব দায়-দায়িত্ব উনি নিয়েছেন। কাজেই মবিনুর রহমান সাহেবকে ছেড়ে দিতে হয়।'

'উনাকে অন্য কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণটা আপনাকে বলেছি...।'

'হ্যাঁ বলেছেন। সাবিহা নামের ঐ মেয়ে বলছে যে আপনি তাকে দিয়ে মিথ্যা মামলা করিয়েছেন।'

অনেকক্ষণ ওসি সাহেব কথা বলতে পারলেন না—হচ্ছে কি এসব! তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, সে বললে তো হবে না?

'হবে। সে বললেই হবে। নীলগঞ্জের সব মানুষ এসে ভেঙে পড়বে থানার সামনে। আপনার মহাবিপদ ওসি সাহেব।'

'ভয় দেখাচ্ছেন না কি?'

'না, ভয় দেখাচ্ছি না। যা হতে যাচ্ছে সেটাই আপনাকে বলছি। মানুষ ক্ষেপে গেলে ভয়ংকর হয়ে যায় ওসি সাহেব। ক্ষ্যাপা মানুষ বন্দুক মানে না।'

'আপনি কি মবিনুর রহমান সাহেবকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন ? সেটা করা যায়...'

'শুধু সেটা করলে তো হবে না। আপনি যে অন্যায় করেছেন তার জন্যে সবার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবেন।'

'কি বললেন ?'

'অপমান-সূচক একটা কথা বললাম ওসি সাহেব। খুবই অপমান-সূচক কথা। কিন্তু প্রাণে বাঁচতে হলে এছাড়া পথ নেই। হেড মাস্টার সাহেবও একই জিনিস করবেন। উনি রাজি হয়েছেন। বুদ্ধিমান লোক তো। বিপদ আঁচ করতে পেরেছেন। আপনার বুদ্ধি কম। আপনি বিপদ টের পাবেন শেষ সময়ে, যখন করার কিছু থাকবে না।'

ওসি সাহেব জালালুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কম বুদ্ধির মানুষ না। তিনি বিপদ টের পাচ্ছেন। ভালই টের পাচ্ছেন। তাঁর কপালে ঘাম জমছে। পা কাঁপছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে।

জেবার জ্বর অসম্ভব বেড়েছে।

জ্বর ঠিক কত তা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ তার গায়ে থার্মোমিটার ছোয়ানো যাচ্ছে না। সে কাউকেই তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

আফজাল সাহেব রফিককে বললেন, মেয়ে না করছে বলে কেউ তার কাছে যাবে না এটা কেমন কথা ? মাথায় পানি ঢালতে হবে। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে হবে।

রফিক বলল, কোন লাভ হবে না বাবা। ওর অনিচ্ছায় কিছু করা যাবে না।

'যাবে না কেন ?'

'আপনি বুঝবেন না বাবা, অনেক সমস্যা আছে।'

'জ্বরে তোর মেয়ে পুড়ে যাচ্ছে আর তুই দেখবি না ?'

'এরকম ভয়ংকর জ্বর তার মাঝে মাঝে হয়, আবার আপনাতেই সারে। ডাক্তার ডাকতে হয় না।'

জেবা ক্ষিপ্ত গলায় বলল, তোমরা সবাই এখানে ভিড় করে আছ কেন ? তোমরা যাও। যাও বললাম। আর ঘরে বাতি জ্বালিয়েছ কেন ? বললাম না বাতি চোখে লাগে ? বাতি নিভিয়ে দাও।

বাতি নিভিয়ে রফিক সবাইকে নিয়ে বের হয়ে এল। তার মিনিট দশেকের ভেতর জেবা বের হয়ে এল। সহজ স্বাভাবিক মানুষ। জ্বর নেই। চোখে-মুখে

ক্লান্তির কোন ছোঁয়াও নেই। যেন ঘুমুচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। জেবা বলল, জ্বর সেরে গেছে। ফুপু কোথায় ?

রূপা বারান্দাতেই ছিল। সে চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। জেবা বলল, ফুপু তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার সঙ্গে এসো।

জেবা রূপাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাল। হাসতে হাসতে বলল, তোমার জন্যে খুব ভাল খবর আছে ফুপু।

'কি খবর ?'

'তোমার স্যারকে ওরা ছেড়ে দেবে। ছেড়ে না দিয়ে অবশ্যি উপায়ও নেই। হি-হি-হি।'

'তুমি কিভাবে জান ?'

'যেভাবেই হোক জানি। অনেক রাতে তিনি একা একা বাড়ি ফেরার সময় এই বাড়িতে আসবেন।'

'তাও তুমি জান ?'

'হ্যাঁ, তাও জানি। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না ?'

'না।'

'আমি সব সময় সত্যি কথা বলি ফুপু। তবু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। তাতে কিছু অবশ্যি যায় আসে না।'

'তুমি মেয়েটা খুব অদ্ভুত জেবা।'

'সব মানুষই অদ্ভুত ফুপু। তুমিও অদ্ভুত। পৃথিবীও অদ্ভুত।'

'তুমি একেবারে বড়দের মত কথা বলছ।'

'মাঝে মাঝে আমি বড়দের মত কথা বলি। বড়রা যদি ছোটদের মত কথা বললে দোষ না হয় তাহলে ছোটরা বড়দের মত কথা বললে দোষ হবে কেন ? আমি ঘুমুতে যাচ্ছি ফুপু।'

রাত এগারোটার দিকে এ-বাড়ির সবাই ঘুমুতে গেল। ঘুমুতে যাবার আগে আফজাল সাহেব রূপাকে ডেকে বললেন, রূপা, তুমি আগামীকাল রফিকের সঙ্গে খুলনা চলে যাবে।

রূপা বলল, আচ্ছা।

'ওখানেই থাকবে। পরীক্ষার সময় শুধু এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এখন কিছুই বলব না। পরে বলব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার মা'কে বলেছি তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিতে।'

'ঠিক আছে বাবা।'

বাইরে ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস শোঁ-শোঁ করছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে একে একে। সবার শেষে ঘুমুতে গেল মিনু। সেও ঘুমুতে যাবার আগে রূপার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। এমনভাবে বলল যেন কিছুই হয়নি। সব স্বাভাবিক আছে। আগের মতই আছে।

'রূপা, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি হবে কেন? খুলনা আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা ভাবি, তোমাদের ওখান থেকে সুন্দরবন কি অনেক দূর?'

'না—কাছেই।'

'আমাকে সুন্দরবন দেখাবে না?'

'অবশ্যই দেখাব।'

'সুন্দরবনে ডাকবাংলা আছে? ডাকবাংলায় থাকতে ইচ্ছা করে ভাবী।'

'ফরেস্টের ডাকবাংলা আছে। তোমার ভাইকে বলে ব্যবস্থা করে দেব।'

'ঠিক আছে। ভাবি, তুমি ঘুমুতে যাও। খুব রাত অবশ্যি হয়নি। এগারোটা বাজে। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। তাই না ভাবি?'

মিনু ঘুমুতে গেল। রূপা নিজের ঘরে ঢুকে সুন্দর করে সাজল। চুল বেণী করল। শাড়ি পাল্টাল। অনেকদিন পর চোখে কাজল পরল।

সে অপেক্ষা করছে। জেবার কথা সে বিশ্বাস করছে। এই মেয়েটা কোন-এক বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। রূপা তার প্রমাণ পেয়েছে।

মবিনুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে রাত এগারোটায়।

ওসি সাহেব বললেন, চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। মবিনুর রহমান বললেন, না না, পৌঁছাতে হবে না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি আমার উপর রাগ করবেন না ভাই। ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দেবেন।

'ঠিক আছে। মানুষ মাত্রেই ভুল করে।'

'বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কি করে? একটা ছাতা আর টর্চ লাইট দিয়ে দি।'

'টর্চ লাইট লাগবে না। ছাতা দিতে পারেন।'

মবিনুর রহমানকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে জালালুদ্দিন এবং কালিপদ ছিল। তিনি অনেক কষ্টে তাদের বিদেয় করলেন। তাঁর কেন জানি একা একা বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে। থানার সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন

কেউই এখন নেই। সবাই ভিড় করেছে নদীর তীরে। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। এমনভাবে নদী আগে কখনো ভাঙেনি। নদী ভাঙার দৃশ্য একই সঙ্গে ভয়ংকর এবং সুন্দর।

মবিনুর রহমান ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছেন। বৃষ্টি ছাতা মানছে না। বাতাসের কারণেই খুব ভিজছেন। নিজে ভিজছেন তা নিয়ে তিনি চিন্তিত না। টেলিস্কোপটা ভিজে যাচ্ছে এই নিয়েই তিনি চিন্তিত।

রূপাদের বাড়ির কাছে আসতেই তাঁর মনে হল তাঁকে যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে—এই খবরটা রূপাদের দিয়ে যাওয়া উচিত। রাত অবশ্যি অনেক হয়েছে, তবু যাওয়া যায় কারণ বাতি জ্বলছে। এখনো কেউ না কেউ জেগে আছে। সম্ভবত রূপাই জেগে আছে। সে অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। পড়াশোনা করে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই তানভির দরজা খুলল। টেলিস্কোপ বগলে মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে। মবিনুর রহমান অপ্রস্তুত গলায় বললেন, ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আপনারা চিন্তা করবেন এই ভেবে খবরটা দিতে এলাম। ভাল আছেন?

'জ্বি ভাল আছি।'

তানভির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ইচ্ছা নয় মানুষটা ঘরে ঢুকুক। তানভির বলল, রফিক সাহেবের ছোটমেয়েটা অসুস্থ। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এখন ঘুমুচ্ছে। কাউকে ডাকা যাবে না।

মবিনুর রহমান বললেন, আপনি খবর দিয়ে দিলেই হবে। বলবেন আমি এসেছিলাম।

'আমি বলব।'

'কাল সন্ধ্যায় রূপাকে পড়াতে আসব। বেশ কিছুদিন মিস হল। আর হবে না।'

'কাল আসতে হবে না। রূপা কাল চলে যাচ্ছে।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'খুলনা যাচ্ছে। রফিক সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'এই সময় বেড়াতে যাওয়া কি ঠিক হবে? পরীক্ষার দেরি নেই।'

'সেটা ওদের ব্যাপার। ওরা যা ভাল বুঝে করবে।'

'শুধু ওদের ব্যাপার হবে কেন? আমারও ব্যাপার। আমি ওর শিক্ষক।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রূপা তানভিরের পেছনে এসে দাঁড়াল। শান্ত গলায় তানভিরকে বলল, আপনি স্যারকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? দেখছেন না উনি ভিজছেন? দরজা ছেড়ে দাঁড়ান।

তানভির দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। রূপা বলল, স্যার ভেতরে আসুন।

'এখন আর ভেতরে আসব না রূপা। তোমাদের খবরটা দিতে এলাম। ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভুল করে ধরেছিল। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ওসি সাহেব খুব লজ্জা পেয়েছেন। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'স্যার আপনি ভেতরে আসুন। আপনাকে আসতেই হবে।'

মনিবুর রহমান ভেতরে ঢুকলেন। রূপা বলল, গামছা দিচ্ছি। মাথা মুছে আরাম করে বসুন। আপনি কি রাতে কিছু খেয়েছেন?

'হ্যাঁ, ওসি সাহেব তাঁর বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়েছেন।

'আমি চা এনে দিচ্ছি। আদা চা করে দেব?'

'দাও। বাসার আর মানুষজন কোথায়? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

'জ্বি।'

তানভির দাঁড়িয়ে আছে। অপলক দেখছে রূপাকে। মেয়েটা আজ এত সুন্দর করে সাজল কেন? সে কি জানত তার স্যার আসবেন?

রূপা তানভিরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্যারের সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। আমি কাল খুলনায় চলে যাচ্ছি। কথাগুলি স্যারকে বলে যাওয়া দরকার।

'কথাগুলি সকালে বললে হয় না?'

'না হয় না। আপনার কাছে হাত জোড় করছি।'

মবিনুর রহমান বললেন, আমি না হয় সকালে আসব।

'না। আপনি চুপ করে বসে থাকুন।'

তানভির ঘর ছেড়ে বারান্দায় গেল। তার মন বলছে এই দু'জনকে এখানে রেখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ব্যাপারটা অন্যদের জানানো দরকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে একজন বাইরের মানুষ। তার কি উচিত অন্যদের জাগানো? তানভির সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছে। বারান্দায় প্রবল বাতাস। দেয়াশলাই ধরানো যাচ্ছে না।

মবিনুর রহমান বিস্মিত মুখে বসে আছেন। রূপার মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন তিনি লক্ষ করছেন। কিন্তু পরিবর্তনের ধরনটা ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েটাকে সুন্দর লাগছে। অবশ্যি সুন্দর মেয়েকে সুন্দর তো লাগবেই।

রূপা তার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, স্যার আপনি কি এখন বাড়িতে যাচ্ছেন?

'হ্যাঁ।'

'নদী নাকি খুব ভাঙছে ? আপনার বাড়ি ভেঙে পড়েছে কি-না কে জানে ?'

'গিয়ে দেখি।'

রূপা বলল, আমি কিন্তু স্যার আপনার সঙ্গে যাব।

'আমার সঙ্গে যাবে মানে ?'

'আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আমি এখন থেকে আপনার সঙ্গে থাকব। মবিনুর রহমান দীর্ঘ সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়েটাকে এখন অচেনা লাগছে। একেবারেই অচেনা। যেন কোনদিন এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি।'

'আমার সঙ্গে থাকবে কিভাবে ?'

'কিভাবে তা জানি না। আমি থাকব।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না রূপা।'

'আপনি সব কথা বুঝেন আর আমার সামান্য কথা বুঝেন না ?'

'না কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি এখন আপনার সঙ্গে যাব। গিয়ে যদি দেখি আপনার বাড়ি নদীতে তলিয়ে গেছে তাহলে নৌকায় রাতে থাকব। অবশ্যি এই অবস্থায় নৌকায় থাকা খুব বিপজ্জনক হবে। তাই না স্যার ?'

মবিনুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। মাঝে মাঝে তিনি যেমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এও তেমন কোন অদ্ভুত স্বপ্ন।

'স্যার।'

'বল।'

'সবচে' ভাল হয় যদি আমরা দু'জন এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই যাতে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে না পারে।'

মবিনুর রহমান থেকে থেমে বললেন, তোমার মাথা খারপ হয়ে গেছে রূপা। তুমি কি বলছ নিজেও জান না। তুমি খুলনায় যাও। বাইরে গেলে ভাল লাগবে।

'স্যার, আপনার ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?'

'কিছু-একটা গণ্ডগোল তো অবশ্যই হয়েছে। আমি উঠি, কেমন ?'

'বাড়ি যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'যদি অনেক রাতে একা একা আপনার বাড়িতে উপস্থিত হই আপনি কি করবেন ? আমাকে এখানে এনে দিয়ে যাবেন ?'

'অবশ্যই দিয়ে যাব।'

রূপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে তার চোখ ভিজে উঠল। মবিনুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা করছে এই পাগলি মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে দু' একটা সান্ত্বনার কথা বলতে। তা বোধহয় ঠিক হবে না। এ কি ভয়াবহ সমস্যা ! সমস্যার ধরন এখনো তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এই মেয়ে কি চায় তার কাছে ?

'রূপা যাই।'

রূপা কিছু বলল না। চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল না। মবিনুর রহমান বারান্দায় এসে দেখেন তানভির দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, আমি যাচ্ছি। আপনি রূপার দিকে একটু লক্ষ রাখবেন। ও বড় ধরনের কোন সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। আপনি লক্ষ রাখবেন রূপা যেন রাতে বাড়ি থেকে বের না হয়।

তানভির কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মবিনুর রহমান অসহায় বোধ করছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আপনি বরং রূপার বাবা-মা'কে ঘুম থেকে ডেকে তুলুন। ওদের বলুন মেয়েটার দিকে লক্ষ রাখতে।

'লক্ষ রাখা হবে। আপনি আপনার বাড়িতে যান। রূপাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।'

মবিনুর রহমান বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। নদী আশেপাশের পুরো অঞ্চল ভেঙে দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে—আশ্চর্য তার বাড়িটি ঠিকই আছে। নৌকাও বাঁধা আছে। তিনি জানতেন কিছু হবে না। প্রকৃতি তাঁকে রক্ষা করবে। তিনি একজন 'নি'। তাঁকে সব রকম সমস্যা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রকৃতির। তিনি প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

ভেবেছিলেন রাতে নৌকায় ঘুমুবেন। নৌকা যেভাবে দুলছে তাতে তা সম্ভব না। তিনি নিজের ঘরেই ঘুমুতে এলেন। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তালা খোলা। কেউ ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। ঘরের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি আছে। যে এসেছিল সে কোন কিছুতেই হাত দেয়নি।

চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। নদীর শোঁ-শোঁ শব্দের সঙ্গে স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ মিশে অন্য এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। চুলার সামনে বসে থাকতে থাকতে তাঁর হঠাৎ মনে হল, পৃথিবী শব্দময় হলে কেমন

হত ? যদি এমন একটি জগৎ থাকতো যেখানে সবই শব্দময়। গাছ অনবরত শব্দ করে যাবে। একেক গাছ থেকে একেক ধরনের শব্দ আসবে। পাথর থেকে শব্দ হবে। বড় পাথরের এক ধরনের শব্দ, ছোট পাথরের এক ধরনের শব্দ। মানুষের শরীরে যেমন ঘ্রাণ থাকে তেমনি শব্দও থাকবে। কারোর গা থেকে আসবে মধুর সংগীতময় শব্দ। কারো গা থেকে আসবে বিরক্তির শব্দ। এ-রকম একটি জগতে রূপার গা থেকে কেমন শব্দ আসবে ? নূপুরে ছটফটে ধরনের শব্দ ?

ভাবতে ভাতেই তাঁর এক ধরনের ঘোরের মত হল। তিনি বিচিত্র সব শব্দ শুনতে লাগলেন। কেরোসিনের স্টোভ থেকে শোঁ-শোঁ ছাড়াও স্টোভের নিজস্ব শব্দ আসছে। পানি ভর্তি গ্লাস থেকে এক ধরনের শব্দ আসছে, আবার কেতলির ফুটন্ত পানি থেকে অন্য ধরনের শব্দ। কি আশ্চর্য ! তিনি ঘোরের মধ্যেই শুনলেন—

'হচ্ছে তোমার হচ্ছে ! এই তো তুমি জগৎ তৈরি করেছ। শব্দময় জগৎ। অপূর্ব ! অপূর্ব ! !

'আপনারা কি 'নি' ?'

'হ্যাঁ আমরা 'নি'। আমার তোমার ক্ষমতায় বিস্মিত।'

'আমি তাহলে একটি শব্দময় জগৎ তেরি করেছি ?'

'হ্যাঁ করেছ।'

'আমি আপনাদের এই রসিকতার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। পৃথিবী সব সময়ই শব্দময়। শব্দের উৎপত্তি কম্পনে। প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব কম্পনাংক আছে। সেই অর্থে প্রতিটি বস্তুই শব্দময়।'

'অবশ্যই প্রতিটি বস্তু শব্দময়। কিন্তু তুমি কল্পনা করেছ এমন মানুষের যারা এই শব্দ ধরতে পারে। সেই অর্থে তোমার জগৎটি নতুন।'

'কোথায় সেই জগৎ ?'

'সেই জগতের অবস্থান তোমার মধ্যেই তবে ভিন্ন মাত্রায় বলেই তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তুমি আরো ভাব। কল্পনাকে আরো ছড়িয়ে দাও। নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি কর।'

'তাতে আমার লাভ ?'

'তুমি সৃষ্টির আনন্দ পাচ্ছ। এই আনন্দই তোমার লাভ।'

'যে সৃষ্টি আমি দেখছি না সেই সৃষ্টিতে কোন আনন্দ থাকার কথা নয়।'

'তুমি কি কোন আনন্দই পাচ্ছ না ?'

'না।'

'তুমি যখন শব্দময় জগতের কথা ভাবছিলে তখন কি আনন্দ পাওনি ?'

'পেয়েছি।'

'সেই আনন্দ কি অসম্ভব তীব্র ছিল না ?'

'হ্যাঁ ছিল।'

'ঐটিই তোমার লাভ। শব্দময় জগতের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার নিজের জগৎও হয়ে গেল শব্দময়। সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?'

'বিচিত্র !'

'শুধু বিচিত্র ? আর কিছু না ? আনন্দে কি তখন তোমার শরীর ঝনঝন করছিল না ?'

'করছিল।'

'তোমার কল্পনা যতই উন্নত হবে তোমার আনন্দের পরিমাণ হবে ততই তীব্র। আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কেন ?'

'কারণ তোমার আনন্দ আমাদেরও আনন্দ। আমরাও তো 'নি'। তোমার জন্ম থেকেই আমরা তোমার উপর লক্ষ রাখছি। তোমার প্রতিটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছি।'

'প্রতিটি কার্যকলাপ ?'

'হ্যাঁ, প্রতিটি কার্যকলাপ। তুমি যেন নীলগঞ্জ আস সে জন্যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি যাতে এই ভাঙা বাড়িতে এসে ওঠ সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কারণ তোমার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে নির্জন একটি বাড়ি প্রয়োজন ছিল।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি টেলিস্কোপের কথাই চিন্তা করে দেখ। একটি প্রথম শ্রেণীর এস্ট্রোনোমিক্যাল টেলিস্কোপ তুমি ব্যবহার করছ। টেলিস্কোপটি তুমি কিনেছ একটি পুরানো ফার্নিচারের দোকান থেকে। তুমি সেখানে গিয়েছিলে ইজিচেয়ার কিনতে। মনে আছে ?'

'আছে। তাহলে কি আপনারা বলতে চান সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত ?'

'হ্যাঁ।'

'রূপা মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয়ও কি পূর্ব নির্ধারিত ?'

'হ্যাঁ পূর্ব নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজনেই রূপাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'কি প্রয়োজন ?'

'তুমি যে সব জগত তৈরি করছ সেসব জগতের মানুষ তোমার মতই আবেগশূন্য। তীব্র আবেগের সঙ্গে তোমার পরিচয়ের প্রয়োজন হয়েছে সে কারণেই, যাতে তোমার জগতের মানুষদের তুমি অন্য রকম করে তৈরি করতে পার।'

'আপনারা কি ভবিষ্যত বলতে পারেন?'

'পারি না। আবার এক অর্থে পারি।'

'রূপা এখন কি করবে বলতে পারেন?'

'না, পারি না। প্রকৃতি খানিকটা অনিশ্চয়তা রেখে দেয়। রূপা ঝড়-বৃষ্টির রাতে এখানে ছুটে আসতে পারে, আবার আসতে নাও পারে, আবার অন্য কিছুও করতে পারে।'

'তাহলে অনিশ্চয়তা সামান্য বলছেন কেন? অনেকখানি অনিশ্চয়তা।'

'হ্যাঁ, অনেকখানি।'

'আপনারা বলছেন 'নি'-রা প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অনিশ্চয়তা তারা দূর করতে পারে না!'

'না। অনিশ্চয়তা প্রকৃতিরই নিয়ম। প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম ভঙ্গ করে না।'

মবিনুর রহমানের ঘোর কেটে গেল। কেতলিতে পানি টগবগ করে ফুটছে। তিনি চা বানিয়ে খেলেন। হাওয়ার বেগ আরো বাড়ছে। তুমুল বর্ষণ। ধুপধুপ শব্দে নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে। যে হারে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় আজ রাতের মধ্যেই নদী তাঁর বাড়ি গ্রাস করে নেবে। তিনি তেমন চিন্তিত বোধ করছেন না। বরং ভালই লাগছে। তিনি রাত দু'টোর দিকে ঘুমুতে গেলেন। চাদর মুড়ি দিয়ে সবে শুয়েছেন। হাত বাড়িয়েছেন হারিকেনের সলতা কমিয়ে দেবার জন্যে। এমন সময় দরজায় প্রবল ধাক্কার শব্দ হল। তিনি বললেন, কে?

বাইরে থেকে তানভিরের গলা শোনা গেল।

'দরজা খুলুন মাস্টার সাহেব।'

'কি ব্যাপার?'

'দরজা খুলুন। তারপর বলছি।'

তিনি দরজা খুললেন। তানভির একা নয়। রূপার দুই ভাই—রফিক এবং জহিরও তার সঙ্গে এসেছে। রফিক কঠিন গলায় বলল, রূপা কি আপনার এখানে?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, না তো!

'আপনি কি সত্যি কথা বলছেন মাস্টার সাহেব?'

'মিথ্যা বলার প্রয়োজন কখনো বোধ করিনি। রূপাকে কি পাওয়া যাচ্ছে না?'

'না।'

তানভির বলল, আমরা আপনার নৌকাটা একটু দেখব। নৌকা কি ঘাটে বাঁধা আছে?

'থাকার কথা। আসুন যাই।'

নৌকা বাতাসের প্রবল ঝাপ্টায় উলট-পালট খাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে দড়ি ছিঁড়ে যাবে। রফিক বলল, আপনি রাতে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন রূপা আপনাকে কি বলেছে?

'আমার এখানে আসতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছিলাম।'

তিনজনই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জহির হিসহিস করে চাপা গলায় বলল, রূপার যদি কিছু হয় তাহলে আমি আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করব। কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না।

তারা তিনজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

মবিনুর রহমান একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকার রাতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার বৃষ্টিতে ভিজতে তাঁর ভাল লাগছে। চোখের সামনে নদী। নদীর জল, সমুদ্রের জলের মতই অন্ধকারে জ্বলছে। অদ্ভুত লাগছে তাকিয়ে থাকতে। তাঁর ভাল লাগছে। এক ধরনের তীব্র আনন্দ বোধ করছেন।

সমস্ত রাত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোরবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে ঘরে ফিরলেন। হাত-পা অবশ হয়ে আছে। ভেজা কাপড় বদলাবার শক্তিও নেই। তিনি ভেজা কাপড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জ্বর বাড়তেই থাকল। জ্বরের ঘোরে বেশ কয়েকবার তাঁর মনে হল অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিনতির সঙ্গে বলছে —তুমি অসম্ভব ক্ষমতাধর একজন নি। তোমার অকল্পনীয় ক্ষমতা। কিন্তু তুমি সীমা লংঘনের চেষ্টা করবে না। প্রকৃতি সীমা লংঘনকারীকে সহ্য করে না। প্রকৃতি কাউকে সীমা লংঘন করতে দেয় না। কাউকেই না। তোমাকেও দেবে না।

ভোরবেলায় সূর্য উঠার আগেই কালিপদ এল মবিনুর রহমান সাহেবের খোঁজ নিতে। সে আগেই আসত, মহা সমস্যায় পড়ে আসতে পারেনি। সমস্যা তার একার না, সবার সমস্যা। নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে। অতি দ্রুত এগুচ্ছে। লোকজন সরিয়ে দিতে হচ্ছে। বাজারের পুরোটাই চলে গেছে নদীর ভেতর। ঘটনা ঘটেছে অন্ধকার রাতে। লোকজন বুঝতেই পারেনি এত দ্রুত নদী এগুবে। ছ'সাত জন মানুষ মারা গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শুধু একজনের ব্যাপারে

নিশ্চিত হওয়া গেছে। আফজাল সাহেবের মেয়ে রূপা। তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অন্য কারো কোন চিহ্নই এখনো পাওয়া যায়নি।

কালিপদ এসেছে ছুটতে ছুটতে, ভয়াবহ আতংক নিয়ে। হয়ত দেখবে মবিনুর রহমান স্যারের কোন চিহ্নই নেই। সে দূর থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল—নদীর এই অংশটি মোটামুটি শান্ত। ভাঙা বাড়ি এখনো টিকে আছে। ঘাটে নৌকা বাঁধা। মনে হচ্ছে নদী খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে এগুচ্ছে।

ঘরে ঢুকে কালিপদ দেখল মবিনুর রহমান ভেজা কাপড়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। হাত-পা কাঁপছে।

কালিপদ বলল, কি হইছে স্যার ?

মবিনুর রহমান জড়ানো গলায় বললেন, কে ?

'স্যার আমি কালিপদ।'

'তুমি কেমন আছ কালিপদ ?'

'আপনের কি হইছে স্যার ?'

'জ্বর আসছে বলে মনে হয়।'

কালিপদ দ্রুত ঘরের জিনিসপত্র গুছাচ্ছে। মানুষটাকে সরিয়ে দিতে হবে। রাগী নদী কাউকে ক্ষমা করে না। যে কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসবে।

'স্যার।'

'হুঁ।'

'এইখানে থাকা যাবে না স্যার।'

'অসুবিধা হবে না। কালিপদ তুমি চলে যাও।'

'আমি স্যার যাব না। আপনারে না নিয়া আমি যাব না।'

'মবিনুর রহমান ক্ষীণ গলায় বললেন, একটা খবর নিয়ে আস। রূপা মেয়েটাকে পাওয়া গেছে কি-না জেনে আস।'

কালিপদ ভেবে পেল না দুঃসংবাদ স্যারকে দেয়া যাবে কি-না। শরীরের এই অবস্থায় কি দুঃসংবাদ দেয়া যায় ? তবে মানুষটা খুব শক্ত। এবং রূপাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না তাও এই মানুষটা জানে।

'কালিপদ।'

'জ্বি।'

'খবর নিয়ে আস।'

'খবর স্যার জানি। উনার লাশ পাওয়া গেছে। বাঁকখালির কাছে। পরনে নীল শাড়ি। গা ভরতি গয়না।'

'ও আচ্ছা।'

'তাদের বাড়ির সবাই খুব কানতেছে।'

মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এই খবর শোনার জন্যে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বলে ভেবেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত না। নিজেকে একা লাগছে। মনে হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনি যেন একা জেগে আছেন। বিশাল একটা গ্রহ—গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী, সাগর...কিন্তু একটিমাত্র মানুষ। দ্বিতীয় প্রাণী নেই। কল্পনা করতে ভাল লাগছে।

তিনি একজন 'নি'। বলা হয়েছে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'নি'। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর বললেন—'হও'। জগৎ তৈরি হল শূন্য থেকে। এই জগৎ কোথায় ছিল ? ছিল ঈশ্বরের কল্পনার। 'নি'রাও কল্পনা থেকে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। অন্তত তাঁকে সে রকমই বলা হয়েছে।

রূপাকে কি তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না ? এই জগতেই কি তা সম্ভব ?

মবিনুর রহমান উঠে বসলেন। এক ধরনের ঘোরে তাঁর শরীর আচ্ছন্ন। রূপা মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড রকম আবেগ তিনি বোধ করছেন। এই আবেগ এই তীব্র আকর্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল !

কালিপদ বলল, আপনে স্যার চলেন। নদী ভাঙতেছে।

তিনি কিছুই শুনছেন। না। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা কেন্দ্রীভূত। রূপার কথা ভাবছেন। গভীরভাবে ভাবছেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তিনি কল্পনায় দেখছেন রূপা বসে আছে নৌকায়। রূপার গায়ে হালকা নীল রঙের শাড়ি। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। নৌকায় গাদা করে রাখা বইপত্র গুছিয়ে রাখছে।

মবিনুর রহমান এখন আর চারপাশের কিছু স্পষ্ট দেখতে পারছেন না। সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। কালিপদ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে, তিনি সেই ডাক শুনতে পাচ্ছেন না। এর মধ্যেও তিনি স্পষ্ট শুনলেন—

'মবিনুর রহমান ! মবিনুর রহমান !'

তিনি জবাব দিলেন না। তাঁকে ডাকছে 'নি' রা। অসংখ্য বৃদ্ধের মুখ এখন তিনি দেখতে পারছেন। তারা সবাই ভয়ানক উদ্বিগ্ন।

মবিনুর রহমান। মবিনুর রহমান।'

'বলুন।'

'তুমি এসব কি করছ ? তুমি সীমা লংঘন করছ। তুমি মেয়েটিকে এই জগতেই সৃষ্টি করার চেষ্টা করছ। এই চেষ্টা তুমি করতে পার না।'

'আমি পারি। আমি একজন 'নি। নি'দের ক্ষমতা অসাধারণ।'

'প্রকৃতি সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করে না।'

'যে প্রকৃতি সীমা বেঁধে দেয় তাকেও আমি পছন্দ করি না।'

'তুমি বিরাট ভুল করেছ মবিনুর রহমান। এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিন পর পর একজন 'নি' আসে। তুমি এসেছ। কল্পনাতীত ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না।'

'আমি কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'রূপাকে তোমার প্রয়োজন নেই।'

'কে বলল প্রয়োজন নেই।'

'আমরা বলছি।'

'তোমরা বললে তো হবে না। আমার প্রয়োজন আমি বুঝব। আমি এই মেয়েটিকে আমার জগতেই তৈরি করব।'

'মবিনুর রহমান।'

'আমাকে ডাকাডাকি করে কোন লাভ হবে না। আমি আমার প্রচণ্ড ক্ষমতা অনুভব করছি। প্রতিটি রক্ত কণিকায় অনুভব করছি। আমি সেই ক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করব।'

মবিনুর রহমান কিছুক্ষণের জন্যে বাস্তবে ফিরে এলেন। কালিপদ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কালিপদ !'

'জ্বি।'

'একটু বাইরে গিয়ে দেখ তো নৌকায় কি কাউকে দেখা যায় ?'

কালিপদ ঘর থেকে বের হয়ে চমকে উঠল। ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। ভয়ংকর গর্জন হচ্ছে নদীতে। নৌকা দুলছে কাগজের নৌকার মত। আশ্চর্য ব্যাপার, নৌকার ভেতর কাকে যেন দেখা যায়। কালিপদ বলল, কে কে ? কেউ জবাব দিল না ; কিন্তু কালিপদ স্পষ্ট শুনল কেউ-একজন যেন গুনগুন করে গান গাইছে। মিষ্টি মেয়ে গলা।

কালিপদ আবার ডাকল—কে ? নৌকার ভিতরে কে ? আশ্চর্য, কথা বলে না। মানুষটা কে ?

মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন। কালিপদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি চলে যাও কালিপদ। এক্ষুণি যাও। এক্ষুণি।

মবিনুর রহমানের গলায় এমন কিছু ছিল যে কালিপদ ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে মবিনুর রহমানের দিকে। তিনি তা দেখেও দেখছেন না। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন নৌকার দিকে। আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মেঘের পর মেঘ জমছে। ভয়াবহ দুর্যোগের আর দেরি নেই।

মবিনুর রহমান উঁচু গলায় ডাকলেন—রূপা, রূপা !

নৌকার ভেতর থেকে কাঁচের চুড়ির শব্দ হচ্ছে। নীল শাড়ির আভাস খানিকটা পাওয়া গেল। ফর্সা চুড়ি পরা হাত এক পলকের জন্যে বের হয়ে এল। মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে আছেন। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

তিনি জানেন প্রকৃতি এই অনিয়ম সহ্য করবে না। নদী কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গ্রাস করবে। তিনি আবার ডাকলেন—রূপা, রূপা !

রূপা নৌকার ভেতর থেকে বের হয়ে এল।

তিনি কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ রূপা ?

রূপা বলল, স্যার আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

নদী এগুচ্ছে। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন।

রূপা আবার বলল, স্যার আমায় ভয় লাগছে। খুব ভয় পাচ্ছি স্যার।

মবিনুর রহমান হাসলেন। তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। প্রকৃতি আর তাঁকে সময় দেবে না। তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি হাসিমুখে রূপার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাহারা

নিউরোলজির অধ্যাপক আনিসুর রহমান খান খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা করছে সামনে বসে থাকা বেকুবটার গালে শক্ত করে থাপ্পর দিতে। বেকুবটা বসেছে তাঁর সামনে টেবিলের অন্য প্রান্তে। এত দূর পর্যন্ত হাত যাবে না। অবশ্যি তাঁর হাতে প্লাস্টিকের লম্বা স্কেল আছে। তিনি স্কেল দিয়ে বেকুবটার মাথায় ঠাস করে বাড়ি দিয়ে বলতে পারেন—যা ভাগ।

কী কী কারণে এই কাজটা তিনি করতে পারলেন না তা দ্রুত চিন্তা করলেন।

প্রথম কারণ বেকুবটা তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ছেলের সামনে বাবার গালে থাপ্পর দেয়া যায় না বা স্কেল দিয়ে মাথায় বাড়ি দেয়া যায় না। থাপ্পর বাদ। এটা টেকনিক্যালি সম্ভব না। বাকি থাকল স্কেলের বাড়ি।

দ্বিতীয় কারণ বেকুবটা পাঁচশ' টাকা ভিজিট দিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। সরকারি নিয়মে প্রাইভেট প্যাকটিশনাররা তিনশ' টাকার বেশি ভিজিট নিতে পারেন না। তিনি নেন—তারপরেও রোগী কমে না। যে পাঁচশ' টাকা ভিজিট দিয়ে এসেছে তার মাথায় স্কেল দিয়ে বাড়ি দেয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ স্কেলটা প্লাস্টিকের। তিনি গতবার জার্মানি থেকে এনেছেন। স্কেলটা তিন ফুট লম্বা। ফোল্ড করা যায়। মাথায় বাড়ি দিলে স্কেল ভেঙে যেতে পারে।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান স্কেল হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ভাবছেন এই তিনটি কারণের মধ্যে কোনটা জোরালো। বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যেতে পারে ওয়েটেজ কত?

তিনি লক্ষ করলেন বেকুবটা পকেটে হাত দিয়ে একটা কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

স্যার এইটা আমার কার্ড। আমার নাম জালাল। কাটা কাপড়ের ব্যবসা করি। বঙ্গ বাজারে আমার একটা দোকান আছে। আমার ভাইস্তা দোকান দ্যাখে আমি সময় পাই না। দোকানের নাম জালাল গার্মেন্টস।

আনিসুর রহমান হাতের স্কেল নামিয়ে রাখলেন। টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু পেপার নিয়ে নিজের নাক মুছে টিস্যু পেপার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে ছুড়ে মারলেন। বাস্কেটে পড়ল না। যখনই তিনি রোগী দেখেন এই কাজটা করেন। যখন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে টিস্যু পড়ে না তখন তিনি ধরে নেন এই রোগীর চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। যদিও এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। কুসংস্কার, খারাপ ধরনের কুসংস্কার। বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে এই কাজে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।

স্যার আমার দোকানে একবার যদি পদধূলি দেন তাহলে অত্যন্ত খুশি হব। আপনাদের মত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বঙ্গ বাজারে যান।

আপনার নাম জালাল ?

জ্বি। আমার ভাইস্তার নাম রিয়াজ। ফিল্ম আর্টিস্ট রিয়াজ যে আছে তার সাথে চেহারার কিঞ্চিৎ মিলও আছে। তবে তার গায়ের রঙ রিয়াজ ভাইয়ের চেয়েও ভাল।

আপনি আপনার ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন ?

জ্বি জনাব। আমার একটাই ছেলে তার নাম হারুন। ভাল নাম হারুন অর রশিদ। বাগদাদের খলিফার নামে নাম রেখেছি।

আপনি এত কথা বলছেন কেন জানতে পারি ? রোগী দেখাতে এসেছেন রোগীর বিষয়ে কথা বলবেন। কী রোগ সেটা বলবেন। দুনিয়ার কথা শুরু করেছেন।

জনাব আমার গোস্তাকি হয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন। কথা আগে আমি এত বলতাম না। কম বলতাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কথা বলা বেড়ে গেছে। আগে পানও খেতাম না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পান খাওয়া ধরেছি—এখন সারাদিনই পান খাই। বললে বিশ্বাস করবেন না চা যখন খাই তখনো এক গালে পান থাকে।

আপনার ছেলের সমস্যা কী ?

অংক সমস্যা।

অংক বুঝতে পারে না এই সমস্যা ?

জ্বি না—এইটাই সে বুঝে। যে অংক দেবেন চোখের নিমিষে করবে। চোখের পাতি ফেলনের আগে অংক শেষ।

এটাতো কোন সমস্যা হতে পারে না।

খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। এটা ভাল। তারে টেস্ট করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। একবার টেলিভিশন থেকে এসেছিল ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটা আপনি দেখেছেন কি না জানি না। অনেকেই দেখেছে। আমি নিজে দেখতে পারি নাই। বেছে বেছে অনুষ্ঠান চলার সময় কারেন্ট ছিল না। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল একটা পুরানো দিনের গান—"আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তের নদীর পারে।" ঐটা শুধু দেখেছি। সাগরিকা ছবির গান। সাগরিকা ছবিটাও দেখেছি। উত্তম সুচিত্রার ছবি।

জালাল সাহেব।

জ্বি।

আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান। এই ছেলেকে আমার দেখার কিছু নাই। আমি নিউরোলজির কোন সমস্যা হলে দেখি।

পাঁচশ' টাকা আমি আপনার এসিসটেন্টকে ভিজিট দিয়েছি।

ভিজিটের টাকা ফেরত নিয়ে যান আমি বলে দিচ্ছি। আনিসুর রহমান বেল টিপলেন।

জালাল কাতর গলায় বলল, জনাব সমস্যাটা একটু শুনেন। আমিতো সমস্যা বলতেই পারি নাই। বিরাট বিপদে আছি।

আমার নিজের শরীর ভাল না। আজ আমি আর রোগী দেখব না।

কাল আসি ? কাল অবশ্য মাল নিয়ে আমার চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার কথা। আমি নিজে মাল নিয়ে কখনো যাই না। ছেলে একলা থাকে। মা-মরা স্নেহ বঞ্চিত ছেলে। তার সঙ্গে থাকতে হয়। এই যে কাল যাচ্ছি ছেলেকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি। মালামাল নিয়ে যাওয়ার কাজের জন্যে আমার একজন কর্মচারী ছিল—ইদরিস নাম। গত এপ্রিল মাসের নয় তারিখ এগারো হাজার টাকার মাল আর নগদ ছয় হাজার টাকা নিয়ে পালায়ে গেছে। থানায় জিডি এন্ট্রি করেছি।

স্টপ ইট।

জনাব কী বললেন ?

বললাম স্টপ ইট। কথা বলবেন না।

জ্বি আচ্ছা। ছেলেটাকে একটু দেখবেন ?

দেখছি আপনার ছেলেকে। দয়া করে কথা বলবেন না।

আজকে দেখে দিলে খুবই উপকার হয়। তাহলে আগামীকাল আসতে হয় না। পার্টিকে মোবাইলে খবর দিয়ে দিয়েছি। পার্টি যদি দেখে আমি কথা দিয়ে কথা রাখি না, তাহলে পরে সমস্যা হবে। ব্যবসার আসল পুঁজি গুডউইল।

স্টপ ইট !

জ্বি আচ্ছা।

আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে বসুন। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি।

আমি বাইরে চলে গেলে লাভ হবে না স্যার। আমার ছেলে বাপ ছাড়া কিছু বোঝে না। তার মা যখন জীবিত ছিল তখনো এই অবস্থা। এটা নিয়ে তার মায়ের খুবই আফসোস ছিল। তার মা হারুন হারুন বলে গলা ফাটায়ে দিচ্ছে ছেলে জবাব দেবে না। অথচ আমি একবার পাতলা গলায় হারুন ডাকলে—জ্বি বাবা বলে দৌড় দিয়ে ছুটে আসবে। লোক মুখে শুনি ছেলেরা হয় মায়ের ভক্ত। মেয়েরা হয় বাপের ভক্ত। আমার বেলায় উল্টা নিয়ম।

জালাল সাহেব !

জ্বি।

আপনি কি বাইরে গিয়ে বসবেন ? এখুনি বাইরে যাবেন। রাইট নাও। আপনি যদি তিন সেকেন্ডের ভিতর বাইরে না যান আমি দারোয়ান দিয়ে বের করে দেব।

রাগ করছেন কেন স্যার।

তিন সেকেন্ড। জাস্ট থ্রি সেকেন্ডস।

জালাল মিয়া উঠে দাঁড়ালেন। তার ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। জালাল মিয়া বললেন, বাবা তুমি বসো। ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

উনি যা জিজ্ঞেস করবেন জবাব দেবে। তোমার যে মাথার যন্ত্রণা হয় এইটা বলবা।

ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

বাবা আমি বাইরেই আছি কোন সমস্যা নাই।

ছেলে আবারো অতি বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল।

আনিসুর রহমান খান ছেলের দিকে তাকালেন। শান্ত ভদ্র চেহারা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তবে মাথায় চুল কম। এই বয়সী ছেলেদের মাথাভর্তি চুল থাকার কথা। বুদ্ধিহীন বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টি টেবিলের পায়ার দিকে।

তোমার নাম কী ?

হারুন অর রশিদ।

বাগদাদের খলিফা ?

জ্বি না।

আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি, তুমি যে বাগদাদের খলিফা না তা আমি জানি। তোমার সমস্যা কি ?

জানি না।

তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে কেন এনেছেন ?

জানি না।

তোমার বাবা মাথা ব্যথার কথা বলছিলেন। মাথা ব্যথা হয় ?

হুঁ।

কখন ?

যখন অংক করি।

আমি তো শুনলাম তুমি বিরাট অংকবিদ। অংক করলেই যদি মাথা ব্যথা হয় তাহলে কীভাবে হবে। এখন মাথা ব্যথা আছে?

না।

আচ্ছা তোমাকে একটা অংক করতে দিচ্ছি—দেখি অংকটা করার পর মাথা ব্যথা হয় কি না। দুই এর সঙ্গে চার যোগ করলে কত হয়?

হারুন অর রশিদ এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না। টেবিলের পায়া থেকে চোখ তুলে আনিসুর রহমানের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ছয় হয়।

আনিসুর রহমান বললেন, এইতো পেরেছ। তুমি যে অংকবিদ এটা তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন। কাগজ কলম ছাড়াই তো অংকটা করে ফেলেছ। এখন বল মাথা ব্যথা করছে?

মাথা ব্যথা করছে না।

তোমার কোন অসুখ বিসুখ নাই। যাও বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।

হারুন উঠে দাঁড়াল। আনিসুর রহমান বললেন, তুমি তোমার বাবাকে কম কথা বলতে বলবে। আমার ধারণা তোমার বাবার ধারাবাহিক কথা শুনে তোমার মাথা ধরে। আচ্ছা যাও বিদায়।

হারুন অর রশিদ আনিসুর রহমানকে অবাক করে দিয়ে বলল, বাবার কথা শুনে আমার মাথা ধরে না। আপনি যে সব অংক দিয়েছেন সে সব করেও মাথা ধরে না। ওরা যে সব অংক দেয় সেগুলি করার সময় মাথা ধরে।

ওরা মানে কারা?

আমি তাদেরকে চিনি না। কখনো দেখি নাই। তারা হঠাৎ মাথার ভিতর অংক দিয়ে দেয়।

তুমি বস।

হারুন বসল। আনিসুর রহমান তার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, পরিষ্কার করে বল কী বলতে চাচ্ছ। মাথার ভিতর অংক কীভাবে ঢুকিয়ে দেবে? নাকের ফুটা দিয়ে? কথা বলছ না কেন? কথা বলো।

হারুন অর রশিদ আবারো চেয়ারের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আনিসুর রহমান ছেলেটাকে ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না, কারণ ছেলেটা কাঁদছে।

কাঁদছ কেন?

আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন এই জন্যে কাঁদছি।

সরি। আর ঠাট্টা করব না। কোক খাবে ? আমার ফ্রিজে কোকের ক্যান আছে। খাবে ?

হ্যাঁ খাব।

আনিসুর রহমান খান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে এখন মমতার প্রবল ছায়া। ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরেই মানসিক চাপে ছিল এই অবস্থায় তাকে কোক খেতে বলা হয়েছে। তার অবস্থানে যে আছে সে কখনো বলবে না—খাব। সে বলেছে। তাকে কোক দেয়া হয়েছে। সে আগ্রহ নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। তার দৃষ্টি চেয়ারের পায়ে। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। ছেলেটার চেহারা সুন্দর। বেশ সুন্দর। চেহারায় মায়া ভাব অত্যন্ত প্রবল।

দরজায় শব্দ হল। ছেলের বাবা মাথা বের করে বলল, স্যার আসব ?

আনিসুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, না।

জ্বি আচ্ছা স্যার। আমি বাইরে আছি। এক মিনিট যদি সময় দেন হারুনের মূল বিষয়টা বলি। সে গুছায়ে বলতে পারবে না। নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে...

আপনি বাইরে বসুন।

জ্বি আচ্ছা স্যার। প্রয়োজন হলে ডাক দেবেন, আমি আছি। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে শুধু রাস্তার পাশে পান সিগারেটের দোকানটায় যাব। পান শেষ হয়ে গেছে। স্যার আপনার জন্যে কি একটা পান নিয়ে আসব ? আমার কাছে ময়মনসিংহের খুব ভাল জর্দা আছে, মিকচার জর্দা।

আপনি বাইরে থাকুন। Please দরজা ভিড়িয়ে দিন। অনেক কথা অল্প সময়ে বলে ফেলেছেন।

দরজা বন্ধ হল। আনিসুর রহমান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার মাথার ভিতর কারা যেন অংক ঢুকিয়ে দেয় ?

জ্বি।

আর তুমি সেই অংক করতে থাকো ?

জ্বি।

অংক করা শেষ হলে তারা কি অংকের উত্তর নিতে তোমার কাছে আসে ?

না।

তাহলে তারা অংকের উত্তর পায় কী করে ?

তারা মাথার ভিতর থেকে নিয়ে নেয়।

অংক দেয়া নেয়া এটা কি তোমার মায়ের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে ?

না তারো আগে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন।

প্রথম তোমাকে যে অংকটা করতে দিয়েছিল সেটা তোমার মনে আছে ?

আছে।

অংকটা বলো আমি কাগজে লিখে নেই।

বলব না।

কেন ?

বলতে ইচ্ছা করছে না।

ওরা যে সব অংক দেয় সে সব করতে তোমার কতক্ষণ লাগে ?

কোন কোনটা খুব অল্প সময় লাগে। আবার কোন কোনটা অনেক বেশি সময় লাগে। শেষ হয় না চলতেই থাকে।

এখন কি কোন অংক করছ ?

হুঁ। এই অংকটা শেষ হচ্ছে না। সহজ অংক কিন্তু শেষ হচ্ছে না।

এই অংকটা কি আমাকে বলবে ?

এটা হল একটা ভাগ অংক, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ।

এটাতো খুবই সহজ অংক। দাঁড়াও আমি দেখি—আনিসুর রহমান কাগজ কলম নিলেন। হাসিমুখে বললেন এইতো হয়েছে—৩.১৪২।

হারুন বলল, শেষ করুন। শেষ হবে না চলতেই থাকবে।

আনিসুর রহমান বললেন, শেষ হবে না মানে কী ? শেষ হতেই হবে। এক সময় পৌনঃপুনিক চলে আসবে। পৌনঃপুনিক কী জানো ?

জানি।

স্কুলে শিখিয়েছে ?

না ওরা শিখিয়েছে।

ওরা মানে কারা ?

আমি জানি না।

একজন না অনেকজন ?

অনেকজন। ওদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে।

মেয়ে আছে বুঝলে কী করে তার চেহারা দেখেছ ?

না। গলার স্বর শুনেছি।

গলার স্বর কেমন ?

খুব মিষ্টি কিন্তু ভাঙা ভাঙা।

তারা কি তোমাকে শুধু অংকই দেয় নাকি গল্প গুজবও করে ?

মেয়েটা মাঝে মাঝে গল্প করে।

কী বলে ?

বলে যে ওরা যে শুধু আমাকে দিয়েই অংক করায় তা-না, অনেককে দিয়েই করায়।

তুমি কখনো জিজ্ঞেস করোনি—আপনারা কে ?

জিজ্ঞেস করেছি। তারা উত্তর দেয় না শুধু হাসে।

আনিসুর রহমান ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত দশটা বাজে। নিজের উপর এখন তাঁর সামান্য বিরক্তি লাগছে। তিনি ছেলেটিকে দীর্ঘ সময় দিয়েছেন। যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এরা ছিল শেষ রোগী, এই জন্যেই সময়টা দেয়া গেছে। তাছাড়া আগামীকাল শুক্রবার। তাঁর চেম্বার বন্ধ। ছেলেটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক। সামান্য কিছু মানসিক সমস্যা হয়ত আছে। সেই সমস্যার সমাধান সাইকিয়াট্রিস্টরা করবেন। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট না। এই বিষয়টাই ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে। তবে ঐ উজবুকটার সঙ্গে কথা না বলতে পারলে ভাল হত। তার সঙ্গে কথা বলার অর্থ একটা উপন্যাসের অর্ধেকটা শুনে ফেলা।

আনিসুর রহমান বাসায় ফিরলেন রাত এগারোটায়। আধাঘণ্টা দেরিতে। তাঁর রুটিন হল সাড়ে দশটার ভেতর বাসায় ফেরা। বড় একটা টাওয়েল জড়িয়ে খালি গায়ে রকিং চেয়ারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম। বিশ্রাম করতে করতেই খবরের কাগজ পড়া। সবাই খবরের কাগজ পড়ে ভোরে, তিনি এই সময়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কিছু কিছু খাবার আছে টাটকা খেতে ভাল না একটু বাসি হলে ভাল লাগে। বাংলাদেশের খবরও সেই পর্যায়ের। বাসি ভাল, টাটকা ভাল না। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি ঘরে ব্রিউ করা এক মগ কালো কফি খান। তাঁর একমাত্র কন্যা জেনিফারের সঙ্গে গল্প করেন। স্ত্রী রুমানার সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক এগারোটায় বাথরুমে ঢুকে যান। বাকি আধঘণ্টা কাটে বাথরুমের বাথটাবে। বাথটাব ভর্তি থাকে পানি। তিনি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পানিতে শুয়ে থাকেন। মগ ভর্তি কফি তখনো শেষ হয় না। তিনি কফিতে চুমুক দেন। বাথরুমের দরজা থাকে খোলা। জেনিফার যাতে বাথরুমে আসা যাওয়া করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। জেনিফার স্কলাসটিকায় ফিফথ গ্রেডে পড়ে। সে বাবার অসম্ভব ভক্ত। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণই কিছু সময় পর পর তার বাবার সঙ্গে কথা বলা চাই।

তিনি আজ দেরি করে ফিরলেন কিন্তু সময়মতই বাথরুমে ঢুকে গেলেন। মাঝখানের আধঘণ্টার কার্যক্রম বাতিল হয়ে গেল। জেনিফার তাকে কফির মগ দিয়ে গেল। মিষ্টি করে বলল, খবরের কাগজ দেব বাবা ?

আনিসুর রহমান বললেন, না।

তুমি কি আজ রাতে আমার সঙ্গে মুভি দেখবে ?

দেখতে পারি। কাল ছুটি, কাজেই রাত জাগা যেতে পারে। ভাল কোন মুভি আনিয়ে রেখেছিস ?

এমেডিউস দেখবে ?

বিষয়বস্তু কী ?

মোজার্টের লাইফ।

এইসব হাইফাই জিনিস ভাল লাগবে না। ভূত প্রেতের ছবি আছে না ?

অনেকগুলি আছে কোনটা দেখবে ?

যেটা সবচে' ভয়ংকর সেটা, ভাল কথা মা তোর ক্যালকুলেটার আছে না ?

আছে।

একটা কাজ করতো চট করে ২২কে ৭ দিয়ে ভাগ করে রেজাল্টটা নিয়ে আয়।

কেন ?

এম্নি।

আনিসুর রহমান গায়ে সাবান ডলতে লাগলেন। আজকের কফিটা অন্যদিনের চেয়ে খেতে ভাল লাগছে। এটা চিন্তার বিষয়। তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে রাতে কফি খেতে খুবই ভাল লাগে সে রাতের খাবারটা খেতে ভাল হয় না। তিনি দুপুরে একটা কলা এবং স্যান্ডউইচ খান। রাতের খাবারটা এই জন্যেই তার কাছে জরুরি।

জেনিফার বাথরুমে ক্যালকুলেটর নিয়ে ঢুকলো। মিষ্টি করে বলল, ভাগ করেছি। রেজাল্ট হচ্ছে ৩.১৪১৮ ৫৭১৪

আনিসুর রহমান বললেন, এই পর্যন্তই ?

জেনিফার বলল, আমার ক্যালকুলেটরে দশমিকের পর আট ডিজিট পর্যন্ত হবে, এর বেশি হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তুমি এটা দিয়ে কী করবে ?

এম্নি—কোনই কারণ নেই। আজকের রাতের রান্না কী ?

আজ রাতে তোমার খুব পছন্দের খাবার আছে। ইলিশ মাছের ডিমের ভুনা। কাতল মাছের মাথার মুড়িঘন্ট।

মাংস নেই ?

মনে হয় না। মাংস রান্না করতে বলব ?

দরকার নেই। তুই একটা কাজ করতো মা, এই অংকটাই কম্পিউটারে করে দেখ আরো বেশি ডিজিট পাওয়া যায় কী না।

কেন বাবা ?

এম্নি মা। No particular reason.

রাতে খেতে গিয়ে আনিসুর রহমান খান চমৎকৃত হলেন। মাছ ছাড়াও দু' ধরনের মাংস আছে। মুরগির ঝাল ফ্রাই, গরুর কলিজা ভুনা। একজন ডাক্তার হিসেবে কলিজা ভুনার মত হাই কোলেস্টেরল ডায়েট খাওয়া একেবারেই উচিত না ; কিন্তু যাবতীয় হাই কোলেস্টেরল ডায়েট তার অতি পছন্দ।

রুমানা বললেন, তুমি জেনিফারকে দিয়ে পাই এর ভ্যালু বের করাচ্ছ কেন ?

আনিসুর রহমান বললেন, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিতে বলেছি।

এটা হল পাই। পরিধি ডিভাইডেড বাই ব্যাস। পরিধি হচ্ছে $2\pi r$ আর ব্যাস হচ্ছে $2r$ ভাগ করলে থাকে π.

তুমি এতসব জানো কীভাবে ?

রুমানা বললেন, তুমি প্রায়ই ভুলে যাও যে আমি ফিজিক্স পড়েছি।

আনিসুর রহমান বললেন, এটাতো ফিজিক্স না এটা হল ম্যাথ।

রুমানা বললেন, চুপ করে খাও তো। কোনটা ফিজিক্স কোনটা ম্যাথ তা নিয়ে তোমার গবেষণা করতে হবে না।

আনিসুর রহমান বললেন, পাই বস্তুটার মান কত ?

মান হল ৩.১৪।

তা হবে কেন এটা তো পয়েন্ট ওয়ান ফোরে শেষ হয় না, চলতেই থাকে।

চলতে থাকলেই সব সংখ্যা নিতে হবে ? দরকারটা কী ?

আনিসুর রহমান বললেন, তা ঠিক কোন দরকার নেই। পণ্ডশ্রম। একেবারেই পণ্ডশ্রম।

রুমানা বললেন, তুমি ডাক্তার মানুষ তুমি পাই নিয়ে হৈ চৈ করছ কেন ?

আনিসুর রহমান বললেন, হৈ চৈ করছি কোথায় ? হৈ চৈ করছি নাতো।

রান্না কেমন হয়েছে ?

অসাধারণকে দশ দিয়ে গুণ দিলে যা হয় তাই হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলিজা ভুনা আজ রাতে খেলাম।

ইলিশ মাছের ডিমের চেয়েও ভাল হয়েছে ?

এইতো এক সমস্যায় ফেললে শ্যাম রাখি না রাধা রাখি।

রুমানা বললেন, তুমি ডাক্তার মানুষ। ডাক্তারি নিয়ে থাকো। পাই এর মান, বাংলা সাহিত্য এই সবে যাবার দরকার নেই। শ্যাম রাখি না রাধা রাখি বলে কিছু নেই। বাক্যটা হল শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

সরি।

সরি বলারও কিছু নেই। শুধু শুধু সরি বলছ কেন?

আনিসুর রহমান বললেন, সরি বলার জন্যে সরি।

রাতটা তাঁর খুব ভাল কাটল। তিনজন মিলে ফ্রাইডে দ্যা থার্টিন ছবিটা দেখলেন। ছবি দেখে ভীত হবার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করে রাতে ঘুমুতে গেলেন। ঘুম খুব ভাল হল না। সারাক্ষণই স্বপ্ন দেখলেন তিনি বাইশকে কখনো সাত দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন, কখনো তিন দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন আবার কখনো বা পাঁচ দিয়ে দিচ্ছেন। রাতে কয়েকবার তাঁর ঘুম ভাঙল। এ রকম কখনো হয় না। তিনি ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়াই এক ঘুমে রাত পার করার মানুষ।

পরের তিন সপ্তাহ আনিসুর রহমানের অতি ব্যস্ততায় কাটল। তিনি ব্যাঙ্গালোরে একটি সেমিনারে এ্যাটেন্ড করতে গেলেন। ফিরে এসে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষার একস্টারনাল একজামিনার হিসেবে রাজশাহী গেলেন। রুমানার এক খালাতো বোনের হুট করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চিটাগাং গেলেন। তবে এর ফাঁকে ফাঁকে পাই বিষয়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন। যেমন—

১. এই সংখ্যাটির মান এখনো নির্ণয় করা যায়নি। অতি শক্তিমান কম্পিউটারের সাহায্যে চেষ্টা করা হয়েছে। সংখ্যা দশমিকের পর চলতেই থাকে। কখনো পৌনঃপুনিক আসে না।
২. মহান গ্রিক অংকবিদ পিথাগোরাসের ধারণা 'পাই' প্রকৃতির একটি রহস্যময় বিষয়। যিনি এই রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন তিনি প্রকৃতির একটা বড় রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।
৩. আমেরিকান এস্ট্রনমার কার্ল সেগান 'পাই'-এর রহস্য নিয়ে একটি বই লিখেছেন। যে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'পাই'-এর মানে ঈশ্বর কিছু বলতে চাচ্ছেন। এটা তাঁর ভাষা।

তিনি এর মধ্যে হারুন অর রশিদ নামের ছেলেটির খোঁজ বের করারও চেষ্টা করলেন। সমস্যা হল ছেলেটির নাম ছাড়া তাঁর আর কিছুই মনে নেই। ছেলেটার

বাবা একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল সেই কার্ড তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোথায় যেন তার একটা দোকান বা শো-রুম আছে বলেছিল। জায়গাটার নাম মনে করতে পারলেন না। শুধু মনে আছে সেই দোকানে ভদ্রলোকের এক আত্মীয় বসে যার চেহারা ফিল্মের কোন নায়ক বা নায়িকার চেহারার মত। এই তথ্য দিয়ে কাউকে খুঁজে বের করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তারপরেও তিনি তার এ্যাসিসটেন্টকে দায়িত্ব দিয়েছেন—ঢাকার সব কটা স্কুলে সে যাবে সেখানে হারুন অর রশিদ নামে এগারো বার বছরের কোন ছেলে আছে কী না খোঁজ করবে। সেই অনুসন্ধানেও কোন ফল হচ্ছে না।

আনিসুর রহমানের জীবন যাপন পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এখন আর রাত সাড়ে দশটায় বাসায় ফেরেন না। তিনি ফেরেন রাত এগারোটায়। এই আধঘণ্টা সময় গভীর নিষ্ঠায় পাই-এর মান বের করার চেষ্টা করেন।

হলুদ মলাটের একশ' পৃষ্ঠার একটা বাঁধানো খাতা তিনি কিনেছেন। খাতার পাতার অর্ধেকের বেশি লিখে ফেলেছেন। অংক এখনো চলছে। কাজটা করে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। দশটা বাজার পরপরই তিনি অস্থির বোধ করেন কখন অংক শুরু করবেন। খাতাটা তিনি বাড়িতে নেন না। অতি মূল্যবান বস্তুর মত চেম্বারে ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রাখেন। খাতা বিষয়ে বা অংক বিষয়ে তিনি কারো সঙ্গেই কোন কথা বলেন না। মাঝে মাঝে তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমার কি কোন সমস্যা যাচ্ছে ! তোমাকে সব সময় অস্থির লাগে কেন ?

তিনি হড়বড় করে বলেন, কই অস্থির নাতো।

রাতে মনে হয় তোমার ভাল ঘুম হয় না। প্রায়ই শুনি তুমি বিড়বিড় করছ।

আমার ঘুমের কোন সমস্যা নেই।

একজন ডাক্তার কি দেখাবে ?

খামাখা কেন ডাক্তার দেখাব।

তাহলে চল কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

চল যাই। কোথায় যেতে চাও ?

মালয়েশিয়া যাবে ? শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।

যেতে পারি।

আনিসুর রহামান পনেরো দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে মালয়েশিয়া গেলেন। খাতাটা সঙ্গে নিলেন না। পনেরো দিন আনন্দ করেই কাটালেন। দেশে ফিরে আবার সেই আগের রুটিন। তবে অংক করার সময় আরেকটু বাড়ালেন।

এখন তিনি অংক করেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বাসায় আগের মতই এগারোটায় ফেরেন। রোগী দেখেন পনেরো মিনিট কম।

ছয় মাসের ভেতর আনিসুর রহমানের খাতার সংখ্যা হল দশটা। অংক করার সময়ও বাড়ল। তিনি এখন ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা সময় দেন অংকের পেছনে। তাঁর বড় ভাল লাগে।

এক ডিসেম্বর মাসের কথা। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কোল্ড ওয়েভ শুরু হয়েছে। নেমেছে কুয়াশা। আনিসুর রহমান চেম্বারে বসে আছেন। রাত আটটা। দু'জন রোগী ছিল তাদের দেখা শেষ হয়েছে। চেম্বারে আর কেউ নেই। আনিসুর রহমান তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের মনে খুব আনন্দ। তিন ঘণ্টা টানা সময় পাওয়া গেছে। মন লাগিয়ে অংক করা যাবে। তিনি নতুন একটা খাতা বের করলেন। আর তখন তাঁর মাথার ভেতর কেউ একজন কথা বলে উঠল। মেয়ের গলা। অতি মিষ্টি গলা তবে ভাঙা ভাঙা।

আনিসুর রহমান ভাল আছেন?

কে কে কে?

আমরা আপনার নিবেদন দেখে খুশি হয়েছি।

কে? আপনারা কে?

এখন থেকে আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আপনাকে অংক করতে সাহায্য করব।

আপনারা কে?

আমরা কে সেটা জরুরি না। যে অংকটা আপনি করছেন সেটা জরুরি।

আনিসুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। অংকটা করুন।

এই অংক কী কখনো শেষ হবে?

না।

যে অংক শেষ হবে না সেই অংক করে লাভ কী?

শেষ না হলেও একটা সিরিজ বের হয়ে আসবে। আমাদের প্রয়োজন সিরিজ। সিরিজও শেষ না।

সিরিজ কী?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ একটা সিরিজ যেটা চলতে থাকে, আবার ২ ৪ ৬ ৮ ১০ আরেকটা সিরিজ। কোন সিরিজই শেষ হয় না।

একই অংক কি আপনারা অনেককে দিয়ে করাচ্ছেন? আমি যতদূর জানি হারুন অর রশিদও এই অংক করছে।

যেই মুহূর্তে আপনি শুরু করেছেন আমরা হারুনকে সরিয়ে দিয়েছি। তাকে অন্য কাজ দিয়েছি। তাকে সিরিজ করতে দিয়েছি।

হারুনের সঙ্গে কি যোগাযোগ করা যায়?

অবশ্যই যায় সে আমাদের সঙ্গেই আছে। একদিন আমরা আপনাকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে নেব।

কবে?

সেটাতো এখনো বলতে পারছি না। হারুনের সঙ্গে কথা বলবেন।

হ্যাঁ।

আরেকদিন কথা বলিয়ে দেব। কেমন?

আচ্ছা।

অংক করুন।

আচ্ছা।

হারুন অর রশিদের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার বাবা এসে খবর দিয়ে গেছেন। ছেলেটা মারা গেছে অক্টোবরের ১১ তারিখ। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা হয়েছিল। হাসপাতালে নিতে নিতেই সে মারা যায়। মৃত্যুর সময় তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছিল।

ছেলের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্যার আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ ছেলেটা প্রায়ই আপনার কথা বলত।

লোকটার হয়ত আরো অনেক কথা বলার ছিল। আনিসুর রহমান তাকে সুযোগ দিলেন না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি এখন সময় নষ্ট করেন না। তিনি কাজ করে যান। কাজটা প্রয়োজন। অন্য সব কিছুই অপ্রয়োজনীয়।

পরেশের 'হইলদা' বড়ি

পরেশ বৈদ্য নয়াবাজারে একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। বত্রিশ ভাজা কাজ। সকালে দোকান ঝাড় দিয়ে তার দিনের শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত খদ্দেরদের সে কাপড় দেখায়, বিকিকিনি করে। ক্যাশ দেখে দুপুরে তার এক ঘন্টার ছুটি। এই এক ঘন্টায় সে রান্নাবান্না করে। তার রান্নার হাত ভাল। দোকানের মালিক আজিজ মিয়া তার হাতের রান্নার বিশেষ ভক্ত। অনেককেই তিনি বলেছেন, হিন্দুটা রান্ধে ভাল। বিশেষ করে মাষকলাইয়ের ডাল। বাংলাদেশে এত ভাল মাষকলাইয়ের ডাল আর কেউ যদি রানতে পারে তাহলে আমি কান কেটে ফেলব।

আজিজ মিয়া পরেশ বৈদ্যকে খুবই পছন্দ করেন। মানুষটা সৎ। তার কোন দাবি দাওয়া নাই। থাকা খাওয়া এবং মাসে মাত্র তিনশ' টাকায় এমন বিশ্বাসী লোক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আজিজ মিয়া প্রায়ই ভাবেন পরেশের বেতন বাড়িয়ে পাঁচশ' করে দেবেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। দোকানে হাটবার ছাড়া বিকিকিনি একেবারেই নাই। নয়াপাড়া অতি অজ জায়গা। অঞ্চলটাও দরিদ্র। গামছা ছাড়া কাপড় কেনার সামর্থ্যও মানুষের নেই।

বেতন বাড়াতে না পারলেও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে আজিজ মিয়া সেটা পুষিয়ে দেন। দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাবার সময় তিনি পরেশকে সঙ্গে নিয়ে যান, বাড়িতে পাশে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ান। খাওয়া দাওয়ার শেষে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করেন। পরেশ দোকানে ফিরে যায়। রাতে সে দোকানেই ঘুমায়।

আজিজ মিয়ার চার মেয়ে। বড় দুটা বিবাহযোগ্য। তাদের জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে। মন মত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। পরেশ বৈদ্য হিন্দু না হয়ে মুসলমান হলে তিনি অবশ্যই তার বড় মেয়ে পরীবানু খানমের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেন। পরেশ যদি এখন মুসলমান হয় তাহলে তিনি বিবেচনা করবেন। শুধু পরেশের বয়স একটু বেশি। চল্লিশের উপর। তবে পুরুষ মানুষের জন্য বয়স কিছু না। মেয়েদের বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষের না।

তিনি বিষয়টা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা বেগম হতভম্ব হয়ে বলেছেন, মালাউনের সাথে মেয়ে বিবাহ দিতে চান ? কী বলেন আপনি ?

মুসলমান হবার পরে বিবাহ করবে। ইসলাম ধর্মীয় মতে বিবাহ।

কচ্ছপ খাওইন্যার সাথে মেয়ের বিবাহ ছিঃ।

মুসলমান হবার পরে তো আর কচ্ছপ খাবে না।

এইসব আপনি ভুলে যান। কর্মচারীর সাথে মেয়ের বিবাহ ! আল্লাহ মাফ করুক। ছেলের শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই। আপনার মেয়ে কলেজে ভর্তি হইছে।

পরেশ বৈদ্যের লেখাপড়ায় সামান্য ঘাটতি আছে। সে ক্লাস সিক্স সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। তবে তার হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর। মুক্তার মত অক্ষর। তবে মুক্তাক্ষর কোন পাত্রের গুণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

এক আষাঢ় মাসের কথা। সারাদিন খটখটে রোদ গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ আকাশ কাল মেঘে ঢেকে গেল। শুরু হল প্রবল বর্ষণ। আজিজ মিয়া ঠিক করলেন আজ আর বাড়ি ফিরবেন না। দোকানেই রাতটা কাটিয়ে দেবেন। কাদা ভেঙে দুই মাইল হাঁটার অর্থ হয় না। তাছাড়া বাড়ির কাছাকাছি খালের মত আছে। আগে পায়ে হেঁটে খাল পার হওয়া যেত। গত কয়েকদিনে পানি বেড়েছে। আজ যে বৃষ্টি হচ্ছে খালে সাঁতার পানি হয়ে যাবার কথা।

আজিজ মিয়া পরেশকে ডেকে বললেন, ভাত রেঁধে ফেল। রাতে আর বাড়িতে যাব না।

পরেশ নিচু গলায় বলল, মামানি দুচিন্তা করবেন না ? (আজিজ মিয়ার স্ত্রীকে পরেশ মামানি ডাকে) আজিজ মিয়া বললেন, করুক দুশ্চিন্তা। মেয়েছেলে যদি মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা না করে তাহলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। আল্লাহপাক মেয়েছেলে পয়দা করেছেন দুশ্চিন্তা করার জন্যে।

রাতে খাবেন কী ?

মাংস খেতে মনে চাচ্ছে। মাংস এখন পাব কই। খিচুড়ি করো। সঙ্গে ডিম ভুনা। পাতলা খিচুড়ি করবে।

আচ্ছা করব।

খিচুড়ির মধ্যে চায়ের চামচের দুই চামচ ঘি দিয়ে দিও। ঘিয়ের সুঘ্রাণ ভাল লাগবে।

ঘি আছে না ?

আছে।

কাঁঠালের বিচি দিয়ে ঝাল মুরগির মাংস খেতে পারলে দিলখুস হত। ডিমও খারাপ না।

আজিজ মিয়া রাতে খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তিনি ঠিক করলেন, বৃষ্টি বাদলার দিনে পরেশকে দিয়ে সব সময় পাতলা খিচুড়ি এবং ডিমের তরকারি করতে বলবেন। তাঁর পান তামাকের অভ্যাস নেই। তারপরেও তিনি দুটা পান

খেলেন। পরেশকে দিয়ে সিগারেট আনালেন। সিগারেট ধরিয়ে অতি আনন্দে টানতে লাগলেন।

দোকানের গদিতে বিছানা করা ছিল। তিনি ঘুম ঘুম চোখে বিছানায় গেলেন। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে। ঝুম ঝুম শব্দ। আরামদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া। আজিজ মিয়ার মনে হল তিনি জগতের অতি সুখী মানুষদের একজন।

পরেশ বলল, মামা (আজিজ মিয়াকে সে মামা ডাকে) মাথা বানায়া দেই।

আজিজ মিয়া জড়ানো গলায় বললেন, লাগবে না লাগবে না। তুমি ঘুমাও।

পরেশ বলল, একটু চুল টেনে ঘুম পাড়ায়ে দেই। আরাম লাগবে।

পরেশ চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। আজিজ মিয়ার এত আরাম লাগছে যে বলার না। আবার ঘুমও পাচ্ছে প্রচণ্ড। তিনি চেষ্টা করছেন জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়লে এই আরামটা পাওয়া যাবে না।

পরেশ।

জ্বি মামা?

এ রকম মাথা বানানো কোথায় শিখেছ? একমাত্র নাপিতরাই এত সুন্দর মাথা বানায়। তোমাদের বংশে কোন নাপিত ছিল?

না মামা।

তোমার বেতন বাড়ানোর চেষ্টা নিব। বাড়ানো উচিত। রোজগার পাতি নাই বলে কিছু করতে পারতেছি না।

দরকার নাই মামা।

দরকার যে নাই তুমিতো বলবেই। কারণ তুমি অতি ভাল ছেলে। তুমি যদি 'কচ্ছপ খাওয়া' ধর্মের না হতে অবশ্যই পরীবানুর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতাম। পরীবানুর চেহারা ছবিতো খারাপ না। কী বলো? তবে মিজাজ ভাল না। মায়ের মত চড়া মিজাজ। মেয়েছেলের চড়া মিজাজ সংসারের জন্যে ভাল না।

পরেশ জবাব দিচ্ছে না। একমনে চুল টেনে যাচ্ছে। আজিজ মিয়া চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন এবার পাশ ফিরলেন। পাশ ফিরে আরাম আরো বাড়ল। পরেশ এখন ঘাড় ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। এই ম্যাসেজে আরাম আরো বেশি হচ্ছে। আজিজ মিয়া চেষ্টা করছেন আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়া মানে সব শেষ।

পরেশ।

মামা বলেন।

চুপ করে থাকবা না। কথা বলো। গল্প গুজব করো।

কী গল্প করব ?

যা ইচ্ছা করো। মাথা ম্যাসেজ ছাড়া আর কী বিদ্যা তুমি জানো ? বলতে থাক শুনি। আমার ধারণা তুমি আরো অনেক কিছু জানো।

জানি মামা।

বলো। একটা একটা করে বলো। বাদ্য বাজনা জানো ?

না বাদ্য বাজনা জানি না। তবে আমি সামনে পিছনে সব দেখতে পারি।

এইটা কি বললা পরেশ। সামনে পিছনে তো সবেই দেখে। সামনে দেখি আবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছনে তাকাইলে পিছন দেখি।

আমারটা এই রকম না।

কীরকম ?

ধরেন আইজ থাইক্যা এক লাখ বছর পরে পৃথিবীর কী অবস্থা এই গুলান দেখতে পারি।

ভাল খুব ভাল।

একজন আমারে একটা হইলদা বড়ি খাওয়াইছিল তখন থাইক্যা দেখি।

কী বড়ি ?

হইলদা বড়ি।

আজিজ মিয়া পুরোপুরি তন্দ্রার মধ্যে চলে গেলেন। চেতনার অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পরেশের কথা শুনছেন পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। নিজেও মাঝে মধ্যে কথা বলছেন। কী বলছেন সেই বিষয়েও তাঁর ধারণা নেই।

পরেশ বলল, আমি সবই দেখতে পাই।

আজিজ মিয়া বললেন, সব দেখতে পাওয়াই ভাল। কিছু দেখা কিছু না দেখা ভাল না।

আসমানে যে চণ্ড আছে সেই চণ্ড কিন্তু মামা থাকবে না। পৃথিবীর উপরে আইসা পড়বে।

পড়ুক। ধুম কইরা পড়ুক। চণ্ড না থাকা ভাল। চণ্ড আসমানে থাকলেই জোছনা হয়। সেই জোছনায় অনেক পাপ কার্য হয়। আমি নিজেই এই রকম একটা পাপ কার্য করেছিলাম। পাট ক্ষেতে। আসমানে চণ্ড থাকা উচিত না। গেরামে পাটক্ষেত থাকাও উচিত না। বুঝেছ ?

বুঝেছি মামা। সূর্যের কী গতি হইব শুনবেন ?

বলো শুনি।

সূর্য সবকিছু টান দিয়া নিজের উপরে ফেলব। আগুনের থাবা বাইর কইরা টান দিব। তারপরে ছোট হওয়া ধরব। বিন্দুর মত ছোট হইব।

কি বললা—বিন্দু ?

হুঁ মামা বিন্দু।

আমার খালাতো এক বোন ছিল বিন্দু নাম। বিবাহ হয়েছে জামাই সউদিতে কাজ করে বিরাট পয়সা করেছে।

জগতের যা কিছু আছে বুঝছেন মামা, সব একদিন আন্ধাইর হইয়া যাইব। আসমানে কোন তারা থাকব না। সব নিভা। তখন মাঝে মইদ্যে গমগম আওয়াজ উঠব। মামা বুঝছেন ?

বজ্রপাতের আওয়াজ। বুঝেছি। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বজ্র পড়বই। ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। গায়ে একটা চাদর দিয়া দেও।

পরেশ মামার গায়ে চাদর দিতে দিতে বলল, হইলদা বড়ি আমারে কে দিছিল সেই ঘটনা শুনবেন মামা ? বিরাট ইন্টারেস্টের ঘটনা।

বড়ি পয়সা দিয়া খরিদ করছিলা ?

না। এবেই দিছে।

বিরাট বড় হাই তুলতে তুলতে আজিজ মিয়া বললেন, মাগনা অষুধে কাম করে না। অষুধ বিষুদ যখনই কিনবা এক পয়সা হইলেও হাদিয়া দিবা। মনে থাকব ?

থাকব। এখন কি ঘটনাটা বলব ?

কী ঘটনা ?

হইলদা বড়ি কে দিছে সেই ঘটনা। বিরাট ইন্টারেস্টের ঘটনা।

বাদ দেও। ঘটনা যত কম শুনা যায় ততই ভাল। ঘুমে চউখ বন্ধ হইয়া আসতেছে। এখন ঘুমাব।

আচ্ছা ঘুমান।

তুফান হইতেছে না কি ?

না এখনো শুরু হয় নাই। তবে শেষ রাইতে বিরাট তুফান হইব। লণ্ডভণ্ড তুফান।

কে বলছে ?

আপনেরে বলছি না হইলদা বড়ি খাওনের পরে আমি সব জানি। দূরের জিনিস যেমন জানি কাছের জিনিসও জানি।

ও আইচ্ছা। জানা ভাল। কাছের জিনিস জানা খারাপ না।

বলতে বলতে আজিজ মিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

পরেশ তাঁর মাথার কাছে বসে এখনো চুল টেনে দিচ্ছে। সে ঘুমাতে যাচ্ছে না। কারণ আজ রাত একটা অতি ভয়ংকর রাত। এই রাতে বিরাট ঝড় হবে সেটা ভয়ংকর কিছু না। ভয়ংকর ব্যাপার হল ঝড়ের ঠিক আগে আগে পরীবানু গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দেবে।

হইলদা বড়ি খাওয়ার কারণে পরেশ সবই জানে। এও জানে যে গায়ে আগুন দেয়ার ঘটনাটা আটকানোর কোন উপায় নেই। উপায় থাকলে সে আটকাতো। হইলদা বড়ি তাকে শিখিয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটার সব ঘটে আছে। এর কোন কিছুরই কোন পরিবর্তন করা যাবে না। মানুষের কাজ শুধুই দেখে যাওয়া।

আয়না

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানিভরতি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখভরতি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। একসময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কি না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হল ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে ?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনও কিনে উঠতে পারেনি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সবসময় সব কথা মনে থাকে ?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই আয়না তো কেনা হচ্ছে না ! আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হল। সে এ বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সেজন্যেই সবসময় একধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, মা, ঘরে স্যাভলন আছে ?

ইরা বলল, জানি না বাবা।

সে যেরকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সেরকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালোমত তাকালও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কি না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড ! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী-করা। দুদিকে দুটা বেণী ঝুলছে। দুটা বেণীতে দু'রঙের ফিতা। একটা লাল একটা সাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দুটো বিষণ্ন। মেয়েটা কে ?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হল, হয়তো টুকটাক কাজের জন্য বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা, তা হলে আয়নায় মেয়েটা এল কোত্থেকে ? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন, ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা-রোগা ফরসা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী ?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে ? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না-হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উলটো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হল—কী দরকার ! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তাছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভালো লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা—তারচে' বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কী শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনো কেন ? ভাবির সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি ?'

'আজকের শার্টটা তো ভালো পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

'শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।'

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসিহাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হল শওকত সাহেব আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চ্যাংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেন নি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তাছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে ? কেনই-বা করবে ? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারপরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে ? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিস। হিসাবনিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এমনিতেই টেলিভিশন তাঁর ভালো লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিস সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে, যে-পর্দায় গানবাজনা হবে না, শুধু হিসাবনিকাশ হবে। কোনো মানে হয় ?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে।

তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুল হু আল্লাহ পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনের রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চ্যাংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন।—আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আচ্ছা।

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কী বলেন স্যার?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসিহাসি মুখে বলল, গতকাল যা যা বলেছিলাম সেসব কি স্যার আপনার মনে আছে?

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাটো ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কি?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কী সেটা মনে আছে?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমনকিছু জরুরি ব্যাপার না। মেগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেকজন মানুষের যেমন স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু-কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেগা হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেননি। তার পরেও বললেন, বুঝতে পারছি।

'একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন—কম্পিউটার হল আয়নার মতো।'

'আয়নার মতো?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়—আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তা-ই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এল কীভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কী? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, স্যার!

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না তো!'

'তা হলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না, হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হল আমাদের ফাইলিং কেবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব?...

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হল—তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথাধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ

ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন শওকত সাহেব ?

'জ্বি, স্যার, ভালো।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'জ্বি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হল ?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি—তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিস শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না।

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন ?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলছে, আপনি পারবেন না কেন ? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মতো কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন—হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জ্বি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি—সারভাইব্‌ল্ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না। আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারবেন না, তা হলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না ?'

'জ্বি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তা হলে যান।'

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানিং তাঁর ঘনঘন মাথা ধরছে। চোখ আরও খারাপ করছে কি না কে জানে ! চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা-তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেয়ে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢোকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনও আছে ? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য ! মেয়েটা তো আছে ! আগেরবার বসে ছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো ! গাল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে ? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁথির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেননি। শওকত সাহেব নিচুগলায় বললেন, তোমার নাম ?

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, চিত্রলেখা।

'বাহ্, সুন্দর নাম !'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কী বলা যায় ? আয়নার ভেতর সে এল কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন ? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো ? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, আপনার কপালে কী হয়েছে ?

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না?'

'উহুঁ।'

'আয়নার ভেতর তুমি এলে কী করে?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা-মা, তাঁরা কোথায়?'

'জানি না।'

'তোমার মা-বাবা আছেন তো? আছেন না?'

'জানি না।'

'তুমি কি একা থাক?'

'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দু'টি হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?'

'হুঁ, এখানে খুব শীত।'

'তোমার কি গরম কাপড় নেই।'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি চেন?'

'চিনি।'

'আমি কে বল তো?'

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান?'

'আপনি তো আপনার নাম বলেননি। জানব কীভাবে?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?'

'বিয়েবাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলেনি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কী?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজোটার নাম সোমা, সবচে' ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড়মেয়ের নাম ইরা হলে মেজোটার নাম হয় মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা...।'

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেননি কেন?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারও পছন্দ হয়নি।'

'আপনি কী নাম রেখেছিলেন?'

'বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহীয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করেনি। তার মা'র দোষ নেই। পুরানো দিনের নাম তো, এইজন্যে পছন্দ হয়নি।'

'বেগম রোকেয়া কে?'

'তোমাকে বললাম না মহীয়সী নারী। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শোননি?'

'জ্বি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁতকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই। তারা কী না কী মনে করবে- দরকার কী? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না, সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনী স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে

যাচ্ছেন ; হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনী স্যার তাঁকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তার পরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভরতি হতে কত টাকা লাগে কে জানে ! টাকা বেশি লাগলে ভরতি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবন্ধ করে রাখবে কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেননি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।

মাস্টার সাহেব বললেন, আচ্ছা, চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হল। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন ?

মাস্টার সাহেব বললেন, আপনার গালে কী হয়েছে ?

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভালো দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন ?'

'ইরার মাকে বলেছি—ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে ?'

'ভালো। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান ?'

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে-কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন। নিজেকে সামলালেন, কী দরকার ?

'মাস্টার সাহেব !'

'জ্বি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায় ?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তা হলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না ?

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।'

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কীভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং—চোদ্দ রকম যন্ত্রণা ! তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যে সব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিস বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নিই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।

শওকত সাহেব বললেন, আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কী করে স্যার ? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শিট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।

'কী যে স্যার বলেন ! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে ? চাকরি ছাড়লে খাবেন কী ? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তাঁর কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইরেজি করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হল তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক লোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দু'টা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটির নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম !'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না, তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, স্যার আসুন বিসমিল্লাহ্ বলে লেগে পড়ি। শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কী আর করা ! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধুশুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিস দেখো তো !'

শওকত সাহেব ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, জিনিসটা একটু ভালো করে দেখো তো !'

'জিনিসটা কী ?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, দেখলে ?

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, দেখলাম।

'কী দেখলে বলো তো ?'

'পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে ?'

'না আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনও তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হল

তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধ হয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন—ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুখি-দুখি লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছ চিত্রলেখা ?

'ভালো।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন ? মন খারাপ ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন ?'

'একা একা থাকি তো এইজন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয়-ভয় লাগে।'

'কীসের ভয় ?'

'জানি না কীসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস ?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর কী ? বাক্সের মতো ?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিত্রম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কী ?

'একটা যন্ত্র। হিসাবনিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা মা আছেন ?'

'জানি না তো।'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে ?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাক সেখানে কোনো খাবার নেই ?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন ?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কীই-বা করতে পারেন ! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে

টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোনো উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার ? আরে কী আশ্চর্য ! তিনি এসব কী ভাবছেন ? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনো মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালোই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি ? কত দাম এক ছটাক বাদামের ? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তার পরই মনে হল বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হল—তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিনভরতি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি ?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা...

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দুদিন আসবে। পনেরো শো টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শো। মেয়ের এত শখ ! তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শখ, কী ইচ্ছা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশো—তের শো। বাড়তি তেরো শো টাকা কোত্থেকে আসবে ? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশো টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কী ? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন ?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কী, কথা বলছ না কেন ?

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

'তোমার সঙ্গে বসে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম !'

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন—

তুমি বাস কি না তা আমি জানি না
ভালোবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বললে কেমন হয় ? কেউ এসে দেখে না ফেললে হল। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা ?'

'জ্বি, ভালো আছি। কে গান গাচ্ছে ?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা ?'

'হ্যাঁ, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে !'

'মনে থাকবে না কেন ? আমার সবার নামই মনে আছে—ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন-খারাপ। আপনার কী হয়েছে ?'

'কিছু হয়নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন-খারাপ কেন—আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জান ?

'জ্বি না।'

'আচ্ছা শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছ ? খিদে কমেছে ?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনি কী যে বলেন ! খাব কী করে ? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে ?

'খাবার নেই ?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দু'হাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা ?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন ? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে এসে বটগাছের মতো বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কী স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব ?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, আর কোনো সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি—প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি ভেবে পেলেন না এরকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন ?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সেজন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোনোকিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা সুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভালো ভালো সুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। সুয়েটার কিনতে তিনশো চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু সুয়েটার গায়ে দিয়েই তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন সুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই সুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমোলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তার পরেও মনে হল—মেয়েটা দেখবে জিনিসটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল, ভালোই হয়েছে। সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে' ভালো লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভালো হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের ওপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে ? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, বাবা, তুমি কী খুঁজছ ?

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না ? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কী বলছিস ! কোথায় ফেলেছে ?

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এরকম করছ কেন বাবা ?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বোঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ ?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, তোমার কী হয়েছে বাবা ?

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা-চিত্রলেখা।

'চিত্রলেখা কে ?'

'আমি জানি না কে ?'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন— চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায় ?

নিউটনের ভুল সূত্র

রূপেশ্বর নিউ মডেল হাইস্কুলের সায়েন্স টিচার হচ্ছেন অমর বাবু। অমর নাথ পাল, বি. এসসি. (অনার্স, গোল্ড মেডেল)।

খুব সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। স্কুলের স্যারদের আসল নামের বাইরে একটা নকল নাম থাকে। ছাত্র মহলে সেই নামেই তাঁরা পরিচিত হন। অমর বাবু স্কুলে 'ঘড়ি স্যার' নামে পরিচিত। তাঁর বুক পকেটে একটা গোল ঘড়ি আছে। ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ামাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন যদি তাঁর ভুরু কুঁচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমতো পড়েনি। দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

তাঁর ক্লাসে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। হাসা যাবে না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া চলবে না। খাতায় কাটাকুটি খেলা চলবে না। মনের ভুলেও যদি কেউ হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব চোখে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলবেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়াবার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। মহা অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অঙ্ক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ?

অপরাধী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার লাঞ্ছনা দেখে অন্য কেউ হয়তো ফিক করে হেসে ফেলল। অমর স্যার থমথমে গলায় বলবেন, ওকি, তুমি হাসছ কেন ? হাস্যকর কিছু কি বলেছি ? তুমি উঠে দাঁড়াও। অকারণে হাসার জন্য শাস্তি হিসেবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমর বাবু পকেট থেকে ঘড়ি বের করবেন। পাঁচ মিনিট তিনি এক দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইবেন। ছাত্ররা মূর্তির মতো বসে থাকবে।

অমর বাবুর বয়স পঞ্চাশ। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে—এই নিয়ে তাঁর সংসার। দুটি ছেলেই বড় হয়েছে—রূপেশ্বর বাজারে একজনের কাপড়ের ব্যবসা, অন্যজনের ফার্মেসি আছে। ভালো টাকা রোজগার করে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য মেয়েটির বিয়ের কথা হচ্ছে। এদের কারোর সঙ্গেই তাঁর বনে না। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনেক দিন হল বাড়িতেও থাকেন না। স্কুলের দোতলায় একটা খালি ঘরে বাস করেন। সেখানে বিছানা বালিশ আছে। একটা স্টোভ আছে। গভীর রাতে স্টোভে চা বানিয়ে খান।

রূপেশ্বর স্কুলের হেড স্যার তাঁকে বলেছিলেন, আপনার ঘর-সংসার থাকতে আপনি স্কুলে থাকেন, এটা কেমন কথা ?

অমর বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, রাত জেগে পড়াশোনা করি, একা থাকতেই ভালো লাগে। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার বনে না। তবে স্কুলে রাত্রি যাপন করে যদি আপনাদের অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে থাকি তাহলে আমাকে সরাসরি বলুন, আমি ভিন্ন ব্যবস্থা দেখি।

হেড স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে না—এই কথা হচ্ছে না। আপনার যেখানে ভালো লাগবে আপনি সেখানে থাকবেন।

তিনি অমর বাবুকে ঘাঁটালেন না। কারণ অমর বাবু অসম্ভব ভালো শিক্ষক। অঙ্কের ডুবো জাহাজ। ডুবোজাহাজ বলার অর্থ তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি অঙ্ক জানেন। ভাবুক ভাবুক ভাব আছে। ক্লাসে কোনো অঙ্ক তাকে করতে দিলে এমন ভাব করেন যেন অঙ্কটা মাথাতেই ঢুকছে না। তারপর পকেট থেকে গোল ঘড়ি বের করে ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, চোখ বন্ধ করে মুখে মুখে অঙ্কটা করে দেন। স্কুলের অনেক ছাত্রের ধারণা এই ঘড়িতে রহস্য আছে। ঘড়ি অঙ্ক করে দেয়। ব্যাপার তা নয়। তাঁর ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটায় গণ্ডগোল আছে। কখনো দ্রুত যায় কখনো আস্তে তবে গড়ে সমান থাকে। এইটাই তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন।

অমর বাবুকে ভালো মানুষ বলা যেতে পারে তবে তিনি অমিশুক, কথাবার্তা প্রায় বলেন না বললেই নয়। কারোর সাতে-পাঁচেও থাকেন না। টিচার্স কমন রুমে জানালার পাশের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকেন। ঘণ্টা পড়লে ক্লাসে রওনা হন। স্কুলের আরবি শিক্ষক মৌলানা ইদরিস আলী তাঁকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেন। বিশেষ লাভ হয় না। তিনি ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না। কেউ ঠাট্টা করলে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকেন।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল। আগামীকাল ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যেই একটা ছুটি-ছুটি ভাব চলে এসেছে। থার্ড পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। তিনি জানালার কাছের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তারপর অমর বাবু, আপনার সায়েন্সের কি খবর?

অমর বাবু কিছু বললেন না তবে চোখ তুলে তাকালেন। মনে মনে রসিকতার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞান নিয়ে এই লোকটি কঠিন রসিকতা করে যা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

ইদরিস সাহেব পানের কৌটা থেকে পান বের করতে করতে বললেন, অনেকদিন থেকে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। রোজই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

'জিজ্ঞেস করলেই পারেন।'

'ভরসা হয় না। আপনি তো আবার প্রশ্ন করলে রেগে যান।'

'বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা করলে রাগি। এমনিতে রাগি না—আপনার প্রশ্নটা কি?

ইদরিস সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, পৃথিবী যে ঘুরছে এই নিয়ে প্রশ্ন। পৃথিবী তো ঘুরছে, তাই না?

'জ্বি। পৃথিবীর দু'রকম গতি—নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, আবার সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।'

'বাঁই বাঁই করে ঘুরছে?'

'জ্বি?'

'তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মাথা কেন ঘুরে না? মাথা ঘোরা উচিত ছিল না? এমনিতে তো মাঠে দু'টো চক্কর দিলে মাথা ঘুরতে থাকে। ওকি, এরকম করে তাকাচ্ছেন কেন? রাগ করছেন না-কি?'

'বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা আমি পছন্দ করি না।'

'রসিকতা কি করলাম?'

অমর বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়বার আগেই ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই তাঁর নিয়ম। পৃথিবী কোনো কারণে হঠাৎ উল্টে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

আজ পড়ার বিষয়বস্তু হল আলো। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ ও বস্তু। কী অসাধারণ ব্যাপার! ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবশ্যি এসব বুঝবে না। তবে বড় হয়ে যখন পড়বে তখন চমৎকৃত হবে।

অমর বাবু ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আলোর গতিবেগ কত—কে বলতে পার? সাতজন ছেলে হাত তুলল। তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই হাত তুলবে। ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না? তা কি করে হয়? পৃথিবীতে মজার বিষয় তো একটাই। সায়েন্স।

'তুমি বল, আলোর গতিবেগ কত?'

'প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।'

'ভেরি গুড। এখন তুমি বল, আলোর গতি কি এর চেয়ে বেশি হতে পারে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'কেন পারে না।'

'এটাই স্যার নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম।'

'ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হবে না। হতে পারে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ। একটা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তাহলে তা মাটিতেই পড়বে, আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

'জ্বি-স্যার।'

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জনক কে?'

'নিউটন।'

'নামটা তুমি এইভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম। নাম উচ্চারণে কোনো শ্রদ্ধা নাই—বল মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।'

ছাত্রটা কাঁচুমাচু মুখে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

'একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে বাড়ি যাবে না, পাটিগণিতের বার নম্বর প্রশ্নমালার একুশ আর বাইশ এই দু'টি অঙ্ক করে তারপর যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

ছেলেটির মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

অমর বাবুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলি তাঁর মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান অবহেলা করছে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ছে। খুবই দুঃখের কথা।

সন্ধ্যার পর তিনি স্কুল লাইব্রেরিতে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করলেন। বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনকথা। মনের অশান্ত ভাব একটু কমল। তিনি স্কুলের দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর ছোট ছেলে রতন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বাবাকে স্কুলের ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভয় করে।

'রতন কিছু বলবি?

'মা বলছিলেন, অনেকদিন আপনি বাড়িতে যান না।'

'তাতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।'

'মা'র শরীরটা ভালো না। জ্বর।'

'ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা। আমাকে বলছিস কেন? আমি কি ডাক্তার?'

রতন মাথা নিচু করে চলে গেল। অমর বাবুর মনে হল আরেকটু ভালো ব্যবহার করলেই হত। এতটা কঠিন হবার প্রয়োজন ছিল না। কঠিন না হয়েই বা কি করবেন—গাধা ছেলে—মেট্রিকটা তিনবারেও পাস করতে পারেনি। জগতের আনন্দময় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কিছুই জানল না—আলো কি সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আলো কি জিজ্ঞেস করলে নির্ঘাৎ বলবে—এক ধরনের তরকারি, ভর্তা করেও খাওয়া যায়। ছিঃ ছিঃ।

ঘড়ি ধরে ঠিক ন'টায় তিনি রাতের খাবার শেষ করলেন। খাওয়া শেষ করতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসতে লাগল। মেঘ ডাকতে লাগল। অমর বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলেন। তাঁর ঘুমুতে যাবার সময় বাধা আছে রাত দশটা কুড়ি। এখনো অনেক বাকি আছে। এই সময়টা তিনি চুপচাপ বসে নানা বিষয় ভাবেন। ভাবতে ভালো লাগে। আগে পড়াশোনা করতেন। এখন চোখের কারণে হারিকেনের আলোয় বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। মাথায় যন্ত্রণা হয়। ঢাকায় গিয়ে ভালো ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখানো দরকার।

তিনি বিছানায় পা তুলে উঠে বসলেন। শীত-শীত লাগছিল, গায়ে একটা চাদর জড়াবেন কি-না যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি খানিকটা নড়ে উঠলেন। আর তখন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার হল—তিনি লক্ষ করলেন বিছানা ছেড়ে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। প্রায় হাত তিনেক উঠে গেলেন এবং সেখানেই স্থির হয়ে গেলেন। চোখের ভুল ? অবশ্যই চোখের ভুল। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র অনুযায়ী এটা হতে পারে না। হতে পারে না। হতে পারে না। নিতান্তই অসম্ভব। সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমনি অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

কিন্তু হয়েছে। তিনি খাট থেকে তিন হাত উপরে স্থির হয়ে আছেন। ঘরের সবকিছু আগের মতো আছে, শুধু তিনি শূন্যে ভাসছেন। অমর বাবু চোখ বন্ধ করে মনে মনে বললেন, হে ঈশ্বর, দয়া কর। দয়া কর। শরীরে কেমন যেন অনুভূতি হল। হয়তো এবার নিচে নেমেছেন। তিনি চোখ খুললেন, না আগের জায়গাতেই আছেন। এটা কি করে হয় ?

প্রচণ্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধপ করে নিচে পড়লেন। খানিকটা ব্যথাও পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিলেন। কি ঘটেছে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। ঘুমুতে চান। ঘুম ভেঙে যাবার পর হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল। শেষ রাতের দিকে তিনি একবার জেগে উঠে বাথরুমে যান। আজ তাও গেলেন না, এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। যখন ঘুম ভাঙল—তখন চারদিকে দিনের কড়া আলো, রোদ উঠে গেছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙল। রাতে কি ঘটেছিল তা মনে করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দুঃস্বপ্ন। বদহজম হয়েছিল। বদহজমের কারণে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরকম হয়। মানুষ খুব ক্লান্ত থাকলে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। দীর্ঘ স্বপ্নের

স্থায়িত্বকাল হয় খুব কম। হয়তো এক সেকেন্ডের একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এই হবে—এছাড়া আর কি ? স্বপ্ন, অবশ্যই স্বপ্ন। অমর বাবুর মন একটু হালকা হল।

পরের দিনের কথা। প্রথম পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। টিচার্স কমন রুমে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব যথারীতি তাঁর পাশে এসে বসলেন। পানের কৌটা বের করতে করতে বললেন, অমর বাবুর শরীর খারাপ না-কি ?

'জ্বি-না।'

'দেখে কেমন কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে অসুস্থ। গায়ে কি জ্বর আছে ?'

'জ্বি-না।'

'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল ?'

'হুঁ, তবে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন ?'

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, দেখলাম শূন্যে ভাসছি।

'আরে ভাই এটা কি দুঃস্বপ্ন ? শূন্যে ভাসা, আকাশে উড়ে যাওয়া—এইসব স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি অনেক উঁচু থেকে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেছি...খুব টেনশানের স্বপ্ন।'

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, ঠিক স্বপ্ন না, মনে হয় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি।

'কী বললেন ? জাগ্রত অবস্থায় ? জেগে জেগে দেখলেন আপনি শূন্যে ভাসছেন ?'

'জ্বি।'

'জাগ্রত অবস্থায় দেখলেন শূন্যে ভাসছেন ?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। ইদরিস সাহেব বললেন, রাত-দিন সায়েন্স সায়েন্স করে আপনার মাথা ইয়ে হয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। আপনি এক কাজ করুন—ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। আজ ক্লাস নেয়ার দরকার নেই। আমি হেড স্যারকে বলে আসি ?

'না না, আমার শরীর ঠিকই আছে।'

অমর বাবু যথারীতি ক্লাসে গেলেন। তাঁর পড়াবার কথা আলোর ধর্ম। তিনি শুরু করলেন মাধ্যাকর্ষণ।

"দুটি বস্তু আছে। একটির ভর m1 অন্যটির ভর, m2, তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে r তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে

$$\frac{m1m2}{r^2}$$

এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। স্যার আইজাক নিউটনের বিখ্যাত সূত্র। এর কোনো নড়চড় হবে না। হতে পারে না। বাবারা বুঝতে পারছ?"

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আজ পড়াবার কথা আলোর ধর্ম, প্রতিফলন, প্রতিসরণ; স্যার মাধ্যাকর্ষণ পড়াচ্ছেন কেন?

"বাবারা কি বলছি বুঝতে পারছ?"

ছাত্ররা জবাব দিল না।

"যদি কেউ বুঝতে না পার হাত তোল।"

কেউ হাত তুলল না। এক সময় ঘণ্টা পড়ে গেল। কোনোদিনও যা হয় না তাই হল। অমর বাবু ঘণ্টা পড়ার পরেও চুপচাপ বসে রইলেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন না বা উঠেও গেলেন না। চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে রইলেন। ছাত্রদের বিস্ময়ের কোনো সীমা রইল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অমর বাবু স্কুল লাইব্রেরিতে বসে আছেন। হাতে একটা বই। নাম—"মৌমাছিদের বিচিত্র জীবন।" পড়তে বড় ভালো লাগছে। কত ক্ষুদ্র প্রাণী অথচ কী অসম্ভব বুদ্ধি, কী অসম্ভব জ্ঞান। মৌচাকের ভেতরের তাপমাত্রা তারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করে রাখে। বাড়তেও দেয় না, কমতেও দেয় না। এই কাজটা তারা করে অতি দ্রুত পাখা কাঁপিয়ে। তাপমাত্রা এক হাজার ভাগের এক ভাগও বেশ-কম হয় না। মানুষের পক্ষেও যা বেশ কঠিন।

তিনি রাত আটটার সময় নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না। একটু জ্বর জ্বর লাগছে। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়ে গেছে। তিনি কিছু খাবেন না বলে ঠিক করলেন। না খাওয়াই ভালো হবে। অনেক সময় পেটের গণ্ডগোল থেকে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। তাতে আজেবাজে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। না খেলে তা হবে না। লেবুর সরবত বানিয়ে এক গ্লাস সরবত খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

কাল শীত-শীত লাগছিল, আজ আবার গরম লাগছে। জানালা খোলা, সামান্য বাতাস আসছে। সেই বাতাস মশারির ভেতর ঢুকছে না। তিনি মশারি খুলে ফেললেন। মশা কামড়াবে। কামড়াক। গরমের চেয়ে মশার কামড় খাওয়া ভালো।

মশারি খুলে ফেলে বিছানায় শোয়ামাত্র আবার গত রাতের মতো হল। তিনি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করল।

তিনি হাত দিয়ে সেই ছাদে ধাক্কা দেয়া মাত্র খানিকটা নিচে নেমে আবার উপরে উঠতে লাগলেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড? আবারো কি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন না।

আজকেরটা স্বপ্ন না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করছে না। পৃথিবীর ভর যদি হয় m1, তিনি যদি হন m2 এবং তাঁর ভর m2 যদি হয় শূন্য তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল হবে শূন্য। তাঁর ভর কি এখন শূন্য ? তিনি পাশ ফিরলেন, শরীরটা চমৎকারভাবে ঘুরে গেল। সাঁতার কাটার মতো করলেন। তেমন লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। এটাই স্বাভাবিক, বাতাস অতি হালকা। হালকা বাতাসে সাঁতার কাটা যাবে না।

ব্যাখ্যা কি ? এর ব্যাখ্যা কি ? একটা মানুষের ভর হঠাৎ শূন্য হয়ে যেতে পারে না। নিচে নামার উপায় কি ? মনে মনে আমি যদি চিন্তা করি নিচে নামব তাহলে কি নিচে নামতে পারব ? তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—নেমে যাচ্ছি, দ্রুত নেমে যাচ্ছি। লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন।

আচ্ছা তিনি যদি থুথু ফেলেন তাহলে থুথুটার কি হবে ? মাটিতে পড়ে যাবে না শূন্যে ঝুলতে থাকবে ? তিনি থুথু ফেললেন। খুব স্বাভাবিকভাবে থুথু মাটিতে পড়ল। গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে ছেড়ে দিলে সেটিও কি শূন্যে ভাসতে থাকবে ? না-কি নিচে পড়ে যাবে ? অতি সহজেই এই পরীক্ষা করা যায়। তিনি গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেললেন। ছেড়ে দিতেই দ্রুত তা নিচে নেমে গেল। তার মানে এই অদ্ভুত ব্যাপারটির সঙ্গে শুধু তিনিই জড়িত। তাঁর গায়ের পোশাকের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছেন মাধ্যাকর্ষণ বল যদি হয় F তাহলে

$$F=\frac{m1m2}{r^2}$$

m1 পৃথিবীর ভর। m2 তাঁর নিজের ভর। r হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব। m2 যদি O হয়, F হবে শূন্য। কিংবা r যদি হয় অসীম তাহলেও F হবে 'O'. কোনো বিচিত্র কারণে কি তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব অসীম হয়ে যাচ্ছে ? ভাবতে ভাবতে অমর বাবুর ঘুম পেয়ে গেল। এক সময় মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুম। তাঁর নাকও ডাকতে লাগল। ঘুমের মধ্যেই তিনি পাশ ফিরে শুলেন। কোনো রকম অসুবিধা হল না।

ঘুম ভাঙল ভোরবেলা।

অনেক বেলা হয়েছে। ঘরে রোদ ঢুকেছে। তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে। কখন মাটিতে নেমে এসেছেন তিনি জানেন না। গায়ে কোনো ব্যথা বোধ নেই, কাজেই ধপ করে পড়েন নি—আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন।

অমর বাবু স্বাভাবিক মানুষের মতো হাত-মুখ ধুলেন। মুড়ি গুড় দিয়ে সকালের নাশতা সারলেন। পুকুর থেকে গোসল শেষ করে যথাসময়ে স্কুলে গেলেন। আজ প্রথম পিরিয়ডেই তাঁর ক্লাস। তিনি ক্লাস না নিয়ে নিজের চেয়ারে

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হল ঘুমুচ্ছেন। আসলে ঘুমুচ্ছিলেন না, ভাবার চেষ্টা করছিলেন—তার জীবনে এসব কি ঘটছে?

ব্যাপারটা শুধু রাতেই ঘটছে। দিনে ঘটছে না। আচ্ছা তিনি যদি তাঁর নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে অন্য কোথাও থাকেন তাহলেও কি এই ব্যাপার ঘটবে? রাতে খোলা মাঠে যদি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে কি ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে চলে যাবেন? মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি বা সূর্যের কাছাকাছি? কিংবা আরো দূরে—এন্ড্রোমিড়া নক্ষত্রপুঞ্জ...সুদূর কোনো ছায়াপথে...?

'স্যার!'

অমর বাবু চমকে তাকালেন। দপ্তরি কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে।

'হেড স্যার, আপনাকে বুলায়।'

'হেড স্যার তাঁকে কেন ডেকে পাঠালেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইদরিস সাহেব কি হেড স্যারকে কিছু বলেছেন? বলতেও পারেন। পেট পাতলা মানুষ—বলাটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা ব্যাপারটা কি তিনি নিজে গুছিয়ে হেড স্যারকে বলবেন? বলা যেতে পারে। মানুষটা ভালো। শুরুতেই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন না।

হেড স্যার বললেন, কেমন আছেন অমর বাবু?

'জ্বি ভালো।'

'দেখে তো ভালো মনে হচ্ছে না। চা খাবেন?

'চা তো স্যার আমি খাই না।'

'এক-আধবার খেলে কিছু হয় না। খান কালিপদকে চা দিতে বলেছি।'

কালিপদ চা দিয়ে থার্ড পিরিয়ডের ঘন্টা দিতে গেল। হেড স্যার বললেন, শুনলাম গতকাল ক্লাস নেননি। আজও ফার্স্ট পিরিয়ড মিস গেছে।

'ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে স্যার।'

'ও আচ্ছা। আপনার তো সব ঘড়ি-ধরা। ঘুম ভাঙতে দেরি হল কেন?'

অমর বাবু চুপ করে রইলেন।

'পারিবারিক কোনো সমস্যা যাচ্ছে না-কি?'

'জ্বি-না।'

'আপনার মেয়ে গতকাল আমার কাছে এসেছিল। খুব কান্নাকাটি করল। আপনি বাড়িতে থাকেন না। এই নিয়ে বেচারির মনে খুব দুঃখ। দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আমি একা থাকতেই পছন্দ করি।'

'নিজের পছন্দকে সব সময় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। অন্যদের কথাও ভাবতে হয়। আমরা সামাজিক জীব...'

'স্যার উঠি ?'

'বসুন খানিকক্ষণ। গল্প করি—অমর বাবু আমি বলি কি যদি অসুবিধা না থাকে তা হলে, আপনার সমস্যাটা আমাকে বলুন। ইদরিস সাহেব স্বপ্নের কথা কি সব বলছিলেন—'

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, বিজ্ঞানের সূত্র মিলছে না স্যার। হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন সূত্র মিলছে না ?

'স্যার আইজাক নিউটনের সূত্র—মাধ্যাকর্ষণ সূত্র।'

'আপনার ধারণা সূত্রটা ভুল ?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় বললেন, আচ্ছা আপনি বরং বাড়িতে চলে যান। আপনাকে দশ দিনের ছুটি দিয়ে দিলাম। বিশ্রাম করুন। বিশ্রাম দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাঝে মাঝে মানুষের কথা এলোমেলো হয়ে যায়।

'স্যার, আমার মাথা ঠিকই আছে।'

'অবশ্যই ঠিক আছে। কথার কথা বললাম। যান, বাসায় চলে যান...বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে আছে।'

অমর বাবু বাড়ি গেলেন না। কমন রুমে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। হাতে একটা ফুল স্ক্যাপ কাগজ। সেই কাগজে নিউটনের সূত্র নতুনভাবে লিখলেন—

$$F=k.\frac{m1m2}{r^2}$$

এখানে k -এর মান ১ তবে মাঝে মাঝে k এর মান হচ্ছে শূন্য। যেমন তাঁর ক্ষেত্রে হচ্ছে। এক সময় কলম দিয়ে নির্মমভাবে সব কেটেও ফেললেন। নিউটন যে সূত্র দিয়ে গেছেন—তাঁর মতো সামান্য মানুষ সেই সূত্র পাল্টাতে পারেন না।

অমর বাবু টিফিন পিরিয়ডে অনেক সময় নিয়ে ইংরেজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির বাংলা অনুবাদ অনেকটা এই রকম—

জনাব,

আমি রূপেশ্বর হাইস্কুলের বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। সম্প্রতি আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজিয়া না পাইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে পারি। আপনার নিকট খুব অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা সত্য। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি—আপনাকে যাহা বলিলাম সবই সত্য। কোনো

রকম চেষ্টা ছাড়াই আমি শূন্যে উঠিতে পারি এবং ভাসমান অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাইতে পারি। জনাব, বিষয়টি কি বুঝিবার ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে এই অধম আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনি বলিলেই ঢাকায় আসিয়া আমি আপনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটি চাক্ষুষ দেখাইব। জনাব, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—বিষয়টি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করুন।

বিনীত

অমর দাস পাল

B. Sc. (Hon's)

দশ দিনের পুরোটাই তিনি নিজের ঘরে কাটালেন—বাড়িতে গেলেন না। তাঁকে নিতে তাঁর ছোট মেয়ে অতসী এসেছিল। তাকে ধমকে বিদেয় করলেন। এই মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো ছিল—তাকে এত করে বললেন সায়েন্স পড়তে, সে ভর্তি হল আর্টস-এ। কোনো মানে হয়? তাকে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র কি জিজ্ঞেস করলে সে হা করে তাকিয়ে থাকবে। কী দুঃখের কথা।

অতসীকে ধমকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তিনি বাইরে এসে বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেন?

সে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, তোমার শরীর খারাপ বাবা। তুমি বাড়িতে চল।

'শরীর খারাপ তোকে কে বলল?'

'সবাই বলাবলি করছে। তুমি না-কি কি সব স্বপ্ন-টপ্ন দেখ।'

'কোনো স্বপ্ন দেখি না। আমি ভালো আছি। নির্জনে একটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা শেষ হোক—তোদের সঙ্গে এসে কয়েকদিন থাকব।'

'কীসের পরীক্ষা?'

'কীসের পরীক্ষা বললে তো তুই বুঝবি না। হা করে তাকিয়ে থাকবি। এত করে বললাম সায়েন্স পড়তে।'

'অঙ্ক পারি না যে।'

'অঙ্ক না পারার কি আছে? যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—অঙ্ক তো এর বাইরে না। কাঁদিস না। বাসায় যা। আমি ভালো আছি।'

তিনি যে ভালো আছেন তা কিন্তু না।

রোজ রাতে একই ব্যাপার ঘটছে। খেয়ে-দেয়ে ঘুমুতে যান—মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেশেন শূন্যে ভাসছেন। তখন আতঙ্কে অস্থির হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। তিনি ইচ্ছে করলেই নিচে নামতে পারেন না।

নিচে কীভাবে নামেন তাও জানেন না। রাতটা তাঁর অঘুমেই কাটে। তিনি ঘুমুতে যান দিনে। এমন যদি হত তিনি দিনরাত সারাক্ষণই শূন্যে ভাসছেন তাহলেও একটা কথা ছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে, কোনো-এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তাঁর ভর শূন্য হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে রকম না। এমন কেউ এখানে নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে যাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান সাহেবও কিছু লিখছেন না। হয়তো ভেবেছেন পাগলের চিঠি। কে আর কষ্ট করে পাগলের চিঠির জবাব দেয় ?

ন'দিনের মাথায় অমর বাবু চিঠির জবাব পেলেন। অতি ভদ্র চিঠি। চেয়ারম্যান সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে লিখেছেন—

জনাব,

আপনার চিঠি কৌতূহল নিয়ে পড়লাম। আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। কাজেই বুঝতে পারছেন আপনি যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আপনি যদি আমার অফিসে এসে শূন্যে ভাসতে থাকেন তাহলেও আমি বিশ্বাস করব না। ভাবব এর পেছনে ম্যাজিকের কোনো কৌশল কাজ করছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন জাদুকররা শূন্যে ভাসার খেলা সব সময়ই দেখায়।

যাই হোক, আপনার চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে আপনার সমস্যাটি মানসিক। আপনি মনে মনে ভাবছেন—শূন্যে ভাসছেন। আসলে ভাসছেন না। সবচে' ভালো হয় যদি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। আমি আপনাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারছি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।

বিনীত

এস. আলি

M. Sc., Ph. D. F. R.S.

অমর বাবু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দিলেন না। কারণ তিনি জানেন বিষয়টা সত্যি। তিনি দু'একটা ছোটখাটো পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। যেমন স্কুল থেকে লাল রঙের চক নিয়ে এসেছিলেন। শূন্যে উঠে যাবার পর সেই লাল রঙের চক দিয়ে ছাদে বড় বড় করে লিখলেন,

হে পরম পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।

তোমার অপার রহস্যের খানিকটা আমাকে দেখতে দাও।

আমি অন্ধ, তুমি আমাকে পথ দেখাও। জ্ঞানের আলো আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত কর। পথ দেখাও পরম পিতা।

আরো অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, চক ফুরিয়ে যাওয়ায় লেখা হল না। এই লেখাটা ছাদে আছে। তিনি তাকালেই দেখতে পান। এমন যদি হত লেখাটা তিনি একা দেখতে পাচ্ছেন তাহলেও বোঝা যেত সমস্যাটা মনে। কিন্তু তা তো না। অন্যরাও লেখা পড়তে পারছে। গতকাল বিকেলে হেড মাস্টার সাহেব তাঁকে দেখতে এসে হঠাৎ করেই বিস্মিত গলায় বললেন, ছাদে এই সব কি লেখা?

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, প্রার্থনা সংগীত।

'প্রার্থনা সংগীত ছাদে লিখলেন কেন?'

'শুয়ে শুয়ে যাতে পড়তে পারি এই জন্যে।'

'লিখলেন কীভাবে? মই দিয়ে উঠেছিলেন না-কি?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেড মাস্টার সাহেব জবাবের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, আপনার ছুটি তো শেষ হয়ে গেল, আপনি কি ছুটি আরো বাড়াতে চান?

'জ্বি-না।'

'আপনি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নিন। শরীরটা এখনো সেরেছে বলে মনে হয় না। আপনাকে খুব দুর্বল লাগছে।'

'আমার শরীর যা আছে তাই থাকবে স্যার। আর ভালো হবে না।'

'এইসব কি ধরনের কথা? কোনো ডাক্তারকে কি দেখিয়েছেন?'

'জ্বি-না।'

'ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার না দেখালে কিভাবে হবে? বিধু বাবুকে দেখান। বিধু বাবু এল.এম. এফ. হলেও ভালো ডাক্তার। যে কোনো বড় ডাক্তারের কান টেনে নিতে পারে। বিধু বাবুকে দেখানোর কথা মনে থাকবে?'

''জ্বি স্যার, থাকবে।'

'না আপনার মনে থাকবে না। আমি বরং নিয়ে আসব। আমার ছোট মেয়েটার জ্বর। বিধু বাবুকে বাসায় আসতে বলেছি। এলে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন তাহলে উঠি অমর বাবু?'

'একটু বসুন স্যার।'

হেড মাস্টার সাহেব উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। তিনি খানিকটা বিস্মিত, কারণ অমর বাবু এক দৃষ্টিতে ছাদের লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি স্যার—যদি কিছু মনে না করেন।

'বলুন কি বলবেন। মনে করাকরির কি আছে?'

অমর বাবু প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আমি শূন্যে ভাসতে পারি।

'বুঝতে পারলাম না কি বলছেন।'

'আমি আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যেতে পারি।'

'ও আচ্ছা।'

হেড মাস্টার সাহেব "ও আচ্ছা" এমন ভঙ্গিতে বললেন, যেন শূন্যে ভেসে থাকবার ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। তবে তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব চিন্তিত বোধ করছেন।

'ছাদের লেখাগুলি শূন্যে ভাসতে ভাসতে লেখা।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনার কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

হেড মাস্টার সাহেব জবাব দিলেন না। অমর বাবু বললেন, আমি স্যার এই জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। ছেলেবেলায় হয়তো বলেছি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলিনি।

'আমি বিধু বাবুকে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, উনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা বলার দরকার নেই। জানাজানি হবে—ইয়ে মানে—লোকজন হাসাহাসি করতে পারে।

'আমি আপনাকেই খোলাখুলি বলেছি। আর কাউকে বলিনি।'

'ভালো করেছেন। খুব ভালো করেছেন।'

বিধু বাবু এসে খানিকক্ষণ গল্পটল্প করে যাবার সময় ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন। বললেন, দুঃস্বপ্ন না দেখার একটাই পথ। গভীর নিদ্রা। নিদ্রা পাতলা হলেই মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আমি ফোনোবারবিটন ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। শোবার আগে দু'টা করে খাবেন।

অমর বাবু দুটো ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। তবে ঘুমুতে যাবার আগে এক কাণ্ড করলেন—কালিপদকে বললেন, লম্বা একগাছি দড়ি নিয়ে তাঁকে খুব ভালো করে চৌকির সঙ্গে বেঁধে রাখতে।

কালিপদ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

অমর বাবু বিরক্ত মুখে বললেন, আমার মাথা খারাপ হয়নি। মাথা ঠিক আছে। তোমাকে যা করতে বলেছি কর। ব্যাপারটা কি পরে বুঝিয়ে বলব। লম্বা দেখে একগাছি দড়ি আন। শক্ত করে আমাকে চৌকির সঙ্গে বাঁধ।

কালিপদ তাই করল। তবে করল খুব অনিচ্ছার সঙ্গে।

অমর বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ট্যাবলেটের কারণে তাঁর গাঢ় নিদ্রা হল। ঘুম ভাঙল বেলা উঠার পর। তিনি দেখলেন—এখনো চৌকির সঙ্গে বাঁধা আছেন তবে চৌকি আগের জায়গায় নেই, ঘরের মাঝামাঝি চলে এসেছে। তার একটিই মানে—চৌকি নিয়েই তিনি শূন্যে ভেসেছেন। নামার সময় চৌকি আগের জায়গায় নামেনি। স্থান পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি সেদিনই বিছানাপত্র নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। অতসী তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, নাকে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?

অতসী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা? কী ভয়ংকর রোগা হয়ে গেছো।

'ভালো ঘুম হচ্ছে না, এই জন্যে শরীর খারাপ হয়েছে, এতে নাকে কাঁদার কি হল?'

'সবাই বলাবলি করছে তোমার না-কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কালিপদ নাকি রোজ রাতে দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখে।'

'কী যন্ত্রণা! একবারই বাঁধতে বলেছিলাম—এর মধ্যে এই গল্প ছড়িয়ে গেছে?'

'তোমার কী হয়েছে বাবা বল?'

'কিছু হয়নি।'

অমর বাবু ছ'দিন বাড়িতে থাকলেন। এই ছ'দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করলেন। শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা তিনি একা একা থাকার সময়ই ঘটে। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুমুলে ঘটে না। যে ক'রাত তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ঘুমিয়েছেন সে ক'রাত তিনি শূন্যে ভাসেননি। দু'রাত ছিলেন একা একা, দু'রাতেই শূন্যে উঠে গেছেন।

পূজার ছুটির পর স্কুল নিয়মিত শুরু হল। তিনি স্কুলে গেলেন না। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করলেন। আবার বাড়ি ছেড়ে বাস করতে শুরু করলেন স্কুলের ঘরে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না।

শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা রোজ ঘটতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘটতে লাগল। এখন বিছানায় শোয়ামাত্র শূন্যে উঠে যান। সারারাত সেখানেই

কাটে। শেষ রাতের দিকে নিচে নেমে আসেন। ব্যাপারটা ঘটে শুধু রাতে, দিনে ঘটে না। কখনো না। এবং অন্য কোনো ব্যক্তির সামনেও ঘটে না।

হেড স্যার এবং ইদরিস স্যার পর পর দু'রাত অমর বাবুর ঘরে জেগে বসে ছিলেন। দেখার জন্যে ব্যাপারটা কি। তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করেননি। লাভ হয়নি, কিছুই দেখেননি। হেড স্যার বললেন, ব্যাপারটা পুরোপুরি মানসিক।

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, আপনার কি ধারণা আমি পাগল হয়ে গেছি?

'না, তা না। পাগল হবেন কেন? তবু আমার ধারণা ব্যাপারটা আপনার মনে ঘটছে। একবার ঢাকায় চলুন না, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলি।'

'না।'

'ক্ষতি তো কিছু নেই। চলুন না।'

'আমি যেতে চাচ্ছি না স্যার, কারণ আমি জানি ব্যাপারটা সত্যি। সত্যি না হলে ছাদে এই লেখাগুলি আমি কীভাবে লিখলাম? দেখছেন তো ঘরে কোনো মই নেই।'

হেড স্যার চুপ করে রইলেন। অমর বাবু বললেন, আপনারা ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আবার শূন্যে উঠে ছাদে একটা লেখা লিখব।

হেড স্যার বললেন, তার দরকার নেই ; কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি আমাদের সামনে ব্যাপারটা পারছেন না কেন?

'আমি জানি না। জানলে বলতাম। জানার চেষ্টা করছি, দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবছি।'

'এত ভাবাভাবির দরকার নেই, আপনি আমার সঙ্গে ঢাকা চলুন। দু'দিনের ব্যাপার। যাব, ডাক্তার দেখাব, চলে আসব। আমার একটা অনুরোধ রাখুন। প্লিজ। আপনার হয়তো লাভ হবে না কিন্তু ক্ষতি তো কিছু হবে না।'

অমর বাবু ঢাকায় গেলেন।

একজন অতি বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে নানান প্রশ্ন করলেন। পরপর কয়েকদিন তাঁর কাছে যেতে হল। শেষ দিনে বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক বললেন,

'আপনার যা হয়েছে তা একটা রোগ। এর উৎপত্তি হচ্ছে অবসেসনে। বিজ্ঞানের প্রতি আপনার তীব্র অনুরাগ। সেই অনুরাগ রূপান্তরিত হয়েছে অবসেসনে। কেউ যখন বিজ্ঞানকে অবহেলা করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে তখন আপনি তীব্র আঘাত পান। এই আঘাত আপনি পেয়েছেন আপনার অতি নিকটজনের কাছ

থেকে। যেমন ধরুন আপনার কন্যা। সে বিজ্ঞান পড়েনি। আর্টস পড়ছে। এই তীব্র আঘাত আপনার মন গ্রহণ করতে পারেনি। আপনার অবচেতন মন ভাবতে শুরু করেছে—বিজ্ঞানের সূত্র অভ্রান্ত নয়। ভুল সূত্রও আছে। মাধ্যাকর্ষণ সূত্রও ভুল। এক সময় অবচেতন মনের ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে চেতন মনে। বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি না, বুঝতে পারছি না।'

'মোদ্দা কথা হল, আপনার রোগটা মনে।'

'না—আমি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করেছি। আমি যে শূন্যে উঠতে পারি এটা ভুল না। পরীক্ষিত সত্য।'

'মোটেও পরীক্ষিত সত্য নয়। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি দেখেনি যে আপনি শূন্যে ভাসছেন। দেখলেও কথা ছিল, কেউ কি দেখেছে ?'

'জ্বি-না।'

'আমি ট্রাংকুলাইজার জাতীয় কিছু ওষুধ দিচ্ছি। নিয়মিত খাবেন, ব্যায়াম করবেন। মন প্রফুল্ল রাখবেন। বিজ্ঞান নিয়ে কোনো পড়াশোনা করবেন না।'

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি ; কিন্তু আমি যা বলছি সত্য বলছি—।'

'ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে সত্যি। কিন্তু সবার কাছে নয়। আপনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলেও এই সিদ্ধান্তে আসবেন।'

অমর বাবু ভগ্নহৃদয়ে রূপেশ্বরে ফিরে এলেন। স্কুলে যোগ দিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই মাথা খারাপের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে একে একে দেখা দিতে লাগল। বিড়বিড় করে কথা বলেন, একা একা হাঁটেন। হাঁটার সময় দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে। নিতান্ত অপরিচিত কাউকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যান, শান্ত গলায় বলেন, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নিউটনের গতিসূত্র জানেন ?

পাগলের অনেক রকম চিকিৎসা করানো হল। কোনো লাভ হল না। বরং লক্ষণগুলি আরো প্রকট হওয়া শুরু করল। গভীর রাতে ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে উঁচু গলায় ডাকেন—জব্বার, ও জব্বার, ওঠে আয় তো বাবা। খুব দরকার।

জব্বার উঠে এলে তিনি করুণ গলায় বলেন, নিউটনের সূত্র মনে আছে ? ভালো করে পড়। এস.এস. সি তে আসবে। সাথে অঙ্ক থাকবে—'ভূমি থেকে দশ ফুট উচ্চতায় ১ গ্রাম ভর বিশিষ্ট একটি আপেল ছাড়িয়া দিলে তার গতিবেগ পাঁচ ফুট উচ্চতায় কত হইবে ? অঙ্কটা চট করে কর। মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কত মনে আছে তো ?'

আমাদের সমাজ পাগলদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করে। অমর বাবুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। বছর খানিক না ঘুরতেই দেখা গেল ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে বলছে—নিউটনের সূত্রটা কি যেন ? অমর বাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এদের তাড়া করছেন। তারা মজা পেয়ে খুব হাসছে। কারণ তারা জানে পাগলরা শিশুদের তাড়া করে ঠিকই—কখনো আক্রমণ করে না।

পৌষের শুরু। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। এই শীতেও খালি গায়ে শুধু একটা ধুতি কোমরে পেঁচিয়ে অমর বাবু রাস্তায় রাস্তায় হাঁটেন। নিউটনের সূত্র মনে আছে কি-না এই প্রশ্ন তিনি এখন আর কোনো মানুষকে করেন না। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গদের করেন। তারা প্রশ্নের উত্তর সঙ্গত কারণেই দেয় না। তিনি তখন ক্ষেপে যান।

রাত দশটার মতো বাজে। কনকনে শীত।

অমর বাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা কাঁঠাল গাছের নিচে। কাঁঠাল গাছের ডালে কয়েকটা বাদুড় ঝুলছে। তিনি বাদুড়গুলিকে নিউটনের সূত্র সম্পর্কে বলছেন। তখনই দেখা গেল—হারিকেন হাতে হেড স্যার আসছেন। কাঁঠাল গাছের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অমর বাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত গলায় বললেন, কে অমর ?

'জ্বি স্যার।'

'কী করছেন ?'

'বাদুড়গুলির সঙ্গে কথা বলছিলাম স্যার।'

'ও আচ্ছা।'

'এদের সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়। ওদের নিউটনের সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'এই শীতে বাইরে ঘুরছেন। বাসায় গিয়ে ঘুমান।'

'ঘুম আসে না স্যার।'

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ইয়ে অমর বাবু, এখনো কি আপনি শূন্যে ভাসেন ?

'জ্বি-না। ঢাকা থেকে আসার পর আর ভাসিনি। যদি আবার কখনো ভাসতে পারি—আপনাকে বলব। আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। ভাসতে ভাসতে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।'

'দূরে কোথায় ?'

'মহাশূন্যে—অসীম দূরত্বে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব ছাড়িয়ে...'

'ও আচ্ছা।'

'যাবার আগে আমি আপনাকে খবর দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

শীত কেটে গিয়ে বর্ষা এসে গেল। অমর বাবু লোকালয় প্রায় ত্যাগ করলেন। বেশির ভাগ সময় বনে-জঙ্গলে থাকেন। রূপেশ্বরের পাশের গ্রাম হলদিয়ায় ঘন বন আছে। এখন ঐ বনেই তাঁর আস্তানা। তাঁর মেয়ে অতসী প্রায়ই তাঁকে খুঁজতে আসে। পায় না। মেয়েটা বনে বনে ঘুরে এবং কাঁদে। তিনি চার-পাঁচদিন পর পর একবার বের হয়ে আসেন। তাঁকে দেখে আগের অমর বাবু বলে চেনার কোনো উপায় নেই। যেন মানুষ না—প্রেত বিশেষ। মাথাভর্তি বিরাট চুল, বড় বড় দাড়ি। হাতের নখগুলি বড় হতে হতে পাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে। স্বভাব-চরিত্র হয়েছে ভয়ংকর। মানুষ দেখলে কামড়াতে আসেন। ইট-পাথর ছুড়েন। একবার স্থানীয় পোস্ট মাস্টারকে গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিলেন। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। অতসীর বিয়ে হয়ে গেছে, সেও এখন আর বাবার খোঁজে আসে না।

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। কার্তিক মাস। অল্প অল্প শীত পড়ছে। এগারোটার মতো বাজে। হেড স্যার খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, হঠাৎ শুনলেন উঠান থেকে অমর বাবু ডাকছেন—স্যার, স্যার—স্যার জেগে আছেন ?

'কে ?'

'স্যার আমি অমর। একটু বাইরে আসবেন ?'

হেড স্যার অবাক হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, খবরদার, তুমি বেরুতে পারবে না। পাগল মানুষ—কি না কি করে বসে। ঘুমাও।

অমর বাবু আবার কাতর গলায় বললেন, একটু বাইরে আসুন স্যার—খুব দরকার। খুব বেশি দরকার।

হেড স্যার ভয়ে ভয়ে বাইরে এলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির সামনের আমগাছের সমান উচ্চতায় অমর বাবু ভাসছেন। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্য। একটা মানুষ অবলীলায় শূন্যে ভাসছে। তার জন্যে পাখিদের মতো তাঁকে ডানা ঝাপ্টাতে হচ্ছে না।

'স্যার দেখুন আমি ভাসছি।'

হেড স্যার জবাব দিতে পারছেন না। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল চোখের ভুল। এখন তা মনে হচ্ছে না। ফকফকা চাঁদের আলো। দিনের আলোর মতো সব দেখা যাচ্ছে। তিনি পরিষ্কার দেখছেন—অমর বাবু শূন্যে ভাসছেন। এই তো ভাসতে ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এলেন। সাঁতার কাটার মতো অবস্থায় মানুষটা শুয়ে আছে। কী আশ্চর্য।

'স্যার দেখতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ হঠাৎ করে শূন্যে উঠে গেলাম। বন থেকে বের হয়ে রূপেশ্বরের দিকে আসছি হঠাৎ শরীরটা হালকা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দশ-বারো ফুট উঠে গেলাম। প্রথমেই ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি। ভাসতে ভাসতে আসলাম।'

'আর কেউ দেখেনি?'

'না। কয়েকটা কুকুর দেখেছে। ওরা ভয় পেয়ে খুব চিৎকার করছিল। এরকম দেখে তো অভ্যাস নেই। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে স্যার?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'আমি ঠিক করেছি—ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাব।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ ব্যথা করত। এখন ব্যথাও নেই। আগে কাউকে চিনতে পারতাম না। এখন পারছি।'

'শুনে ভালো লাগছে অমর বাবু।'

'অন্য একটা কারণেও মনে খুব শান্তি পাচ্ছি। কারণটা বলি—মহাশূন্যে ভাসার রহস্যটাও ধরতে পেরেছি।'

হেড মাস্টার সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, রহস্যটা কী?

'রহস্যটা খুব সাধারণ। এতদিন কেন ধরতে পারিনি কে জানে। তবে স্যার আপনাকে রহস্যটা বলব না। বললে আপনি শিখে যাবেন। তখন দেখা যাবে সবাই শূন্যে ভাসছে। এটা ঠিক না। প্রকৃতি তা চায় না। স্যার যাই?'

অমর বাবু উপরে উঠতে লাগলেন। অনেক অনেক উঁচুতে। এক সময় তাঁকে কালো বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল।

হেড স্যারের স্ত্রী হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে ভীত গলায় বললেন, কি ব্যাপার? পাগলটা কোথায়?

'চলে গেছে।'

'তুমি বাইরে কেন? ভেতরে এসে ঘুমাও।'

তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

অমর বাবুকে এর পর আর কেউ এই অঞ্চলে দেখেনি। হেড স্যার সেই রাত্রির কথা কাউকেই বলেননি। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই পাগল ভাববে। আর একবার পাগল ভাবতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত পাগল হতেই হয়—এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

যন্ত্র

তিনি নরম গলায় বললেন, ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো ?

সেলসম্যান জবাব দিল না, বিরক্ত চোখে তাকাল। তিনি আবার বললেন, ভাই এই যন্ত্রটার কোন সাইড এফেক্ট নেই তো ? সেলসম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে গেল, নিচের ঠোঁট টানটান হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল, সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন ?

মানে নেশা ধরে যায় কি না। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাতদিন যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকে...।

আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।

তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। এতগুলি টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনবেন অথচ লোকটা তার প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তিনি...

আপনি কি যন্ত্রটা কিনবেন না দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খসখস করে টাকার অংক বসালেন। হাতের লেখাটা ভাল হল না। কারণ এত বড় অংকের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। মাত্র আটশ' গ্রাম ওজনের কালো চৌকোণা একটা বক্স। অথচ কী অসম্ভব দাম ! টাকার অংক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেলসম্যান বলল, আপনার কোন ক্রেডিট কার্ড নেই ?

জ্বি না।

আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট চেক করব। কম্পিউটারটা ট্রাবল দিচ্ছে—একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে পাশের রুমে বসতে পারেন।

আমি বরং এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়।

সেলসম্যান জবাব দিল না। তাঁর কাছে মনে হল সেলসম্যানের মুখের বিরক্ত ভাব একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত—তিনি তো শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা কিনেছেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঞ্চিত অর্থের সবটাই চলে গেছে। এর পরেও কি লোকটা তাঁর সঙ্গে সহজভাবে দু' একটা কথা বলবে না ? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার বললেন, ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো ?

এবার জবাব পাওয়া গেল। সেলসম্যান রোবটদের মত ধাতব গলায় বলল, না নেই।

নেশা হয় না ?

না, হয় না। তবে আপনি ইচ্ছা করে যদি নেশা ধরান তাহলে তো করার কিছু নেই। যন্ত্রটির সঙ্গে ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল আছে। ম্যানুয়েল মেনে যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করবেন না। সপ্তাহে অন্তত একদিন যন্ত্রটায় হাত দেবেন না।

তিনি এবার আনন্দের একটা নিশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, যন্ত্রটা নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় তো। তাই...

আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা। পি থার্টি টু হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই বিষয়ে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে ?

জ্বি না।

তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

ভয় পাচ্ছি না তো।

পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আরো আধ ঘণ্টার মতো লাগবে।

জ্বি আচ্ছা।

একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন, এই শতাব্দীর সবচে' বড় আবিষ্কার পি থার্টি টু। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যেমন টেলিভিশন। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত ?

জ্বি একমত।

তিনি মোটেই একমত না। বিংশ শতাব্দীর টেলিভিশন ছাড়াও আরো অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। এই শতাব্দীতে দশটি বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচে' বড় আবিষ্কার হচ্ছে "ডেথ হরমোন"। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান প্রমাণ করেছেন, একটা নির্দিষ্ট বয়সে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে "ডেথ হরমোন" শরীরে চলে আসে। শরীর তখন মৃত্যুর জন্যে নিজেকে তৈরি করে। শুরু হয় বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যে হারে জীবকোষ মরে যায় সেই হারে তৈরি হয় না। জরা শরীরকে গ্রাস করে। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান দেখালেন, সালফার এবং অক্সিজেন ঘটিত একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ যৌগ অণু এই কাজটি করে। তিনি যৌগটি শরীর থেকে বের করে দেবার প্রক্রিয়াও বের করলেন। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে ডেথ হরমোন বের করে দিয়েছে। জরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি 'কফি ডিসপেনসিং' রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসিমুখে বলেছে, আশা করি এক পেয়ালা উষ্ণ কফি আপনার হৃদয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।

তিনি রোবটের কথার কোন জবাব দিলেন না। এদের তৈরিই করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্য। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসাবে নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হয়। তিনি সামনের গোল টেবিলের উপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাজিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উল্টিয়ে তাঁর মুখ বিকৃত হল। ভুল ম্যাগাজিন বেছে নিয়েছেন—'জেনো-কোড নিউজ'। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে রগরগে সব খবরে ভর্তি। এইসব খবরের কোনটির প্রতিই তাঁর কোন আগ্রহ নেই। প্রাণীর জিনের সঙ্গে উদ্ভিদের জিন লাগিয়ে কত সব অদ্ভুত জিনিস তৈরি হচ্ছে তার রগরগে বর্ণনা—পড়তে তাঁর ভাল লাগে না। টমেটো জিনের সঙ্গে গোলাপ গাছের জিন লাগানো হচ্ছে—সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে ? মানুষ এবং উদ্ভিদের এক সংকর প্রজাতি তৈরি হবে ? আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে ? মানব-উদ্ভিদ ?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মিলনে তৈরি হল নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না, আবার শিম্পাঞ্জিও না। গাধা ও ঘোড়ার সংকর যেমন খচ্চর এ-ও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিল গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন—নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর সাজা দেয়া হয়েছিল। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর সবচে' সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব রকম সুযোগ এবং অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষুধামুক্ত করেছেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের কারণে আজকের পৃথিবীতে কোন খাদ্যাভাব নেই। সমুদ্রের শৈবালকে তাঁরা স্বাদু স্টার্চে রূপান্তরিত করেছেন। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের জিনের সংযোগে তৈরি করেছেন সুস্বাদু প্রোটিনসর্বস্ব উদ্ভিদ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আশাকরি এই যন্ত্রের কল্যাণে আপনার সময় আনন্দময় হবে।

শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি কালো বাক্সটি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশি হয়নি, তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে—তার যে কোন একটিতে উঠে গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে। আবহাওয়া চমৎকার, তবে একটু শীত ভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনার নৈশভ্রমণ আনন্দময় হোক। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই সব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বলল, আপনি কত দূর যাবেন?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, কাছেই।

আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

না।

কেন বলুন তো?

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এই সব রোবটের সঙ্গে কথা বলা মানেই হচ্ছে নিজেকে ছোট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বলল, আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না?

জানি না।

আমি লক্ষ করেছি বেশিরভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকে যেন তার সমস্যার অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি?

হ্যাঁ।

আপনারা কী নিয়ে এত চিন্তা করেন?

তিনি জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনশিয়াল এলাকায় ঢুকেছে। রাস্তার দু'পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। কত লক্ষ মানুষই না এইসব বাড়িতে বাস করে। তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনশিয়াল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়। ফাঁকা রাস্তা—ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে চালানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লালবাতিতে গাড়ি থামল। রোবট বলল, এই শতকে আপনারা—মানুষেরা এত অসুখী হয়ে গেলেন কীভাবে?

জানি না।

আপনাদের তো অসুখী হবার কোন কারণ নেই। মানুষ ক্ষুধা জয় করেছে, রোগ-ব্যাধি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয়। তবু এত দুঃখ কেন?

তিনি বললেন, সামনের ব্লকে আমি নামব।

অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসায় শক্তির সমস্যা মিটেছে, বাসস্থানের সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না?

হুঁ।

আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না। আপনার স্ত্রী আছে।

হুঁ।

তারপরেও পি থার্টি টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেল তাই না?

হুঁ।

আপনি কি হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?

আমি এইখানে নামব।

স্টপেজের মাঝখানে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই। রোবট ড্রাইভার নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, আপনার পি থার্টি টু আনন্দময় হোক।

তিনি রোবটদের মতো গলায় বললেন, ধন্যবাদ।

তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ডিউটি। কাজেই তিনি এ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন—খাবার তৈরি করা আছে। খেয়ে নিও।

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার। খাবারের সঙ্গে চমৎকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের মাঝামাঝি তৈরি করা হয়েছে—ঝাঁঝালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ করে দেয়—বড় ভাল লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন, আনন্দের কত উপকরণ চারদিকে ছড়ানো—ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরাম্া, যা চালু করামাত্র অনুষ্ঠানের পাত্র-পাত্রীরা মনে হয় সশরীরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে।

মস্তিষ্কের আনন্দকেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সংগীত শ্রবণের আনন্দ থেকে শুরু করে নারীসঙ্গের আনন্দের মত তীব্র আনন্দ

মস্তিষ্ক উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোত্থেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তাঁরা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে পিঠ চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখেও এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে না। মানুষ ঝুঁকেছে পি থার্টি টু-এর দিকে। কে জানে এক সময় হয়ত এই যন্ত্রটিও তার ভাল লাগবে না।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে পি থার্টি টু কেনার খবর দেবার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের মতো ভাবলেশহীন গলায় বললেন, আমি আজ একটি পি থার্টি টু কিনেছি।

সে কি ! সত্যি ?

হ্যাঁ।

বিরাট ভুল করেছ।

কেন ?

আমাদের মত দম্পতিদের সরকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না ?

জানতাম।

তাহলে ?

কবে না কবে দেয়—আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছ ?

না। যন্ত্রটা কি ব্যবহার করেছ ?

এখনো করিনি। এখন করব।

আচ্ছা। তোমার যন্ত্র তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মত দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।

তোমাকে ধন্যবাদ।

তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। কাগজের মোড়ক খুলে কালো বক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, "আমাদের মত দম্পতি"—এই বাক্যটি আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলেও তাঁর স্ত্রী এই বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েকবার বলেন। হয়ত এই নিয়ে তাঁর মনে গোপন ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ থাকার কোনই কারণ নেই। তাঁদের মত দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যাঁরা সন্তান জন্মাবার অধিকার পাননি। মানব জাতির স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।

মানুষ মৃত্যুকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরো কমাতে হবে। তাঁদের মত দম্পতির সংখ্যা আরো বাড়বে।

তিনি যন্ত্র হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন। ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল মন দিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুব সহজ—যন্ত্র থেকে বের হওয়া ঋণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি লাগাতে হয়। ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বা' কপালে। স্ট্র্যান্ড বাই বোতাম টিপে কারেন্ট ফ্লো এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্রো এ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারেন্ট এ্যাডজাস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো জ্বলে উঠবে। তখন চোখ বন্ধ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।

পি থার্টি টু যন্ত্রটি বেশ কিছু স্থাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সঞ্চারিত করা হয়।

তিনি যন্ত্র চালু করে বসে আছেন। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে—অল্প পিপাসাও বোধ হচ্ছে। হঠাৎ সেই পিপাসা হাজারো গুণে বেড়ে গেল। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে—এই তৃষ্ণার কারণেই বোধ হয় তাঁর ঘ্রাণশক্তি লক্ষগুণ বেড়ে গেল। তিনি এখন সব কিছুর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মাটির ঘ্রাণ, ফুলের ঘ্রাণ, গাছের শেকড়ের ঘ্রাণ। তাঁর জগতটি ঘ্রাণময় হয়ে গেছে। এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের সাতানব্বুই তলার সাজানো-গোছানো কোন এ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন না। তিনি বাস করেন বনে। গহীন বনে। তিনি কে? তিনি কি...

বোঝা যাচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটি চিতাবাঘ। বাঘ নয় বাঘিনী। তাঁর তিনটি শিশু শাবক আছে। গত দু'দিন এদের তিনি আগলে রেখেছেন। আজ প্রবল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন। পানি কোথায় আছে তা তিনি জানেন—পানিরও গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মাটির গন্ধের মতই তীব্র। পানি আছে, কাছেই আছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারেন কিন্তু যেতে পারছেন না। কাছেই কোথায় যেন পুরুষ বাঘটা ঘুরঘুর করছে। এর মতলব ভাল না। বাচ্চাদের হয়ত মেরে ফেলবে। এদের একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

আকাশে বিরাট চাঁদ। তার আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। কনকন করে বইছে শীতের বাতাস। বাতাসে কী অদ্ভুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে। যে

সব পাতা নড়ছে তার থেকে এক ধরনের গন্ধ আসছে। আবার স্থির পাতা থেকে অন্য ধরনের গন্ধ। কী বিচিত্র, কী বিচিত্র চারপাশের জগত। কোন্ স্তরেই না পৌঁছে গেছে অনুভূতির তীব্রতা !

তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে—অথচ কী আনন্দই না তিনি রক্তের ভেতর অনুভব করছেন। তিনি জলের সন্ধানে এগুচ্ছেন অথচ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর শাবকদের দিকে।

তারও অনেক পরের কথা।

ডেথ হরমোন রক্তের ভেতরই ভেঙে ফেলার অতি সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে। মানুষ জরা রোধ করেছে। মানুষকে এখন অমর বলা যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর আর মৃত্যু হবে না। জীবাণু এবং ভাইরাসঘটিত কোন অসুখও পৃথিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি তাহলে অমর বলা যাবে ? হয়ত বা।

অমর মানুষরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাঁদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্যে আছে রোবট শ্রেণী। চিন্তা-ভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশি আর কিছু তো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশবিশেষ যাপন করতে তাঁদের বড় ভাল লাগে। এই তাঁদের একমাত্র আনন্দ।

নিমধ্যমা

মতিনউদ্দিন সাহেবকে কেন জানি কেউ পছন্দ করে না। অফিসের লোকজন করে না, বাড়ির লোকজনও না। এর কী কারণ মতিন সাহেব জানেন না। প্রায়ই তাঁর ইচ্ছা করে পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করেন—'আচ্ছা আপনি আমাকে পছন্দ করেন না কেন?' জিজ্ঞেস করা হয় না। তাঁর লজ্জা লাগে। মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন—থাক, কী হবে জিজ্ঞেস করে?

তাঁর স্ত্রীকে অবশ্যি একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। নাশতা খেতে খেতে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা, তুমি আমাকে পছন্দ করো না কেন?

মতিন সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুমি কী বললে?

'না—কিছু বলিনি।'

'পছন্দের কথা কী যেন বললে?'

'মানে জানতে চাচ্ছিলাম—তুমি আমাকে পছন্দ কর কি না।'

'তোমার কি ভীমরতি হয়ে গেল না কি, আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছ।'

'আর করব না।'

তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তা মতিন সাহেব জানেন। তিনি থাকেন একা একটা ঘরে। সেই ঘরটাও বাড়ির সবচে' খারাপ ঘর। আলো-বাতাস ঢোকে না বললেই হয়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে কোন মেহমান চলে এলে এই ঘরও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন কোথায় শোবেন তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলের ঘরটা সুন্দর। খাটটাও বড়। অনায়াসে দু'জন শোয়া যায়। কিন্তু শোয়া সম্ভব না—বড় ছেলে বিরক্ত হয়। ছোট দুই মেয়ে এক ঘরে শোয়, সেখানে জায়গা নেই। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বসার ঘরের সোফায় ঘুমুতে যান। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গত পূজার ছুটিতে বাসার সবাই ঠিক করল দল বেঁধে কক্সবাজার যাবে। তাঁকে অবশ্যি কেউ বলল না। তিনি খাবার টেবিলে আলোচনা শুনলেন। সব খরচ দিচ্ছে তাঁর বড় ছেলে। ব্যবসায় তার ভাল লাভ হয়েছে। কিছু টাকা খরচ করতে চায়। সে হাসি মুখে বলল, 'এখান থেকে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে, মাইক্রবাসে যাব। নিজেদের কনট্রোলে একটা গাড়ি থাকার খুব সুবিধা। ধরো, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যেতে ইচ্ছা করল, হুট করে চলে গেলাম।'

মেজো মেয়ে নীতু বলল, কিন্তু ভাইয়া ট্রেন জার্নির আলাদা মজা। একটা পুরা কামরা রিজার্ভ করে যদি যাই...গাড়ি তুমি কক্সবাজরে ভাড়া করো। ওখানে ভাড়া পাওয়া যায় না?

ছোট মেয়ে বলল, আমার প্লেনে যেতে ইচ্ছা করছে ভাইয়া। ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে প্লেনে কক্সবাজার।

এই সব আলোচনা শুনতে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছিল। অবশ্যি তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন না। কারণ তিনি জানেন কিছু বলতে গেলেই রাহেলা বলবেন, চুপ করো তো, তুমি জানো কী ?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না ঠিকই কিন্তু জোগাড়-যন্ত্র করে রাখলেন। কাপড়-চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রাখলেন। অফিসে বড় সাহেবকে বললেন, আমার কয়েকদিন ছুটি লাগবে স্যার। পরিবারের সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি।

বড় সাহেব বললেন, হঠাৎ কক্সবাজার। ব্যাপার কী ?

'বাচ্চারা ধরল—বেড়াতে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলো। ওদের আনন্দের জন্য যাওয়া। অবশ্যি আমি নিজেও কোনদিন সমুদ্র দেখিনি। ভাবলাম দেখেই আসি...'

বলতে বলতে আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। বড় সাহেব সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

কক্সবাজার রওনা হবার আগের দিন রাহেলা এসে বললেন, আমরা সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি জানো তো ? তোমার তো আবার কোন হুঁশ থাকে না। ঘরে কী আলোচনা হয় তাও জানো না। কাল রওনা হচ্ছি। মাইক্রোবাসে যাচ্ছি। বাস চলে আসবে ভোর ছ'টায়।

মতিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, জানি। আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। অফিস থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়েছি। আর্নড লিভ।

রাহেলা অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে ছুটি নিতে কে বলল ? আগ বাড়িয়ে যে এক একটা কাজ করো রাগে গা জ্বলে যায়। আমি কি বাসা খালি রেখে যাব না কি ? রোজ চুরি হচ্ছে। তুমি থাকবে এখানে।

'আচ্ছা।'

'ফ্রিজে এক সপ্তাহের মত গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। চারটা চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। পারবে না ?'

'পারব।'

'শোবার আগে সব ঘর বন্ধ হয়েছে কি না ভাল করে দেখবে। তোমার উপর কোন দায়িত্ব দিয়েও তো নিশ্চিন্ত হতে পারি না।'

এ জাতীয় ব্যাপার যে শুধু বাড়িতে ঘটে তাই না। অফিসেও নিয়মিত ঘটে। তাঁদের অফিসের এক সহকর্মী কোন-এক সিনেমায় ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়িকার খুব জ্বর। ডাক্তার জ্বর দেখে বললেন—'হু, জ্বর একশ তিন।

পেসেন্টকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে।' নায়িকা তখন কাতর গলায় বলে, আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তার। মৃত্যুই আমার জন্যে ভাল। পৃথিবীর এ আলো হাওয়া, এ আনন্দ আমি সহ্য করতে পারছি না। ডাক্তার তখন বলেন, ছিঃ এমন কথা বলবেন না।

এইটুকুই পার্ট। তবু তো সিনেমার পার্ট। পরিচিত একজন সিনেমায় পার্ট করছে এটা দেখায়ও আনন্দ। যে পার্ট করছে সে বলল, বৃহস্পতিবার সে সবার জন্য পাস নিয়ে আসবে। অফিসের শেষে সবাই তার বাসায় চা-টা খেয়ে সন্ধ্যাবেলা এক সঙ্গে ছবি দেখতে যাবে।

মতিন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতিবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছবিঘরে অনেকদিন ছবি দেখা হয় না। ছবি দেখা হবে। তাছাড়া দলবল নিয়ে ছবি দেখার আনন্দও আছে। উত্তেজনায় বৃহস্পতিবারে তিনি অফিসের কাজও ঠিকমত করতে পারলেন না। ছুটির পর সবাই এক সঙ্গে বেরুচ্ছেন, সিনেমার ডাক্তার অভিনেতা মতিন সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। তেরটা পাস এনেছি, এখন দেখি মানুষ চৌদ্দজন। কী করা যায় বলুন তো?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর খুব যেতে ইচ্ছা করছে। নিজ থেকে বলতে ইচ্ছা করছে না, 'আপনারা যান। আমি থাকি।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনি বরং থাকুন। আপনাকে পরে পাস এনে দেব। আর ছবিও খুব আজেবাজে। পুরা ছবি দেখলে হলের মধ্যে বমি করে দেবেন। না দেখাই ভাল।'

মতিন সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'মনে কিছু করলেন না তো আবার?'

'জ্বি না।'

'বাসা পর্যন্ত চলুন। এক সঙ্গে চা খাই। অসুবিধা নেই তো?'

'জ্বি না।'

শেষ পর্যন্ত বাসায় যাওয়া হল না। একটা জিপ জোগাড় হয়েছিল, সেই জিপে সবার জায়গা হল মতিন সাহেবের হল না।

'মতিন সাহেব, আপনি রবং একটা রিকশা নিয়ে চলে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া। অসুবিধা হবে না তো?'

'জ্বি না।'

ঠিকানা নিয়ে তিনি রিকশা করে মালিবাগে নামলেন। বাসা খুঁজে পেলেন না কারণ ঠিকানায় সবই দেয়া আছে বাসার নাম্বার দেয়া নেই। মতিন সাহেবের একবার ক্ষীণ সন্দেহ হল—ইচ্ছা করেই বাসার নাম্বার দেয়নি। পর মুহূর্তেই সেই

সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তা কী করে হয়। সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাড়ি খুঁজে বের করবার। পারলেন না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরির পর তিনি রিটায়ার কররেন। জুনিয়র অফিসার হিসেবে ঢুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সিনিয়র অফিসার হিসাবে। ত্রিশ বছরে একটিমাত্র প্রমোশন। বর্তমান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন তাঁকে স্যার ডাকতে হয়। মতিন সাহেবের লজ্জা লজ্জা করে। উপায় কী?

রিটায়ার করা উপলক্ষে অফিসে বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অফিস শেষে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সভা হবে। মতিন সাহেব কী বলবেন সব ভেবে রেখেছেন। ভেবে রাখা কথা সব বলতে পারবেন কি না তা জানেন না। হয়ত চোখে পানি এসে যাবে, গলা ধরে যাবে। বিকাল পাঁচটা বাজতেই তিনি হল-ঘরে বসে রইলেন। আশ্চর্য তিনি একা—একটি লোকও নেই। ছটা পর্যন্ত তিনি একা একাই বসে রইলেন। লক্ষ করলেন অফিসের লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। এদিকে কেউ উঁকিও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় জি.এম. অফিস থেকে বেরুবার সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে মতিন সাহেব আপনি? বসে আছেন কেন?

মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, বিদায় সভা হবে এই জন্যে...

'আজ তো হবে না। আজ আমি ব্যস্ত, এই জন্যে ক্যানসেল করে দিয়েছি। আপনি নোটিশ পাননি?'

'জ্বি না।'

'আরে বলেন কী? আচ্ছা বাড়ি চলে যান। পরে এক সময় ফেয়ার ওয়েল হবে। আপনাকে খবর দেয়া হবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

চাকরি জীবন শেষ হয়ে অবসর জীবন শুরু এই ভেবে মতিন সাহেব এক কেজি সন্দেশ কিনে ফেললেন। হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়ি খালি। জনপ্রাণী নেই—আসবাবপত্র নেই। সব ধুধু করছে। রোগা একটা ছেলে বালতি ভর্তি পানি দিয়ে মেঝে ধুচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, ওরা কোথায়?

ছেলেটি বলল, কারা?

'এই বাড়িতে যারা থাকত?'

'বাড়ি ছাইড়া নতুন বাড়িতে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'আমি ক্যামনে কই ?'

বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন—তারা পল্লবীতে বাড়ি নিয়েছে। বড় বাড়ি। সে বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

অনেক যন্ত্রণা করে রাত দশটায় পল্লবীর বাড়িতে তিনি উপস্থিত। রাহেলা খড়খড়ে গলায় বললেন, এতক্ষণে তোমার সময় হল ? আজ বাড়ি বদল হচ্ছে, কোথায় সকাল সকাল ফিরবে। সাহায্য করবে। আর তুমি কি না উদয় হয়েছ মাঝরাতে।

'বাড়ি বদল করছ জানতাম না। তুমি আমাকে কিছু বলোনি।'

'সব কিছু তোমাকে জানিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে ?'

'না তা না। মানে আমি জানতাম না যে বাড়ি বদল করছ।'

'রোজ এই নিয়ে কথা হচ্ছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে—আর তুমি বলছ তুমি জানতে না।'

'কিছু তো বলোনি...'

'আর কীভাবে বলব ? মাইক ভাড়া করে বলতে হবে ?'

'নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানতাম না—খুব যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করেছি।'

'যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করতে হয়েছে ? কী এমন যন্ত্রণা করেছ শুনি। হাতে ওটা কী ?'

'সন্দেশ।'

'সন্দেশ কিনলে কেন ?'

'এম্নি কিনলাম।'

'জানো এই বাড়িতে মিষ্টি কেউ খায় না—তারপরেও সন্দেশ কিনে আনলে কী মনে করে ?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

নতুন বাসায় মতিন সাহেবের ঘর হল ছাদের চিলেকোঠায়। এই ঘরটা আগের চেয়েও ছোট তবে প্রচুর আলো-বাতাস। সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে যে কোন সময় ছাদে আসা যায়। রাতে কোন কারণে তাঁর ঘুম ভাঙলেই তিনি ছাদে এসে বসে থাকেন। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, কেন সবাই তাঁকে এত অপছন্দ করে ? তিনি কি মানুষটা খারাপ ?

তা তো না। কখনো কোন অন্যায় করেছেন বলে তো মনে পড়ে না। সৎভাবে থেকেছেন। সৎ জীবন যাপন করেছেন।

তাহলে কি তাঁর চেহারা খারাপ ? কিংবা চেহারাটা এমন যে দেখলেই সবার রাগ লাগে ?

তাও বোধ হয় না। আয়নায় তিনি দীর্ঘ সময় নিজেকে দেখেছেন। একবার না, অনেকবার দেখেছেন। খারাপ বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া চেহারা কি খুব বড় ব্যাপার ? কত কুৎসিত দর্শন মানুষ পৃথিবীতে আছে। তাদের প্রতি কত ভালবাসা সবাই দেখায়। তাঁদের অফিসেই তো একজন আছেন, পরিমল বাবু। আগুনে পুড়ে মুখের একটা দিক ঝলসে গেছে, বাঁ চোখটা নষ্ট। তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অথচ সবার মুখে—পরিমলদা, পরিমলদা। অফিসের পিকনিক হবে, ব্যবস্থা করবে পরিমলদা। নাটক দেখতে যাবে, ডাকো পরিমলদাকে।

তাহলে ব্যাপারটা কী ? তিনি খানিকটা বোকা বলেই কি সবাই তাকে এড়িয়ে চলে ? বোকাদের কেউ পছন্দ করে না—কিন্তু তিনি কি সত্যি বোকা ? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কাকে জিজ্ঞেস করবেন ? জিজ্ঞেস করবার মত কোন বন্ধু তাঁর নেই। কাজেই তিনি গভীর রাতে ছাদে বসে আকাশের তারা গোনেন।

দিনের বেলাটা তাঁর অবশ্যি খুব ভাল কাটে। সকালে নাশতা শেষ করেই বের হয়ে পড়েন। এগারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করেন। বাচ্চাদের স্কুলগুলির সামনে দাঁড়ান। এক একদিন এক এক স্কুল। ছোট ছোট বাচ্চারা হৈচৈ করে স্কুলে ঢুকে। তাঁর দেখতে বড় ভাল লাগে। এগারোটার দিকে রোদ কড়া হয়ে গেলে ঘুরতে আর ভাল লাগে না। কোন একটা পার্কে চলে যান। দুপুরটা কাটে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খাবার তিনি পার্কেই খান। এক ছটাক বাদাম, এক গ্লাস পানি আর এক কাপ চা। কোন কোন দিন দুটা সিঙ্গারা, একটা কলা। সবই পার্কে পাওয়া যায়। দুপুরে তিনি যে বাড়িতে খেতে যান না এ নিয়ে কেউ তাকে কখনো কিছু বলে না।

রোদ একটু কমে গেলে বেলা চারটার দিকে তিনি আবার ঘুরতে বের হন। বাসায় ফিরে যান সন্ধ্যার দিকে—এই হচ্ছে মতিন সাহেবের রুটিন। বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করেন অফিস থেকে কোন চিঠি এসেছে কি না। বিদায় সভার খবরের জন্য তিনি এখনো মনে মনে অপেক্ষা করেন।

এক রোববারের কথা। চৈত্র মাস। ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। মতিন সাহেব যথারীতি রমনা পার্কে উপস্থিত হয়েছেন। পছন্দসই একটা বেঞ্চ বের করে লম্বা হয়ে শুয়েছেন। আকাশ ঘন নীল—আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন হঠাৎ কেমন যেন হল। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ ঝাঁকুনি অনুভব করলেন। পেটের নাড়িভুঁড়ি মনে হল হঠাৎ একটা পাক দিয়েছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেল লালায়। চোখের সামনে তীব্র নীল আলো ঝলসে উঠল।

তিনি চোখ বন্ধ করে তিনবার বললেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ।

চোখ খুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। যা দেখলেন তার জন্যে তাঁর কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি দেখলেন—তাঁর চারপাশে ছ'সাতটি শিশু। বয়স

সাত থেকে বারোর মধ্যে। প্রতিটি শিশুর মুখ এত সুন্দর যে মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। গায়ের রঙ গোলাপি, পাতলা ঠোঁট, গা লাল রঙের। চোখের পল্লব দীর্ঘ। চোখগুলি বড় বড়। সেই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

মতিন সাহেব চোখ মেলতেই সবগুলি বাচ্চা এক সঙ্গে কলকল করে উঠল। তারা কথা বলছে। অতি বিচিত্র কোন ভাষায় কথা বলছে। সেই বিচিত্র ভাষার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন না। তারা কথা বলছে অতি মিষ্টি সুরে। খানিকটা টেনে টেনে। এক-একটা বাক্য বলার পর তারা বাঁ হাত চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এটাই বোধ হয় এদের কথা বলার ভঙ্গি।

এরা যে মানবশিশু এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কোথাকার মানবশিশু ? এদের পোশাকও অতি বিচিত্র। সবারই গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক। যার রঙ কোন স্থায়ী রঙ না—ক্ষণে ক্ষণে তা বদলাচ্ছে।

মতিন সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বাচ্চাদের কলকল শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চারদিক পুরোপুরি নিঃশব্দ। এধরনের নীরবতা সহ্য করাও মুশকিল। মতিন সাহেব চোখ মেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা আবার কলকল শুরু করল। এরা সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কী ঘটছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মতিন সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। যদিও এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।

তিনি শুয়ে ছিলেন সিমেন্টের বেঞ্চে। এখন তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর। ঘাসগুলি অবশ্যি অন্য রকম। সবুজ নয়, হালকা নীল। ঘাসের পাতা সুতার মত সূক্ষ্ম। সিমেন্টের বেঞ্চে যখন শুয়েছিলেন তখন সূর্য ছিল মাথার উপর। এখন কোন সূর্য নেই। তিনি সূর্যের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাচ্চারাও তার মত এদিক-ওদিক দেখছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন—সূর্যটা কোথায় ? বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না—তারাও অবিকল তাঁর মত হাতের ইশারা করল। এরা যেন একদল পুতুল। তিনি যা করবেন এরাও তাই করবে। মতিন সাহেব বললেন, 'তোমরা কারা ?'

এরা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর সবাই একসঙ্গে মিষ্টি করে বলল, 'তোমরা কারা ?'

এর মানে কী ? কী হচ্ছে এসব ? তিনি কোথায় ? আগে রমনা পার্কে শুয়ে ছিলেন—এখন যেখানে আছেন এটাও মনে হয় কোন পার্ক তবে একটা গাছও চিনতে পারছেন না। অচেনা সব গাছ তবে বড় গাছ না সবই লতানো গাছ। পাতাগুলির বেশির ভাগই গোলাকার। প্রতিটি গাছ ফুলে ভর্তি। ফুলের রঙ নীল এবং বেগুনিতে মেশানো। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নেই তবু চারদিক আলো হয়ে আছে। যে বাচ্চা ক'টি তাকে ঘিরে আছে তাদের কারো পায়ে জুতো নেই।

এত সুন্দর পোশাক কিন্তু এরা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে। মতিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব ক'টি বাচ্চা আগের মত এক সঙ্গে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন—পুরো জায়গাটাই বিরাট একটা বাগান। এত বড় বাগানে এই কটি মাত্র শিশু। আর কেউ নেই। এরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। এরা তাঁকে দেখে কী ভাবছে ? কোন জন্তু যে দেখতে মানুষের মতো ? এরকম হলে ছুটে গিয়ে বড় কাউকে নিয়ে আসা উচিত। তা তারা করছে না। কিংবা কে জানে হয়ত করেছে। তাদের ভেতর থেকে কেউ গেছে বড়দের খবর দিতে। এরা অপেক্ষা করছে। তবে এরা খুব যে ভয় পাচ্ছে তা না। ভয় পেলে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকত না। দূর থেকে দেখত। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ নামিয়ে নিত। মতিন সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসুক, বড় কেউ আসুক।

তাঁর খিধে পেয়ে গেল। আজ ভোরে তিনি নাশতা না খেয়ে বের হয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। দু'ছটাক বাদাম কিনেছিলেন। সেই বাদামের ঠোঙা হাতে আছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বাদাম ভেঙে মুখে দিলেন। সবাই কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। মতিনউদ্দিন ঠোঙাটি ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও, বাদাম। ঝাল মরিচ দিয়ে খেতে খুব ভাল। এবার আর তাঁর কথা শুনে সবাই এক সঙ্গে কথা বলে উঠল না। কেউ বাদামও নিল না। শুধু একজন একটু এগিয়ে এসে ঠোঙা থেকে বাদাম নিল। খোসা ছাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। সে এত ভয় পাচ্ছিল যে তার হাত-পা রীতিমত কাঁপছে। অন্য বাচ্চাগুলি শংকিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না—এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। বাদাম কি তারা আগে কখনো দেখেনি ?

যে সাহস করে বাদাম খেয়েছে তার দিকে তাকিয়ে মতিন সাহেব বললেন, আমার নাম মতিনউদ্দিন। এই জায়গাটা কোথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাচ্চাগুলি এবারো ঠিক আগের মত করল। তিনি যা বললেন তারাও তাই বলল। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম হল। কথা শেষ হওয়ামাত্র তারা সরে গেল। অনেকটা দূরে সরে গেল। যে ছেলেটি বাদাম খেয়েছে শুধু সে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তিনজন বয়স্ক মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এদের ভেতর দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই অদ্ভুত-দর্শন কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রগুলি থেকে মৌমাছির পাখা নাড়ার শব্দের মতো শব্দ আসছে। বয়স্ক মানুষ তিনটির চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা কি তাও জানি না। এখানে কী করে আসলাম তাও জানি না। যদি অপরাধ করে থাকি, আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মতিন সাহেব দু'হাত জোড় করলেন। বয়স্ক মানুষ তিনজনের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। তারা কি তাঁর কথা বুঝতে পেরে হাসছে না মতিন সাহেবকে হাত জোড় করতে দেখে হাসছে ?

'স্যার আমার বাসা পল্লবীতে। এখন রিটায়ার করেছি তো। কিছু করার নেই তাই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে রমনা পার্কে এসে বেঞ্চিতে বসেছি—তারপরেই এই কাণ্ড। স্যার, এখন আমার অসম্ভব পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। জানি আমার কথা আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না, তবু পানির তৃষ্ণার কথা না বলে পারলাম না।'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তিনি তাদের কোন কথা বুঝতে না পারলেও তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে। কারণ পানির কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় মেয়েটি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর কাঁধে ঝুলানো বস্তু, যাকে মতিন সাহেব যন্ত্রপাতি বলে ভাবছেন, তার এক ফাঁক দিয়ে দুটি খুব ছোট ছোট কফির কাপের মত বাটি বের করল। বাটি ভর্তি তরল পদার্থ যা পানি নয়। পানির চেয়ে অনেক হালকা। রঙ, হালকা সবুজ। খেতে চমৎকার। মুখে নেয়ামাত্র সমস্ত মুখ ঠাণ্ডা ভাব হল। তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। মতিন সাহেব দু'টি কাপই শেষ করলেন। অন্য কাপটির তরল বস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝাঁঝালো-টক টক।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আপনাদের ধন্যবাদ।

পুরুষদের একজন এগিয়ে এসে মতিন সাহেবকে হাতের ইশারায় বলল, তিনি যেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

প্রথমবারেই মতিন সাহেব তা বুঝলেন। তবু সে বারবার এটা বুঝাতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, আপনার কথা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। শুধু যদি একটু বুঝিয়ে দেন আমি এখানে কীভাবে আসলাম—আপনারা কারা—তাহলে মনটা শান্ত হবে। আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।

তারা এই কথায় একসঙ্গে হাসল। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না—তিনি এমন কী বলেছেন যাতে এদের হাসি আসবে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি কোন ভয়ংকর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এতে হাসির তো কিছু নেই।

আরো তিনজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এরা আগের তিনজনের মত হেঁটে আসেনি—গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িগুলিকে কি গাড়ি বলা যায় ? হাওয়া গাড়ি ? কারণ গাড়িগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসেছে। গাড়ি ভর্তি নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নতুন তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমেই মতিন সাহেবের চারদিকে যন্ত্রপাতি বসাতে লাগল। এমন সব বিকট আকৃতির যন্ত্র যে তাকালেই বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগে।

মতিন সাহেবের চোখের ঠিক সোজাসুজি দশ ফুটের মত দূরে টিভি পর্দার মত পাতলা একটি পর্দা বসানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এইটিই সবচে' জটিল যন্ত্র, কারণ ছয়জন মানুষের মধ্যে চারজনই এটি নিয়ে ব্যস্ত।

মতিন সাহেব বাচ্চাগুলিকে কোথাও দেখতে পেলেন না। এরা নিঃশব্দে সরে গেছে। শুধু যে বাচ্চাটি বাদাম খেয়েছে সে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাকেও নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তার চারপাশে গোল করে সাদা রঙের দাগ দেয়া হয়েছে। ছেলেটি এই দাগের বাইরে যাচ্ছে না। বাচ্চাটাকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি বসতে পারি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।

এরা তার কথা বুঝতে পারল। সম্ভবত যন্ত্রপাতিগুলি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছে কিংবা কে জানে হয়ত তারা মনের কথা বুঝতে পারে।

সবচে' বয়স্ক মানুষটি তাঁকে বসতে ইশারা করল। মতিন সাহেব বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পর্দাটা নিচে নেমে এল। চোখের সোজাসুজি স্থির হয়ে গেল। তিনি ডান দিকে ফিরলেন। পর্দাও ডান দিকে সরে গেল। মজার ব্যাপার তো।

বয়স্ক লোকটি ইশারায় বলল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পর্দায় কিছু দেখা যাবে। অথচ তিনি কিছুই দেখছেন না। লোকগুলি মনে হয় এতে খুব হতাশ হচ্ছে। মতিন সাহেবের আবার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। একটু আগে পানি চেয়েছেন। আবার চাইতে লজ্জা লাগছে। তাছাড়া এরা সবাই পর্দাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাওয়া গাড়িতে আরো তিনজন মানুষ এল। এখানকার ছ'জন থেকে তিনজন ফিরে গেল। এই তিনজন সম্ভবত পর্দার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এখন নতুন তিনজনই কাজ করছে। আগের তিনজন একটু দূরে হতাশ মুখে দাঁড়ানো। মনে হচ্ছে পর্দাটা ঠিকঠাক করা তাদের কাছে খুব জরুরি।

মতিন সাহেব মাথায় আচমকা একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। নিজের ছবি। দু' হাত মেলে দশটি আঙুল বের করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এর মানে কী !

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি। নিজের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেল। পর্দায় দেখা গেল তার পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির ছবি। সেও আঙুল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার— এই ছেলেটির প্রতি হাতে চারটি করে মোট আটটি আঙুল। তিনি পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালেন। আসলেও তাই। এর হাতে চারটি করে আঙুল। পায়েও তাই।

তিনি চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকালেন। এদেরও সবার হাতে চারটি করে আঙুল। পর্দার ছবির অর্থ এখন পরিষ্কার হচ্ছে—এরা বলতে

চাচ্ছে—আমরা দেখতে অবিকল তোমাদের মত হলেও কিছু পার্থক্য আছে। এই হচ্ছে সেই পার্থক্য।

এখন আরো সব পার্থক্য দেখানো হচ্ছে—এগুলি মতিন সাহেব কিছুই বুঝছেন না। তারা চলে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি এন এ, আর এন এ তে। পুরো জিনিসটি যদিও দেখানো হচ্ছে ছবিতে তবু মতিন সাহেব কিছু বুঝলেন না। লাজুক গলায় বললেন,

'স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আর্টস-এর ছাত্র। বি. এতে আমার ছিল লজিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস।'

পর্দার ছবি মুছে গেল—এখন অন্য ছবি আসছে। এই ছবিতে বাদাম খাওয়া বাচ্চাটিকে বাগানে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই বাগান। বাচ্চাটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে সে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে—সে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি শিশুর সঙ্গে তার দেখা হল। এবার সে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্য শিশুরাও আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা যে জিনিসটি দেখে ভয় পেয়েছে এবার সেটিকে দেখা যাচ্ছে—জিনিসটি হচ্ছে মতিন সাহেব।

পর্দায় দেখানো হচ্ছে মতিন সাহেবের এই জায়গায় আসার ছবি। মনে হচ্ছে দূরে ক্যামেরা বসিয়ে পুরো জিনিসটারই ছবি তোলা হয়েছে। এখন সে ছবি দেখানো হচ্ছে।

মতিন সাহেব দ্বিতীয় দফায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের কথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার শুনলেন মাথার ভেতরে কে যেন বলছে—

'আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন ? আমরা নানান ভাবে চেষ্টা করছি যাতে আপনি আমাদের কথা বোঝেন। আমরা আপনার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারছি না। শেষ চেষ্টা হিসাবে ইরিওক্রোম পর্দা ব্যবহার করছি। এই পর্দায় তীব্র শক্তির রেডিয়েশন ব্যবহৃত হয় যা আপনার মস্তিষ্কের নিওরোনের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই এই পর্দ-আমরা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারব না। আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি।'

'অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

'আপনারা কারা ?'

'আপনি এবং আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তের অধিবাসী। আপনার বাসস্থান যাকে আপনি পৃথিবী বলেন তার দূরত্ব আমাদের এখান থেকে প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ।'

'আমি এখনে কী করে এলাম ?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা একটি থিওরি দিয়েছে—সেই থিওরি আপনি চাইলে আপনাকে বলতে পারি।'

'আমি থিওরি বুঝব না—আমি বলতে গেলে একজন মূর্খ মানুষ। বি.এ পাস করেছি থার্ড ডিভিশনে। তাও প্রথমবারে পাস করতে পারিনি, ইংরেজিতে রেফার্ড ছিল।'

'এই থিওরি যে কেউ বুঝতে পারবে। আপনি পারবেন। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু থিওরি তৈরি করেন। এটিও সে জাতের থিওরি। বিজ্ঞানীরা বলছেন—প্রকৃতির অতি সুশৃঙ্খল নিয়মেও মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যায়। ভুল করে প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও এরকম ভুল হয়েছে। যার জন্যে অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। তবে প্রকৃতি অতি দ্রুত তার ভুল ঠিক করে। আপনার ক্ষেত্রেও তাই করবে বলে আমাদের ধারণা। আপনি যেখান থেকে এসেছেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারছি না।'

'যদি প্রকৃতি তার ভুল ঠিক করতে না পারে তাহলে কী হবে?'

'আপনাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'স্যার, আমার কোন অসুবিধা নেই। দেশ-বিদেশ দেখার আমার খুব শখ।'

'আপনার এই শখ আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। পর্দায় আপনি আমাদের এই গ্রহ দেখতে পাবেন। তার প্রতিটি সুন্দর জায়গা আপনাকে দেখানো হবে। তবে যে কোন মুহূর্তে আপনি হয়ত আপনার জায়গায় ফিরে যাবেন। দয়া করে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আপনার দেশের বিজ্ঞানীদের বলবেন আমাদের কথা।'

'আমি বললে লাভ হবে না, স্যার। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া আমি কোন বিজ্ঞানীকে চিনি না। একজনকে শুধু চিনি—আব্দুস সোবহান—খিলগাঁও হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। বোটানিতে এম.এসসি. ফার্স্ট ক্লাস।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনার এই গ্রহে আগমন একটি বিরাট ঘটনা। এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রহে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রতিটি প্রাণী বসে আছে ত্রিমাত্রিক টিভি সেটের সামনে। এই মুহূর্তে সবাই দেখছে আপনাকে। এই গ্রহে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গ্রহের সবচে' বড় সড়কটির নাম রাখা হচ্ছে আপনার নামে—সড়কের দু'মাথায় থাকবে আপনার দুটি ইরিডিয়ামের মূর্তি।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না, স্যার।'

'লজ্জা দেয়ার কোন ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই গ্রহে আগমন যে কত বড় ঘটনা তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়াপথে একই ধরনের দু'টি প্রাণের উদ্ভব হয়েছে এটা যে কত বড় ঘটনা আপনি তা অনুমানও করতে পারবেন না।'

'একই ধরনের প্রাণী না স্যার—আঙুলে বেশকম আছে।'

'এই তফাৎ সামান্য—অতি সামান্য।'

'একটা ছোট কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার ?'

'করুন।'

'আপনি বলেছেন প্রকৃতি ভুল করে। প্রকৃতির কি ভুল করা উচিত ?'

'না উচিত নয়। হয়ত প্রকৃতি কোন ভুল করেনি। সে ইচ্ছা করেই আপনাকে এখানে এনেছে। অন্য কোথাও আপনাকে নিতে পারত। তা নেয়নি। এমন এক গ্রহে এনেছে যার তাপমাত্রা আপনার পৃথিবীর মত। যার অক্সিজেনের পরিমাণও আপনার গ্রহের অক্সিজেনের কাছাকাছি।'

'মতিন সাহেব পর্দা থেকে দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরিয়ে নিলেন—তাকালেন চারদিকে। আশ্চর্য ! কেউ নেই। শুধু বাদাম খাওয়া বাচ্চাটি বসে আছে। যে লোকগুলি যন্ত্র ঠিক করছিল তারাও নেই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, স্যার, ওরা কোথায় ?

'সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'কারণ আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা—আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুতে আয়নের পরিমাণ বাড়ছে।'

'ছোট বাচ্চাটিকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন ?'

'আপনাকে যখন এখানে পাঠানো হয় তখন ছোট বাচ্চাটি আপনার পাশে ছিল। অবিকল আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্য বাচ্চাটিকে আপনার পাশে রাখা হয়েছে।'

'এর কোন ক্ষতি হবে না তো ?'

'সম্ভবত না। আপনাকে আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞানের কিছু কথা শিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আপনি আপনার পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তা শেখাতে পারতেন। ক্যানসারের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেব ?

'দরকার নেই, স্যার। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'তারচেয়েও বড় কথা আপনি কিছু মনে রাখতে পারবেন না।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।'

'চৌম্বকক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে—আপনি সম্ভবত চলে যাচ্ছেন। পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকুন। দেখুন, আমাদের গ্রহ দেখুন—শেষবারের মত দেখুন।'

মতিন সাহেব পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র গ্রহ দেখলেন—দেখলেন তার ভূগর্ভস্থ বিশাল নগরী, দেখলেন তুষারঢাকা পর্বতমালা, দেখলেন বনভূমি, দেখলেন এই গ্রহের প্রাণদায়িনী সূর্য যার আলো কিঞ্চিৎ নীলাভ।

তাকে শুনানো হল তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত। দেখানো হল মহান সব শিল্পকর্ম। আহ্ কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা ! মতিন সাহেব ইরিডিয়ামের তৈরি তাঁর দুটি মূর্তিও দেখলেন। কী বিশাল মূর্তি। আগামী লক্ষ বছর এই মূর্তির কিছু হবে না। এই গ্রহের অদ্ভুত সুন্দর মানুষগুলি তাঁর মূর্তির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাবে।

'হে ভিন গ্রহের মানুষ, আমাদের ধারণা আপনার বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত। চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। বিদায়, বিদায়। এই গ্রহের সব ক'টি মানুষ এক সঙ্গে বলল—বিদায়, বিদায় !

মতিন সাহেব হঠাৎ এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলেন। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। তারপর সব আগের মত হয়ে গেল। তিনি দেখলেন রমনা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদামওয়ালা টাকার ভাংতি নিয়ে এসেছে। তিনি বাদামওয়ালাকে চারটা টাকা দিলেন। তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হল না। দুপুরে বেঞ্চিতে ঘুমালেন। বিকেলে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাসায় ফিরলেন।

নামাযের সময় হয়েছে তিনি বারান্দায় বসে বদনার পানিতে অযু করছেন। তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন—ওকী ! ওকী !

মতিন সাহেব বললেন, কী হল ?

'তোমার হাতে চারটা আঙুল কেন ?' মতিন সাহেব হাতের দিকে তাকালেন। আসলেই তাই। দুটি হাতেই চারটি করে আঙুল। শুধু হাতে নয়। পায়েও তাই।

'কী হয়েছে তোমার ? এসব কী ?'

মতিন সাহেব উদাস গলায় বললেন, জানি না।

'কী বলছ তুমি ! কী সর্বনাশের কথা !'

মতিন সাহেব বললেন, সর্বনাশের কী আছে ? চারটা আঙুলে অসুবিধা তো হচ্ছে না।

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অযু করে যাচ্ছেন। আঙুল চারটা হয়ে যাওয়ায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি জানেন প্রকৃতি ভুল করে না। ঐ গ্রহ থেকে এখানে ফিরিয়ে আনার সময় প্রকৃতি এই সামান্য পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তিনি নিজে তো বুঝছেন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয়—বাস্তবেই ঘটেছে। প্রকৃতি তার প্রমাণ রেখে গেল।

তাছাড়া চার আঙুলে হাতটাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর !